মনুষ্যসৃষ্টির আদিমকাল হইতেই, পরলোকরহস্য মনুষ্য জীবনের একটী প্রধান সমস্যাপূর্ণ বিষয় হইয়া রহিয়াছে। অহিফেণ সেবনাভ্যস্ত ব্যক্তি যেমন ক্ষণিক তন্দ্রামুক্তির অবস্থায় চৈতন্য লাভ করে, বিষয়সেবী ব্যক্তিও মায়ামোহাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে সময়ে সময়ে ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া পরলোকের বিষয় মনে করে। বস্তুতঃ প্রিয়জনের মৃত্যুতে তাহার এই ক্ষণিক চৈতন্যোদয় হয়। প্রত্যহ অসংখ্য লোক পরলোক গমন করিতেছে ইহা দেখিয়াও অনেকেই মনে ভাবে না তাহাদিগকেও সেই অজ্ঞাত রাজ্যে যাইতে হইবে; "কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্" (ইহা অপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়কর বিষয় কি হইতে পারে?)

প্রকৃতির মোহাবরণের একপ্রান্ত উত্তোলিত করিতে বিশ্বাস, ভক্তি ও সাধনার আবশ্যক, নচেৎ, ঐ আবরণের অপর পার্শ্বস্থ ঝলসান্ আলোকে অন্ধত্ব ও অনন্তের বিশালত্বধারণায় অক্ষম হওয়ায় মস্তিষ্কবিকৃতি উপস্থিত হইতে পারে। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতের দর্পচূর্ণকারী সুপণ্ডিত চৈতন্যদেব শুষ্কজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গের আশ্রয় লইয়াছিলেন। শাক্তভক্তদ্বয়, সাধক রামপ্রসাদ ও সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী ও সরল বিশ্বাস ও পরাভক্তির মাহাত্ম্য ঘোষণা করে। যাহা তৎকালীন খ্যাতনামা মনীষীগণের নিকট দুর্ব্বোধ্য সমস্যা ছিল, তাহা বেথেলহেমের সূত্রধর তনয় ও তাঁহার গ্যালিলি সাগরতীরবাসী নিরক্ষর ধীবর শিষ্যগণের পক্ষে সহজবোধ্য হওয়া বিচিত্র কি? বিশ্বাস ও ভক্তি মধ্যে পরস্পর ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ এবং আধ্যাত্মিক জগতে শুষ্ক জ্ঞান অপেক্ষা সরল বিশ্বাস ও ভক্তির এবং মস্তিষ্ক অপেক্ষা হৃদয়ের প্রাধান্য লক্ষিত হয়।

পরলোকেও মনুষ্যাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্বে বিশ্বাস আছে বলিয়া মানবসমাজে পাপপুণ্যের বিচার, সুশৃঙ্খলা, কর্ত্তব্যজ্ঞান, আত্ম-বিসর্জ্জন, আশা, শান্তি প্রভৃতি যাহা কিছু কল্যাণকর ও সুন্দর তৎসমুদায় বর্ত্তমান আছে। এই বিশ্বাস সভ্য মানবসমাজের ভিত্তি, সংসার সমুদ্রে জীবনতরীর কর্ণ ও ধ্রুবনক্ষত্র। ইহাতে শোকে সান্ত্বনা, দুঃখ কষ্টে আশা ও শান্তি লাভ হয়, ইহলোক ও পরলোক এই উভয়ের মধ্যে অভিন্ন সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং মৃত্যু ভয় দূর হয়; বিশাল জগচ্চিত্র উদ্দেশ্যবিহীন অসার স্বপ্নচ্ছবিতে পরিণত হয় না।

কোনও কোনও ভাবুক এই পৃথিবীকে পান্থনিবাসের সঙ্গে তুলনা করেন; কেহ বা পক্ষীগণের রাত্রি যাপনের আশ্রয়-তরুর সঙ্গে তুলনা করেন; কিন্তু তাহাতে মনুষ্য জীবনের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সকলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। তজ্জন্য, ইহাকে নাট্যশালার মঞ্চ সঙ্গে তুলনা করাই সঙ্গত বোধ হয়; কারণ, নাট্যশালার অভিনয়ে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ মধ্যে কর্ত্তব্য কার্য্য ভাগ করা ও তজ্জন্য "ষ্টেজ মাষ্টারের (Stage Master) নিকট ও তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে; অভিনয়ের দোষ গুণ বিবেচনায় পুরস্কার ও প্রশংসা আছে, তিরস্কার ও নিন্দা আছে। রঙ্গমঞ্চ, ইহলোক, নেপথ্য পরলোক, যবনিকা, প্রকৃতির আবরণ; নেপথ্যে গমন পরলোক গমন; তাহাতে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন ব্যতীত ব্যক্তিগত কোনও পরিবর্ত্তন সংঘটন নাই; নেপথ্যই শেষ গন্তব্য ও মিলন স্থান। রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া নেপথ্য গমনে কি কাহারও ভীতি কি [illegible]

বোধ হয়? যদি হয়, তবে তাহা কি অভিনয় ক্রটীজনিত ষ্টেজমাষ্টারে তিরস্কার ভীতি নয়? তবে পরলোকগমন কি প্রবাসীর স্বদেশ যাত্রা নয়? পরলোক কি পুনর্ম্মিলন স্থান নয়?

জ্ঞান ও বিজ্ঞান অনন্ত; মনুষ্যজীবন নানা বিঘ্নসঙ্কুল, ও অল্পকালস্থায়ী। যদি মৃত্যুতেই ইহা শেষ হয়, তবে বৃথা দুঃখপূর্ণ-জীবন-ভার বহনে ফল কি? অতৃপ্ত অনন্ত আশার, অসমাপ্ত আরব্ধ কর্ম্মের কি এখানেই শেষ? জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত মনুষ্য এ পৃথিবীর নিকট নানা ঋণে ঋণী; সেই সকল ঋণ কি পরিশোধের আশা নাই, শুষ্ক জ্ঞানী দার্শনিক হয়ত ইহাকে শিশুর সরল বিশ্বাস কি কবির কল্পনা বলিবেন। যাহা হউক, সকল বিষয়েরই ফলদ্বারা দোষগুণ বিচার করা হয়; সুতরাং সরল বিশ্বাসী ভক্তের ও শুষ্ক জ্ঞানী দার্শনিকের, এই উভয়ের, জীবন তুলনা করিলেই প্রশ্নটীর মীমাংসা সহজ হইতে পারে। যে পাণ্ডিত্য মনুষ্য জীবনকে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট করিয়া উদ্দেশ্যহীন ও অকর্ম্মণ্য করে তাহার গৌরব ও মূল্য কি? উহা কি অনধিকার চর্চ্চার শাস্তি নয়? কীটাণুকীট মানবের পক্ষে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ পুরাণ পুরুষের জন্মকুষ্ঠী উদ্ধার চেষ্টা কি অনধিকার চর্চ্চা নয়? পোষাকী পাণ্ডিত্য অপেক্ষা দৈনিক ব্যবহারিক সরল বিশ্বাস অধিকতর কার্য্যকর ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ। নিবৃত্তি মার্গানুসারিণী ইহাই কল্যাণপ্রদায়িনী ও সৌন্দর্য্যসম্পন্না।

কুমার ও কুমারীর মধ্যে পরস্পর ভালবাসা সঞ্চার হইয়া তাহা উভয়ের বয়োবৃদ্ধি সহকারে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় তাহাদের পার্থিব মিলন হইল না; পরলোকে মিলন আশায় উভয়েই ব্রতনিষ্ঠ হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন। দম্পতীর মধ্যে একজন লোকান্তর গমন করায়, উভয়েই কাল-স্রোতের দুই তীরে পৃথক পৃথক হইয়া নিশাবসানে চক্রবাক্ চক্রবাকীবৎ মিলন আশায় প্রতীক্ষা করিতেছেন। মানব সমাজের কল্যাণ কামনায় অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিসমাপ্তি না হইতেই কর্ম্মবীর পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন; পরলোক হইতে তাহার ফলোদয় দেখিতে পাইবেন, এই তাঁহার আশা। রুষ-জাপ সমরে, জাপ-সেনাপতি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে জীবিত সৈন্যদিগকে ধন্যবাদ দেওয়ার সময়ে যুদ্ধে নিহত সৈন্যদের প্রেতাত্মা ও পূর্ব্ব পুরুষদের প্রেতাত্মা সকলকেও ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হন নাই।

জীবনের শেষ বয়সে, বহুদিন পর, বাল্য ও যৌবনের লীলাক্ষেত্র এবং প্রাপ্ত-ব্যবহার-বয়সের কর্ম্মক্ষেত্র সকল দর্শন করিলে, রজনীর নিস্তব্ধতায় জ্যোতিষ্কমালা-খচিত নভোমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলে, এবং উষাকালে করুণ-রসাত্মক সঙ্গীত শ্রবণে, বায়োস্কোপের ছবিবৎ, মানসপটে যে সকল দৃশ্যাবলী উদ্ভাসিত হইয়া, এক যোগে অমৃত-বর্ষণ ও বিষ-বিসর্প দ্বারা হৃদয়কে যেরূপ বিহ্বল করে, তাহা অনেকেই অনুভব করেন। তখন মনে হয়, "হায়, ইহলোকেই কি এই সকল দৃশ্যের শেষ? আর কি কখনও এই সকল দৃশ্য দেখিতে পাইব না"?

মৃতব্যক্তির আত্মার কল্যাণার্থ প্রার্থনা, পোষণজন্য পিণ্ডোদক প্রদান ও তুষ্টি-সম্পাদন জন্য তৎপ্রতি ভক্তি, কৃতজ্ঞতা, কি স্নেহপ্রকাশ, সভ্যমানবসমাজে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। হিন্দুদের গয়ায় পিণ্ডদানের ও দৈনিক পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের মন্ত্রের প্রাণপ্রদ

মধুরতা কে না স্বীকার করেন? বস্তুত, শোকাশ্রু-সিক্ত-স্মৃতি দ্বারাই পরলোকগত আত্মাকে নিকটে দর্শন করা যায়; তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য ত্রুটী-জনিত ক্ষমা প্রার্থনা, ঋণ-শোধ জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করা এবং তাঁহার মঙ্গল প্রার্থনা ও আমাদের মঙ্গল জন্য তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা; আমাদের মনের কথা ও প্রাণের ব্যথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করা, এই সকল কি প্রকৃত পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডোদক দান নয়?

বলা বাহুল্য, উপরে যাহা উল্লেখ করা হইল তাহার মূলে ঈশ্বর-ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ-স্বরূপে গৃহীত হইয়াছে। আত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব সম্বন্ধে কোনও কোনও আধুনিক দার্শনিকগণের মতও নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা গেল।

আধুনিক জড়-বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, প্রাচীন জড়-বাদেরও প্রসার বৃদ্ধি দেখা যায়। পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগে সজীব পদার্থ সকলের প্রাণ সঞ্চার হয়, এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাসই জড়বাদের ভিত্তি বলিয়া বোধ হয়। দুগ্ধ পচিলে রাসায়নিক ক্রিয়ায় তাহার মধ্যে কীট জন্মে; বীজাণুর আবিষ্কর্ত্তা বিখ্যাত জার্ম্মাণ বৈজ্ঞানিক "কক্" (Koch) তাঁহার আবিষ্কার দ্বারা এই ভ্রম-বিশ্বাস দূর করায়, এখন ইহা প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কেবল জীব হইতে জীব উৎপন্ন হয়; জড় পদার্থের রাসায়নিক ক্রিয়ায় জীব উৎপন্ন হইতে পারে না।

যেস্থানে বিষ সেইস্থানেই বিষের প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা প্রকৃতির নিয়ম। বোধ হয় প্রকৃতির সেই বিধান ক্রমেই আধুনিক জড়বাদের প্রতিষেধক-স্বরূপ "থিওসফী" (Theosophy=ব্রহ্মতত্ত্ব) ও "স্পিরিচুয়ালিজম্" (Spiritualism=আত্মা-তত্ত্ব) এই দুইটি মতের অবতারণা হইয়াছে। রুষিয়ার ম্যাডাম্ ব্লাভোস্কী, "থিওসফিক্যাল সোসাইটীর (Theosophical Society) স্থাপয়িত্রী; এই মত প্রধানতঃ ভারতীয় দর্শন ও অন্যান্য শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত; তিনি তিব্বতী লামাদের নিকট ঐ সকল শিক্ষা করেন। তাঁহার পর, কর্ণেল অল্কট্ উক্ত সোসাইটীর নেতা হইয়া আমেরিকা হইতে সশিষ্যে ভারতবর্ষে আইসেন এবং আর্য্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা বেদজ্ঞ পণ্ডিত-প্রবর স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নিকট বেদোপদেশ শিক্ষার্থী হন। কর্ণেল অল্-কটের পর শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ট ঐ সোসাইটীর নেত্রী হইয়াছেন। পৃথিবীর অনেক স্থানে ইহার শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

"থিওসফী"র ন্যায় "স্পিরিচুয়ালিজম্"ও পৃথিবীর অনেক স্থানে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সমাদৃত হইয়াছে।

এরূপ কথিত আছে, থিওসফীর প্রবর্ত্তিত মত খণ্ডন জন্য, ইউরোপে ও আমেরিকায় নিরীশ্বর বিজ্ঞানবাদীগণ প্রথমে "সাইকিক্ রিসার্চ্চ সোসাইটী (Psychic Research Society) ও তাহার শাখা সকল স্থাপন করেন। এই শেষোক্ত সোসাইটীর সভ্যগণ নিরপেক্ষচিত্তে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে তৎকালীয় ভূতপ্রেতের গল্পের ও উপদ্রবের এবং পুরাতন বিচার আদালত সকলের "উইচ্ ক্র্যাফ্ট্" (witch-craft=ডাইন্ বিদ্যা) ঘটিত অপরাধ বিচারের নথী সকল পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহাদের দীর্ঘকালব্যাপী পরীক্ষার ফলে, অবশেষে তাঁহারা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তাঁহাদের পরীক্ষিত

প্রতি বৎসর সহস্র মরার মধ্যে অন্তত তিন চারিটী ঘটনা এরূপ দৃষ্ট হয় যে, প্রেতাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে, তাহাদের অন্য কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা করা যায় না। ভরতবন্ধু ব্র্যাড্‌ল ও সরস্বতী-রূপিণী শ্রীমতী এ্যানি বেসাণ্ট্‌ ও অন্যান্য অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ ঐ সাইকিক্‌ সোসাইটীর সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

সম্ভবতঃ "থিওসফী" ও "সাইকিক্ রিসার্চ্চ" এই উভয়ের পরস্পর সংস্পর্শে, চুম্বক স্পর্শে লৌহবৎ, সাইকিক্ রিসার্চ্চে প্রাণ-সঞ্চার হইয়া, তাহা হইতে স্পিরিচুয়ালিজমের উৎপত্তি হইয়াছে। যদিও "থিওসফী" ও স্পিরিচুয়া-লিজম্, দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক মত, তথাপি, তাহারা উভয়ই, মনুষ্যাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব ও পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়া, শোকবিহ্বল বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের শান্তি-বারি পিপাসু শুষ্ক হৃদয়ের সান্ত্বনার উৎস স্বরূপ হইয়াছে। এই উভয় মতেরই অনেক গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রিকা আছে। "স্পিরিচুয়া-লিজম্" মতাবলম্বী ডাক্তার মায়ার্স্‌ যে সুবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে মনুষ্যাত্মার ব্যক্তিগত অমরত্ব সুপ্রমাণ করা হইয়াছে। স্পিরিচুয়ালিষ্ট্‌দের অধিবেশিত সভাকে "সীয়ান্স" (Seance) বলে। তাহাতে তাঁহারা প্রক্রিয়া বিশেষে প্রেতাত্মা সকলকে উপস্থিত করেন বলিয়া প্রকাশ। তাঁহারা প্রেতাত্মার "ফটো" গ্রহণও করিয়া থাকেন।*

অমৃত বাজার পত্রিকার আফিস্ হইতে হিন্দু স্পিরিচুয়াল্ ম্যাগাজিন্ (Hindu Spiritual Magazine) নামক একখানা ইংরেজী মাসিক পত্রিকা অনেক দিন হইতে বাহির হইতেছে। মিষ্টার "ষ্টেড্" (Stead) ও লর্ড কল্‌ভিন্, উভয়ই "স্পিরিচুয়ালিজম্" মত সমর্থন করেন।

অধুনা পাশ্চাত্য দেশে জড়বিজ্ঞানের যেরূপ ক্রমোন্নতি দেখা যায়, একদা প্রাচীন ভারতেও মনোবিজ্ঞান প্রভৃতির তদ্রূপ উন্নতি হইয়াছিল। হিন্দু দার্শনিকদের প্রচারিত যে সকল তত্ত্ব পূর্ব্বে অনেকের নিকট কল্পনা বলিয়া বোধ হইত, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে স্বাধীনভাবে তৎ-সকলের আলোচনা করিয়া তাহা সমর্থন করায়, তৎপ্রতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক-যুগে চিন্তাশীল লোকের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে।

ক্লোরোফরম্ আবিষ্কারের পূর্ব্বে, "ট্রান্স" (trance) দ্বারা রোগীকে অচেতন করিয়া অস্ত্র করার প্রথা ছিল। "হিপ্‌নোটাইজ" (hypnotise) করিয়াও ঐরূপ অস্ত্র করা যাইতে পারে। "মেস্‌মেরিজমে"র কথা অনেক দিবস যাবৎ সকলেই অবগত আছেন।

"১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে, ফ্রেডারিক্ মেস্‌মার (Frederick Mesmer) প্রচার করেন যে, সমস্ত প্রাণী-শরীর, বিশেষতঃ মনুষ্য-শরীর হইতে, বিশেষ প্রকৃতির একটী শক্তি (force =বল) প্রতিনিয়ত বাহির হয় এবং তাহা চুম্বক শক্তির ন্যায় অন্য পদার্থে সংক্রামিত করা যাইতে পারে; কোনও কোনও অবস্থায় তাহার রোগারোগ্য ক্ষমতাও যথেষ্ট থাকে। তিনি আরও প্রকাশ করেন, যে ঐ চুম্বক-শক্তি নির্গমন-সময়ে জ্যোতিষ্মান্ দেখায়। এই শেষোক্ত কথাটী, হিপনোটাইজ্‌কৃত ব্যক্তি-

* অনেক দিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হয়, পাবনা টাউনে একজন ভদ্রলোকের দ্বিতীয় সংসারের সহধর্ম্মিণীর "ফটো" গ্রহণ সময়ে, তাঁহার প্রথমা মৃত-স্ত্রীর প্রতিমূর্ত্তিবৎ অন্য একটী ফটোও তৎসঙ্গে উঠে। তৎপরেও সংবাদ পত্রে ঐরূপ আর একটী ঘটনা পাঠ [illegible] মনে পড়ে।

গণের উক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিগণ বলেন, সমস্ত পদার্থ হইতে, বিশেষতঃ হিপ্‌নোটাইজ-কারীগণের অঙ্গুলীর অগ্রভাগ হইতে জ্যোতিঃ বাহির হয়; কিন্তু হিপ্‌নোটাইজ-কৃত ব্যক্তিগণ ভিন্ন অন্য কোনও ব্যক্তি ঐ জ্যোতিঃ দেখিতে পায় না। তৎপর "মুসোঁ মরিস্ ম্যাটারলিঙ্ক (M. Maurice Materlinck) তাঁহার "নিউ ইন্টিমেশান্‌স্ অব ইম্মর্ট্যালিটী" (New Intimations of Immortality=অমরত্বের নূতন সংবাদ) শীর্ষক বক্তৃতায় প্রকাশ করেন যে, জীবিত অবস্থায় ওজোবৎ একপ্রকার পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হয় এবং মৃত্যুর পরও তাহার অস্তিত্ব অক্ষুন্ন থাকিয়া চিন্তা সকলকে (thoughts) মস্তিষ্কের নিরপেক্ষভাবে সংরক্ষিত করে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার ফিলিপ্ ক্যারি ব্যারণ ভন্ রিচেন্‌ব্যাক্ (Dr. Philip Kari Baron von Reichenbach) প্রচার করেন যে, প্রত্যেক শরীর হইতে যে এক প্রকার শক্তি বাহির হয় তাহা যদিও সাধারণ লোকের চক্ষুর অগোচর, তথাপি, হিপ্‌নোটাইজ-কৃত বিশেষ প্রকৃতির লোকেরা, তাহার ক্রিয়া দ্বারা তাহা অনুভব করে। ঐরূপ শক্তির অস্তিত্বদ্বারাই জান্তব চুম্বক-শক্তির (animal magnetism) যুক্তি-সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায়। অত্যধিক স্নায়বিক-অনুভূতি সম্পন্ন এই প্রকৃতির লোকেরা, অন্ধকার গৃহের অন্যান্য লোকদিগের দক্ষিণ পার্শ্ব জ্যোতির্ম্ময় নীলাভা দ্বারা এবং বামপার্শ্ব পীতাভ লালবর্ণ দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিতে পায়। আর, যদি অন্য কোনও ব্যক্তি, এইরূপ স্নায়বিক-অনুভূতি-সম্পন্ন ব্যক্তির দক্ষিণ হস্ত, তাহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ধৃত করে, তাহা হইলে একটী অপ্রীতিকর উত্তাপ অনুভূত হয়; আর যদি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সেই ব্যক্তির বাম হস্ত ধৃত করে, তাহা হইলে একটী প্রীতিকর স্নিগ্ধ অনুভূতি উপলব্ধি হয়। ইহাতে "রিচেন্‌ব্যাক্" সিদ্ধান্ত করেন যে, একই প্রকৃতির জান্তব চুম্বক-শক্তিদ্বয় পরস্পরকে বিপ্রাকর্ষণে বিক্ষিপ্ত করে এবং ভিন্ন প্রকৃতির জান্তব চুম্বক-শক্তিদ্বয় পরস্পরকে আকর্ষণ করে; চুম্বকশলাকার পোল্ (Poles=প্রান্তকেন্দ্র) দ্বয়েরও এইরূপ ধর্ম্ম। এক ব্যক্তির প্রতি অন্য ব্যক্তির যে অহৈতুকী ভালবাসা কি বিদ্বেষ-ভাব, তাহারও ইহাই কারণ। এই জান্তব চুম্বক-শক্তি এক শরীরের ভিতর দিয়া অন্য শরীরে সংক্রামিত করা যাইতে পারে এবং তখন ঐ সকল শরীর আলোকে উজ্জ্বল দেখায়। রিচেন্‌ব্যাকের মতে, প্রত্যেক শরীর হইতেই ঐ চুম্বক-শক্তি বাহির হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ঐ শক্তিও চুম্বকের ন্যায় প্রান্ত-কেন্দ্র ধর্ম্ম (polraity) বিশিষ্ট।

যদিও বিশ্লিষ্ট আলোক-রশ্মি-পট্টের (spectrum=রামধনুবৎ আলোক-পট) এক প্রান্তে আল্ট্রা-রেড্" (Ultra red=অধি-লোহিত) অর্থাৎ লোহিতবর্ণের বহিস্থ বর্ণ ও অপর প্রান্তে আল্টা-ভায়লেট (Ultra-vialet=অধি-বেগুন) অর্থাৎ বেগুণ বর্ণের বহিস্থ বর্ণ, চক্ষুর অগোচর, তথাপি তাহাদের ক্রিয়াদ্বারা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে তাহাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়। আর, যদিও কর্ণগোচর স্বর-গ্রামের (audible scale) এক প্রান্তে, স্বরের উচ্চ সীমার বাহিরের শব্দ অত্যধিক উচ্চ বিষয়ে এবং অপর প্রান্তে, স্বরের নিম্ন সীমার বহিস্থ শব্দ অত্যধিক নীচ হওয়ায় শ্রুতি গোচর হয় না, তথাপি তাহাদের অস্তিত্বও ঐ রূপে নির্ণীত হয়। তদ্রূপ, ইহাও অনুমান করা যাইতে পারে

যে, চক্ষু ও এরূপ বর্ণ থাকা অসম্ভব নয়, যদ্দ্বারা ঐরূপ অদৃশ্য-বর্ণ সকল দেখিতে ও অশ্রুত-শব্দ সকল শুনিতে পারা যাইতে পারে। সেইরূপ, এরূপ স্নায়বিক প্রকৃতির লোক থাকিতে পারে যে, যদিও অন্য কোনও ব্যক্তি তাহা দেখিতে না পায়, তথাপি, পূর্ব্বোক্ত জান্তব চুম্বক-শক্তি কোনও শরীর হইতে বাহির হওয়া সে অনুভব করিতে পারে। যদি কোনও গাঢ় অন্ধকার গৃহে, "ফটোগ্রাফের নিগেটিভ পিক্‌চার" (negative picture—ফলকে গৃহীত প্রথম ছবি) উঠান জন্য প্রস্তুত রাসায়নিক দ্রব্যের প্রলেপ-যুক্ত "সেন্সেটিভ প্লেটের" (sensitive plate =আলোক-ক্রিয়া-ব্যঞ্জক-ফলক) উপর মনুষ্যহস্ত কিছুক্ষণ জন্য স্থাপিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ ফলকের (প্লেটের) উপর সাধারণ ভাবে আলোক পাতিত করিয়া যেরূপ "ফটো ডেভেলপ" (photo develop) অর্থাৎ ছবি-বিকাশ করা যায়, ঐ হস্ত হইতে বিকীর্ণ আলোকোদ্ভূত অদৃশ্য ছবিও তদ্রূপ বিকাশ করা যায়। ইহার দ্বারা "স্পিরিট ফটো"রও সুন্দর ব্যাখ্যা হয়।

রিচেন্‌ব্যাকের জান্তব চুম্বকশক্তি ও হার্জের তাড়িত-তরঙ্গ (Hertz's Waves of electricity) দ্বারা প্রমাণীকৃত বিষয় সকলের মধ্যে সৌসাদৃশ্য থাকা এবং ডাক্তার ব্যারেটীর (Dr. Barety) মতে, দৃশ্যমান আলোক-রশ্মি সকল যে নিয়মের অধীন, আলোক-পটের পূর্ব্বোক্ত অদৃশ্য আলোক-রশ্মি সকলও সেই সকল নিয়মের অধীন থাকাও, এস্থলে স্মরণ করা আবশ্যক।

বৈজ্ঞানিক দর্শকগণ, নিদ্রিত-বৎ "মিডিয়ামের (medium=যে ব্যক্তিকে মেস্‌মেরাইজ করা হয়) শরীর হইতে ঈষৎ শুভ্র-মেঘবৎ বাষ্প বহির্গত হওয়া ও প্রথমে তাহা মোচাগ্রবৎ আকার ও পরে মনুষ্যাকৃতি ধারণ করা দেখিয়াছেন। কখন কখন এইরূপ অপচ্ছায়াটী (phantom) একটী আলোক-সূত্র দ্বারা "মিডিয়ামের" সঙ্গে সংযোজিত, কখন বা তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ হইয়া গৃহ মধ্যে স্বেচ্ছামত ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে থাকা, দেখা গিয়াছে; এবং যদিও তাহা অদৃশ্য, তথাপি স্পর্শদ্বারা তাহার অস্তিত্বের অনুভূতি জন্মে। এই অপচ্ছায়াকে "মিডিয়াম্" ব্যক্তিগণ "স্পিরিট" (Spirit=প্রেতাত্মা) বলে। কিন্তু, প্যারিস্ নগরীর, ইকোল ডি ম্যাগনেটিজমের, ডি রোশাস্ ও ডার্ভিলের (de Rochas and Durviller of the Ecole de magnetisme, Paris) গবেষণায় জানা যায় যে, "মিডিয়াম্" যখন "হিপনোটিক্" অবস্থায় থাকে, তখন তাহার স্থূল-শরীর স্পর্শ করিলে, এমন কি তাহাতে ঘা দিলেও সে তাহা অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম শরীর (etheral body), যাহা বাষ্পাকারে তাহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত থাকে, তাহাতে স্পর্শানুভূতি বিদ্যমান থাকে এবং তজ্জন্য যখন সেই সূক্ষ্ম-শরীর স্পর্শ কি বিদ্ধ করা যায়, তখন স্থূল-শরীরে সেই স্পর্শ জ্ঞান কি বেদনা অনুভূত হয়। তাহার নাসিকার নিকট "এ্যামোনিয়া" (ammonia) ধরিলে সে তাহার ঘ্রাণ অনুভব করে না। কিন্তু যখন তাহা, তাহার সূক্ষ্ম-শরীরের নাসিকার নিকট ধরা যায়, তখন তাহার স্থূল-শরীরের মুখমণ্ডল আকুঞ্চিত হয়। তজ্জন্য, "ডি রোশাজ" মীমাংসা করেন যে, কোনও কোনও অবস্থায়, শরীর হইতে কেবল যে ঐরূপ বাষ্পোদ্গারণ হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে অনুভব-শক্তি এবং অবশেষে গতিশক্তিও

শরীর হইতে বাহির হইতে পারে। এই অপচ্ছায়া সকল পরলোক হইতে প্রেতাত্মার আবির্ভাবই হউক, কিম্বা মনুষ্য শরীরে সীমার বাহিরে যাইয়া, শরীর হইতে পৃথক হইয়া আত্মার স্বাধীনভাবে কার্য্যকরণ ক্ষমতার প্রমাণই হউক, তাহার সঙ্গে, মৃত্যুর পর আত্মার স্থায়ীত্বের প্রশ্নের সম্বন্ধ আছে। এই সকল আধুনিক আবিষ্কারের বহু পূর্ব্বে হিন্দু দার্শনিকগণ এই আন্তর চুম্বক-শক্তিকে প্রাণের একটী বাহ্যস্ফুরণ বলিয়া জ্ঞাত ছিলেন এবং ইহার উপরই তাঁহাদের প্রাণায়াম যোগের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে, 'প্রাণ' একটী বৈজ্ঞানিক-প্রমাণ-সিদ্ধ সত্য। তাহা কোনও কল্পনা ভিত্তির উপর স্থাপিত দার্শনিক মত নয় এবং তদ্দ্বারা কেবল যে, "ক্লেয়ার ভয়ান্স" (clairvoyans — অতীন্দ্রিয় পদার্থ প্রত্যক্ষানুভূতি শক্তি), অন্যের মনের কথা জানা (mind-reading = মাইণ্ড রিডিং), "টেলিপ্যাথী" (telepathy = দূরবর্ত্তী ব্যক্তিদ্বয়ের মনোভাবের যোগ), "মেস্‌মেরিজম্‌" (mesmerism = সম্মোহনশক্তি) ইত্যাদি অনেক বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা করা যায়, তাহা নয়, তদ্ব্যতীত, আত্মা-ঘটিত যে সকল উচ্চতর অদ্ভুত ব্যাপার দ্বারা, আত্মার শরীর নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নির্ণয় হয়, তাহাদের কারণ ও বাস্তবিকতাও সপ্রমাণ হয়।" *

এই প্রসঙ্গে, এতদ্দেশীয় অদ্বৈতবাদ ও পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করা গেল।

"শঙ্করাচার্য্য বলেন, এই জগৎ স্বপ্নবৎ। শাস্ত্রকার মুনিঋষিগণ আত্ম-প্রত্যয় (intuition) দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, নির্ম্মল আত্মা উপাধিদ্বারা আবৃত। উপাধি মধ্যে তাঁহারা এই কয়েকটী গণ্য করেন—মায়া-মোহাচ্ছন্ন আত্মা, (unconscious spirit) মন, ইন্দ্রিয়গণ (senses), জড়শরীর (material body) অর্থাৎ পঞ্চভূত গঠিত শরীর, এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় (object of senses)। প্লেটোর মতে, এই জগৎ ছায়াবৎ; ইহার প্রকৃত কোনও সত্ত্বা নাই; আমরা মনের সাহায্যে বাহ্য জগৎ দেখি। মনের বিশ্লেষণ দ্বারা দার্শনিক ক্যাণ্টও (Cant) ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন; তাঁহার মতে, কাল, দেশ ও কারণ, এই তিনটী মনের উপাদান; সুতরাং এই তিনটী, আমাদিগকে যাহা দেখায়, অর্থাৎ যে ছবি আমাদের নিকট ধরে, তাহাই আমরা দেখি। যেমন রঞ্জিত কাচখণ্ডের ভিতর দিয়া কোনও বস্তু দেখিলে, সেই বস্তুকে ঐ কাচের বর্ণ বিশিষ্ট দেখায়, কিন্তু তাহার প্রকৃত বর্ণ দেখা যায় না। তবে, প্রকৃত বস্তু কি? মনুষ্য-আত্মা সম্বন্ধে শপেনহয়ার (Schopenhauer) এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। অন্যান্য বস্তুর সম্বন্ধে যেরূপ, মনুষ্যের দৃশ্য-শরীর সম্বন্ধেও তদ্রূপ, অর্থাৎ মনুষ্যের স্থূল-শরীরও প্রকৃত বস্তু নয়। মন, দর্পণস্বরূপ; তাহাতে বাহ্য পদার্থের ছবি প্রতিফলিত হয়; এবং

---

* Sunday's World Magazine নামক পত্রিকায় প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের সর্ব্বপ্রথম আমেরিকান শিষ্য, স্বামী কৃপানন্দের "If a man die, shall he live again" (= মানুষ মরিলে কি পুনর্ব্বার জীবনধারণ করিবে?) শীর্ষক বক্তৃতা অবলম্বনে উপরোক্ত "কোটেশান" ভুক্ত অংশ লিখিত। ইহাঁর পিতা মাতা, ফরাসী ও রুষ বংশীয় ছিলেন। ইনি প্যারিসে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া চল্লিশ বৎসর আমেরিকার যুক্ত-রাজ্যে বাস করেন। বেদান্তধর্ম্মের প্রচার কল্পে, বিষয়কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ইনি সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

মনের কর্ম্মশালায় ঐ সকল প্রতিফলিত ছবি, ভাব বা অনুভূতি সকলের (concepts) আকারে গঠিত হয়। সুতরাং, শরীর অপেক্ষা মনের সঙ্গে আত্মার নিকটতর সম্বন্ধ ; মনের প্রকৃতি দ্বারা ঐ অনুভূতির বিকৃতি হয় ; কিন্তু প্রকৃত বস্তু যে আমাদের আত্মা তাহা মনদ্বারা ঐরূপ বিকৃত হয় না। বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ঐরূপ হইলেও আমাদের অন্তর্জগত সম্বন্ধে তদ্রূপ হয় না। আমাদের অন্তরাত্মার একটী উপাদান প্রবৃত্তি (volition), মনের দ্বারা ঐরূপ বিকৃত হয় না। বরং তাহা মনকেই শাসন করে। তজ্জন্য, মন অপেক্ষা, প্রবৃত্তি, আমাদের অন্তরাত্মার অধিকতর নিকটবর্ত্তী। আমার হস্ত-চালনায়, ঐ দৈহিক কার্য্যটী, মনের দ্বারা, কাল, দেশ ও কারণ বিশিষ্ট ঘটনারূপে অনুভূত হয় ; কিন্তু যে প্রবৃত্তিদ্বারা ঐ দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহা দেশ মধ্যে অবস্থিত নয় এবং বাহ্য জড়-কারণ (external causality) দ্বারা শাসিত হয় না ; তাহাতে কালের উপাদান থাকিতে পারে, কারণ, প্রত্যেক প্রবৃত্তিই যত কেন অল্প হউক না, কিছু সময় গ্রহণ করে। এই প্রবৃত্তি অনেক সময় বিবেক-বুদ্ধি (sense of right) দ্বারা শাসিত হয় এবং বিবেক-বুদ্ধির উৎপত্তি স্থান একটী নিভৃত গভীর গুহায় নিহিত আছে। এই বিষয় বিশেষরূপ চিন্তা করিলে বুঝা যায়, বিবেক-বুদ্ধি যে ভিত্তির উপর স্থাপিত তাহা কালেরও অতীত। শপেনহয়ার এই ভিত্তিকে ইচ্ছা (will) নাম প্রদান করিয়া সেই ইচ্ছাকেই প্রকৃত সত্তা (Real self) বলেন এবং সেই ইচ্ছা হৃদয়ে অবস্থিতি করে। তিনি, ক্যান্টের মত অবলম্বনে ঐরূপ বলেন এবং তাঁহার মত ভারতীয় দর্শন দ্বারাও সমর্থিত হয়। আত্মা (self=প্রকৃত সত্তা) দেশ ও কালের অতীত হওয়ায় তাহা অবিভাজ্য বস্তুরূপে সকল পদার্থ মধ্যে বর্ত্তমান আছে। কারণ, দেশ ও কালের দ্বারাই বিভাগের অনুভূতি জন্মে। গীতাতেও সেইরূপ —"যিনি পরমাত্মাকে জানেন, তিনি সকল পদার্থ মধ্যে তাঁহাকে একই ভাবে দেখেন, নশ্বর-পদার্থ মধ্যে তাঁহাকে অবিনশ্বর দেখেন।" পুরাতন বাইবেলেও আছে—"আমি কি আকাশ ও পৃথিবী পূর্ণ করিয়া বিদ্যমান নয়?"

ইচ্ছা (will), প্রবৃত্তি-প্রসূত চেষ্টায়, কিম্বা নিবৃত্তি জনিত নিশ্চেষ্টায়, প্রকাশ পায়।

পাশ্চাত্য দর্শন মতে, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি-জনিত ক্রিয়ায় প্রকাশ পাইলে, কাল, দেশ ও কারণ মধ্যে প্রকৃতির বল সকলের (forces of nature) যেমন, উত্তাপ, আলোক, মাধ্যাকর্ষণ, প্রভৃতির ভিতর দিয়া কার্য্য করে এবং দৃশ্যমান জগতের নানা সত্ত্বা গঠিত করে * (Deussen's Metaphysics)। ভারতীয় দর্শনের মতেও, আত্মা, জড়ের ত্রিগুণ,—সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ সঙ্গে মিলিত হইয়া বাহ্য জগৎ বিকাশ করে। যখন ইচ্ছা (will), প্রবৃত্তির (volition) অনুসরণ করে, তখন ইহার প্রকৃত অবিভাজ্য একত্ব, কাল ও দেশ মধ্যে বিভক্ত-বিকাশ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় এবং তাহাদের প্রত্যেকটী অহঙ্কার-মার্গে চালিত হইয়া, নিজকে পৃথক পৃথক জ্ঞান করে ; আর, ভিন্ন ভিন্ন অহঙ্কার মার্গে চালিত অহংতত্ত্ব সকলের পরস্পর সংঘর্ষে এই পৃথিবীতে পাপ সৃষ্টি করে। এইরূপে, কারণত্বের (causality) অতীত-হেতু নিবৃত্তিমার্গীয়-

* লর্ড কলভিনের মতে matter is the vortex of energy—শক্তির আবর্ত্তকেই জড় বলে। হিন্দুদর্শনেও, পুরুষের আশ্রিতা প্রকৃতি হইতেই জড়োৎপত্তি।

সারিণী ইচ্ছা, প্রবৃত্তি-মার্গানুসরণ করিলেই পাপ সৃষ্টি হয়।

কিন্তু, ডাক্তার "ডিউসেনের" মতে, সগুণাত্মিকা-ইচ্ছা (affirmation of self—অহঙ্কার?) আমাদের অস্তিত্বের একটী প্রান্তকেন্দ্র (pole) মাত্র; অপর বিপরীত প্রান্ত-কেন্দ্র যাহা অনন্তে (in eternity) অবস্থিত; তাহাও আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ের অন্তরতম স্থানের নিকটবর্ত্তী ও তাহা তথায় প্রাপ্তব্য (obtainable)। ঋগ্‌বেদেও আছে আমাদের সত্তার কেবল এক চতুর্থভাগ ইহলোকে এবং তাহার অবশিষ্ট তিন চতুর্থ ভাগ অমর (=অবিনশ্বর) রূপে পরলোকে অবস্থিত"। এই শেষোক্ত ভাগের উপর আমাদের নৈতিক ভিত্তি স্থাপিত এবং তাহা সগুণাত্মিকা ইচ্ছার স্বাভাবিক অহমিকার অতীত। সুতরাং, নিষ্কাম ইচ্ছাই (will denial) প্রকৃত সত্তা; তাহাই বিবেক বুদ্ধির ভিত্তি; তাহাই লোকের প্রশংসা ও ভক্তি আকর্ষণ করে। ত্যাগ-স্বীকারকারী ব্যক্তিকে লোকে ঈশ্বর-প্রেরিত দূত-জ্ঞানে পূজা করে। গীতায় আছে—ত্যাগ-স্বীকারই নিজের মঙ্গল, ত্যাগ-স্বীকার না করাই নিজের অমঙ্গল। নিষ্কাম ইচ্ছাই প্রকৃত ঈশ্বর, বেদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ। বাইবেলে ইহাকেই পবিত্রাত্মা (Holy ghost) বলে। বাইবেলেও জানা যায়, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে নিজকে অন্যের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় (সর্ব্বভূতে এক আত্মা জ্ঞান জন্মে) এবং তজ্জন্য "Do to others as you would be done by" (অন্যের নিকট যেরূপ ব্যবহার পাইতে তুমি ইচ্ছা কর, অন্যের প্রতি তুমিও সেইরূপ ব্যবহার কর)।" *

শ্রীগুরুগোবিন্দ পাট্টাদার।

* ১৯২০ খৃষ্টাব্দের জুলাই-মাসের Indian Review নামক পত্রিকায় জনৈক খ্যাতনামা দেওয়ান বাহাদুর কর্ত্তৃক লিখিত Adyaitabad and Western Metaphysics Compared (অদ্বৈতবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শন তুলনা) শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ।

পরাজয়-গাথা সপ্তক।

১৯১৪ সালে, ইউরোপের মহা-সমরের আরম্ভে, জর্ম্মনী বেলজিয়মকে পদদলিত করিয়া কিরূপ বিধ্বস্ত করিয়াছিল, তাহা সকলেরই জানা আছে। সেই সময়ে বেলজিয়ান কবি, Emile Cammaerts কয়েকটি মর্ম্মস্পর্শী কবিতায় বেলজিয়মের বীরত্ব, মহত্ত্ব ও ইংলণ্ডের উদারতার বিষয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই যুদ্ধ-গীতি গুলি, ১৯১৫ সালেই, আমাদের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট, লর্ড কর্জ্জন কর্ত্তৃক অনূদিত হয়; তখন ইংরাজি ভাষার পাঠকেরা বেলজিয়ান কবিতা গুলির সহিত পরিচিত হন। ১৯১৬ সালের প্রথমেই আমি Emile Cammaretsএর সাতটি যুদ্ধ-গীতি অনুবাদ করি; নানা কারণে এগুলি প্রকাশিত হয় নাই। কয়েকজনের অনুরোধে এবার প্রকাশিত করিলাম। পরাজিত হইয়াও বেলজিয়ানেরা কি অদম্য উৎসাহে স্বদেশ-প্রেম জাগাইয়া রাখিয়াছিল, এই কবিতাগুলি হইতে তাহা অনেকটা বোঝা যায়।

বেলজিয়ান নিশান।

Le drapeau belge.

[বেলজিয়ান জাতীয় পতাকায় তিনটি রং আছে—কালো, লাল ও হলদে। নিম্নলিখিত কবিতায় সেই তিনটি রংয়ের কারণ ও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে]

রক্তপতাকা উড়িছে আকাশে বীরের রক্ত
স্মরি'; সন্তানহারা জননীর তরে,
কৃষ্ণ নিশান উড়ে অম্বরে;
সমর-বহ্নি-প্রভার চিহ্ন এ পীত পতাকা' পরি।
গৌরবময় এই সে পতাকাতলে
এসো সবে দলে দলে;
স্বদেশের ডাক শুনে চল ধেয়ে—
বাঁচিবে মৃত্যু দলে'।

বীরের রক্ত স্মরণে উড়িছে রক্ত পতাকাগুলি;
কৃষ্ণ নিশান পতিহীনা তরে;
পীতগুলি ঐ উড়ে অম্বরে
জয় গর্ব্বিত বীরের স্বর্ণ-মুকুটের সম জ্বলি।
পতাকার তলে এসো সন্তান দল।
স্বদেশ তোদের ডাকে।
এমন উচ্চে ওড়েনি নিশান কভু
শোভায় সাজিয়া আগে।

রক্তপতাকা উড়িছে আকাশে সমর-অনল তরে
গভীর শোকের চিহ্নের মত
কৃষ্ণ নিশান উড়ে অবিরত;
স্বর্ণপতাকা মৃতে সম্ভাষি উড়িছে গর্ব্বভরে।
এসো সন্তান এসো এ পতাকা তলে
দেশের আশীষ লয়ে।
ধ্বংসের 'পরে উড়িছে নিশান ঐ
উজ্জ্বলতর হয়ে।

গান গাও হে বেলজিয়াম-বাসী, গান গাও।

Chantons, belges, chantons!

[জর্ম্মণীর মত পরাক্রান্ত জাতির সঙ্গে যোগ না দিয়া, ধর্ম্ম ও ন্যায়ের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধে বেলজিয়ানরা পরাজিত হইলেও, সে পরাজয় যে জর্ম্মণীর অন্যায় পথে জয়ের অপেক্ষা গৌরবময়, এই গানে সেই কথাই বলা হইয়াছে]

গাও দেশবাসী সবে!
ক্ষরুক ক্ষতের মুখেতে রুধির,
হোক্ না কণ্ঠ ক্ষীণ,
ডুবাও কামান-নিনাদ গভীর,
রণ-হুঙ্কার ভীম।

গাও আজি পরাভবে,
পরাজয়ে মোরা বিজিত নহিরে,
মহিমা-দীপ্ত আজি,
পরাজয় মাঝে উঠিছে গভীরে
বিজয়-বাদ্য বাজি।

শারদ-সূর্য্য তলে
উপেখি অরির নীচ প্রলোভন
রেখেছি দেশের মান,
চাহি না স্বস্তি শান্তি, যখন
কলঙ্কিত সে দান।

ধ্বংসের পর জ্বলে
প্রচণ্ড তেজে যে অনল রাশি
বাজাও সেখানে ভেরী,
নাচো উল্লাসে হে স্বদেশবাসী,
গৌরব-ভূমি ঘেরি।

আগুন জ্বলিছে চোখে,
ঘূর্ণা নৃত্যে মাথা ঘুরে পড়ি
তবু নাচি ঘুরি ঘুরি,
শুকানো ডালের এ মশাল ধরি,
বাজায়ে ডঙ্কা, তুরী।

আয় ভাই ডাকি তোকে!
সমাধি রচিতে মৃতের লাগিয়া
এমন দিনই ত চাই!
বায়ু ভরে যবে উঠিছে কাঁপিয়া
তরুশির-গুলি ভাই!

শুষ্ক পত্র থেকে
মধু-সৌরভ পড়েছে ছড়ায়ে
সকল কানন ভরে,
মৃত্যু-পুরীতে আজি যেন যায়
সুবাস মৃতের তরে।

বাহুর উপর রেখে,
হে ধরণী! আজি দুলাও আদরে
মৃত সন্ততি দলে,
দাও গো শান্তি শ্রান্তি-কাতরে
তোমার বক্ষ-তলে।

ঘুমায়ে নীরবে সেথা
হয়ত দেখিবে স্বপ্ন-আবেশে
পুন রণ-অভিনয়
উদ্ধারি দেশ, শত্রুর দেশে
ঘোষিবে আপন জয়।

ভাবিয়া নিজেরে জেতা
প্রবেশিবে তারা লইয়া সেনানী
দর্পে শত্রুপুরে;
প্রেরণ করিবে অরি রাজধানী
অতল পাতালে—দূরে

গাও গো স্বদেশ-হারা!
ক্ষরুক ক্ষতের মুখেতে শোণিত
হোক্ না কণ্ঠ ক্ষীণ;
ডুবাও কামান-নিনাদ গভীর,
রণ-হুঙ্কার ভীম।

যদিও শোণিত-ধারা
ক্ষত মুখ হতে ঝরে অবিরল,
তবুও এ ভাঙ্গা বুকে
অরিপরে ঘৃণা রাখিব অটল
আশা-গীত গাব সুখে।

শারদ-আকাশ পরে
জ্বলিছে সূর্য্য, চলিব তাহার
উত্তাপ বহি শিরে
গাহিব দেশের গীতি বার বার
গৌরবভূমি ঘিরে।

গাই এস প্রাণ ভরে,
গরবের সেই কথা,—যে আমরা
করুণা নিয়েছি বরে',
প্রতিহিংসার বাসনা প্রখরা
দূরে ঠেলে গেছি সরে।

অন্ধ বেলজিয়ান ও তাহার পুত্র।

L' aveugle et son fils.

[বেলজিয়ানরা পরাজিত হইয়া যখন স্বদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, তখন অনেকে ইংলণ্ডে পলাইয়া আশ্রয় পাইয়াছিল। অন্ধ-পিতা ও তাহার পুত্রের কথোপকথনে, ইংলণ্ডের মহত্ত্ব ও তাহার প্রতি বেলজিয়ানদের কৃতজ্ঞতা পরিস্ফুট হইয়াছে]

"অরির কামান-ধ্বনি দূর হ'তে
পশেনা শ্রবণে আর;
কোথায় পলায়ে এসেছি পুত্র?
কহ শুনি একবার।"
—"এসেছি স্বাধীন দেশেতে, হে পিতা,
ইংলণ্ড নাম যার।"

"তরীর পালেতে বায়ুর আঘাতে
ভীম-হুঙ্কার নাই ;
দৃঢ় তীর-ভূমি, কম্পিত এই
পদতলে যেন পাই।
দুঃখ অবসান হয়েছে কি ?"—"পিতা
ব্রিটেনে পেয়েছি ঠাঁই।"

"সহানুভূতির কথা যেন শুনি
যদিও বুঝি না ভাষা ;
মনে হয় যেন সুদূরে এসেছি
ছাড়িয়া দেশের আশা।
তবু চেনা স্বর শুনি যেন !"—"পিতা,
ব্রিটেনে পেয়েছি বাসা।"

"সুগন্ধভরা মুক্তির বায়ু
প্রতি নিঃশ্বাসে পাই ;
এ ভাঙা বীণায় স্বর্গের সুর
কেঁপে উঠে বুঝি তাই।"
"হে পিতা, আমরা স্বাধীন দেশের
বুকেতে পেয়েছি ঠাঁই।"

"নদী, পাখী আর তরুরাজি যেন
কহিছে দেশের কথা ;
বিশ্রাম কেন মধুর এমন
কমে গেল কেন ব্যথা ?"
"ইংলণ্ডেতে এসেছি গো পিতা,
তাই এই সজীবতা।"

"এস, এক সাথে নতজানু হয়ে
ওগো বাছা আমি তুমি,
ক্ষত-করে ছুঁই অতিথি-তীর্থ
ব্রিটেনের পূত-ভূমি ;
স্মরিয়া স্বদেশ, এস তারপর
এদেশের মাটি চুমি।"

ইংলণ্ডে পলায়ন।

Fuite en Angleterre.

[জর্ম্মনীর অত্যাচারে, মেরী তাঁহার বৃদ্ধস্বামী যোসেফ ও শিশুপুত্র যীশুখৃষ্টকে লইয়া ইংলণ্ডে পলাইতেছেন, এই কথা কবিতাটিতে বলা হইয়াছে। কবিতাটির মর্ম্ম এই যে, অন্যায় অত্যাচার হইতে ধর্ম্ম দূরে চলিয়া যান]

আঁধার নিশীথে যায় দূরান্তে চলে,
নাহিক বিরাম, নাহি বিশ্রাম পথে ;
শিশুটি চাপিয়া শুষ্ক-বক্ষ তলে,
পলায় জননী স্বামী সাথে সেথা হ'তে।

আঁধার নিশীথে যায় দূরান্তে চলে,
পশ্চাতে ফেলি নগর পল্লী যত ;
ত্যজিয়া রক্ত-পিপাসু ঘাতক দলে,
আঘাতে যাদের কাঁদে অসহায় শত।

"কার তরে কোথা চলেছ বৃদ্ধ তুমি,
সঙ্গে লইয়া যুবতী পত্নী তব ?"
—"লুকাতে শিশুটি, খুঁজি মোরা নরভূমি,
খুঁজিগো নূতন মানুষ, হৃদয় নব।"

নিশীথ আঁধারে সুনীলাম্বর তলে,
দ্রুতগতি ঐ পলায় তাহারা হায় !
চরণ-শব্দ ক্ষীণ হয় পলে পলে,
পদাঙ্কগুলি ধূলায় মিলায়ে যায় !

১৯১৫ সালে নববর্ষের কামনা
(জর্ম্মণ সৈন্যের প্রতি)।

Vaux de Nouvel an, 1915,
A´l'armée Allemande.

[অত্যাচারী জর্ম্মণ সৈন্যদের প্রতি, স্বদেশহারা উৎপীড়িত, বেলজিয়ামদের তপ্ত অভিশাপ]

প্রতি মুহূর্ত্তে তোমাদের প্রাণ
আঘাতে ভাঙিয়া যাক্ ;
প্রতি পদক্ষেপে পদতলগুলি
জলে পুড়ে হোক্ খাক্।

বিশ্ব-মাধুরী চোখে যেন আর
নাহি ফোটে পলে পলে ;
যাত্রা করিও দিবস রজনী
আঁধার গগন-তলে।

ছোট যে ফুলটি বিকশিত ওই
রয়েছে বেড়ার কোণে,
চেওনা সেদিকে ; অন্ধ হইয়া
চলে যাও নিজ মনে।

প্রেয়সীর বাণী, শিশুর কাহিনী
যে গান জাগায় প্রাণে,
সে গীতি, সে কথা, এ জীবনে যেন
না পশে তোদের কাণে।

অস্ত্র তোদের প্রোথিত হউক
আমাদের ভূমিতলে ;
মোদের নদীর বন্যা ডুবাক্
তোদের সৈন্য দলে।

প্রেত-বিভীষিকা নিশীথে তোদের
করুক বিরামহীন ;
হতের রুধির-স্মৃতি তোমাদের
ভরিয়া রাখুক দিন।

মোদের ভগ্ন-গৃহ-অবশেষ
পড়ুক তোদের শিরে ;
যাতনায় যেন জ্ঞানহারা হোস্,
তেজ নাহি পাস্ ফিরে।

ঝঞ্ঝাতাড়িত পশুর মতন
ছুটে যাস্ পালে পালে।
মোদের সকল দুঃখ ফিরিয়া
আসুক্ তোদের ভালে।

দীর্ঘ-জীবনে ইহলোকে তোরা
কাঁদিস্ গভীর শোকে,
তা' দেখে দেবতা করুণা করুন
তোমাদের পরলোকে।

ছোট দেশের বড় রাজার প্রতি।

Au grand roi d'un petit pays.

[বেলজিয়ম ছোট দেশ, কিন্তু তাহার অধিপতি রাজোচিত শৌর্য্য ও বীর্য্যে কাহারও অপেক্ষা ছোট নহেন। বেলজিয়ম-বাসী তাই সগর্ব্বে সেই রাজা ও স্বদেশের জন্য প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত]

চালাবে যেথায় চলিব সেথায় তুচ্ছ করিয়া প্রাণ !
তুষার-পাত ও বর্ষা ঠেলিয়া,
মাঠ-ঘাট-বন পিছনে ফেলিয়া,
চলিব আমরা তোমারি আদেশে
করিতে জীবন দান।

শিখাবে যে কাজ করিব তাহাই,
'যেথা লবে যাব সুখে,
অনল ও অস্ত্র পদতলে দলে'
রণ-কোলাহল মাঝে যাব চলে;
ঝঞ্ঝনারব শত অস্ত্রের ভয় না জাগাবে বুকে !

তোমারি সঙ্গে চলিব আমরা তুচ্ছ করিয়া প্রাণ !
আহতের ক্ষীণ ক্রন্দন ঢেকে,
গর্জ্জে কামান যেথা থেকে থেকে
চলিব সেথায় তোমারি আদেশে
করিতে জীবন দান।

দূর করি দিয়া পীড়কে আমরা
ফিরিব দেশের মাঝে।
বিমল আকাশে মাথা তুলি তার
দুর্গের চূড়া জাগিবে আবার !
প্রবেশিবে তুমি শত্রুর দেশে
বিজয়ী বীরের সাজে।

রক্ষক রাজা ! তোমারে রক্ষা করুক জগৎপাতা
হে মুষ্টিমেয় সেনানীর পতি !
বরিয়াছ মান উপেখিয়া ক্ষতি,
পাবে আশ্রয় বিভুর চরণে, দীন-আশ্রয়দাতা !

ক্ষুদ্র দেশাধিপতি! তোমা তরে জীবন করিব দান।
দেশ-গৌরব! বীর-ব্রত-ধারী!
বিশ্বপ্রেমের ভক্ত পূজারি!
তোমারি সঙ্গে চলিব আমরা তুচ্ছ করিয়া প্রাণ!

সৈন্যদের তামাকের জন্য।

Pour la pipe des soldats.

[M. Emile Cammaerts যুদ্ধের সময় যে কবিতার বইখানি প্রকাশিত করেন, এই কবিতাটি তাহার উৎসর্গ-পত্র। তাঁহার এই পুস্তকের আয় তিনি বেলজিয়ান সৈন্যদের তামাকের খরচের জন্য দিয়াছিলেন]

গোপন যে সব মরমের কথা
বলিতে মন না সরে,
সে সব আজিকে কবিতায় গেঁথে
সাজায়েছি থরে থরে,
সরম ত্যজিয়া, হৃদয় আমার
মুক্ত করেছি হেন
সবা'র সমুখে, আজিকার দিনে,—
জান কি গো ভাই কেন?
রাখিতে দেশের গৌরব যারা যুদ্ধক্ষেত্রে যায়,
শ্রান্তি-বিনোদে যেন গো তাহারা
তামাক একটু পায়!

নিভৃত-মনেরে বাহির এনেছি
দিনে দিনে পলে পলে,
অটল প্রেমের কাহিনী গেয়েছি
হাসি অশ্রুর ছলে,
সব আবরণ ঘুচায়ে, হৃদয়
প্রকাশ করেছি হেন,
মুক্ত করেছি সবার সমুখে,—
জান কি গো ভাই কেন?

তারকা-খচিত আকাশের তলে
যুদ্ধ করিছে যারা,
শ্রান্তি বিনোদে একটু তামাক
পায় যেন ওগো তারা!

আছে কি না আছে মধু-কল্পনা,
হয়ত বে-সুর বীণ্‌,
ছলা কলা নাই,—সরল এ গাথা
বুঝি তান-লয় হীন!
হাসিবে হয়ত তোমরা, আমার
স্পর্দ্ধা দেখিয়া হেন।
তবুও হৃদয় খুলিয়া দিয়াছি
জান কি গো ভাই কেন?
কামানের গোলা-বর্ষণ মাঝে যুদ্ধ করিছে যারা,
শ্রান্তি-বিনোদে তামাক একটু
খেতে পায় যেন তারা!

শ্রীসুনীতি দেবী।

দেও-উমগা (মুঙ্গা)।

উমগা নগরের বিষয় উল্লেখ না করিলে দেওর ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। উমগা প্রাচীন নগরী এবং বর্ত্তমান দেব রাজবংশের পূর্ব্বতন রাজধানী। এই নগর এখন পর্ব্বতোপরি ভগ্নাবশেষে পরিণত হইয়া অতীত কাহিনীর সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। দেওদেবক্রম সম্বন্ধে অনেক স্থানে আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু উমগার ইতিহাস কেহই লিখেন নাই। ইহা গয়াজেলায় অন্তর্গত আওরঙ্গাবাদ সবডিভিজনস্থ রাণীগঞ্জের সন্নিকটে অবস্থিত।

উমগা দেও হইতে চারি ক্রোশ পূর্ব্বদিকে

একটি প্রাচীন বৃহৎ জনস্থান হইতেছে। ইহা পর্ব্বতোপরি অবস্থিত; ইহার সীমার মধ্যে বায়ান্নটি প্রাচীন রাজগণের খনিত জলাশয় ও ঐ সংখ্যক মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। এই মন্দির গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎটি বিক্রমাব্দ ১৪৯৬ সালে নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় এবং রাজা ভৈরবেন্দ্রের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। ইহার সম্বন্ধে পরে বিবৃত করিতেছি। এই লিপি উমগার পর্ব্বতমালার উপরিস্থ গৌরী-শঙ্কর মন্দিরের গাত্রে সংযুক্ত আছে। এই লিপি ২২ × ১৫ ইঞ্চি প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদিত এবং ১৫ পংক্তিতে অঙ্কিত হইয়াছে। এই লিপি আমার বন্ধু ৺পরমেশ্বর দয়াল বহু কষ্টে উদ্ধার করেন। * এই লিপি নিম্নে প্রদত্ত হইল। এইখান হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বদিকে, বনের মধ্যে, সাঙ্কাইল পর্ব্বতের উপর খণ্ডেশ্বরনাথ শিব বিরাজ করিতেছেন। এই লিপি ১৫০০ সম্বতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই লিপির ভাষা আধুনিক দেবনাগর অক্ষরে। এই লিপির বয়স অনুসন্ধান করিলে মোটামুটি অবগত হওয়া যায় যে, দুর্দ্দমনর-পতি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে উমগায় রাজ্যশ্রী পরিচালন করিতে ছিলেন। উমগায় পঁয়তাল্লিশ মাইল পূর্ব্বদিগে, ফতেপুর পুলিষ ফাঁড়ির সন্নিকট, আর একটি খণ্ডেশ্বরনাথ শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। উমগা হইতে পঁচিশ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে, কোঁচ নগর বিরাজ করিতেছে। কোঁচের মন্দির সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধযুগ অধ্যায়ে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছি। কোঁচের প্রাচীন ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির উমগায় স্থাপয়িতা ভৈরবেন্দ্রের দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়া এদেশে এক প্রাচীন প্রবাদ আছে। এইখানে প্রাপ্ত দুইটি লিপির মধ্যে চন্দ্রবংশীয় তেরটি রাজার বৃত্তান্তও কুর্শীনামা পাওয়া যায়।

* J. A. S. B. (N. S.) Vol. II, p. 23.

উমগা-লিপি।

ওঁ নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায় ॥ আসী-দ্দুর্দ্দমদুঃখদাবদহনঃ সোমান্বয়ে দুর্দ্দমস্তৎপুত্রঃ কুলপালকো গুণনিধির্ন্নাম্না কুমারোঽভবৎ। তস্মাল্লক্ষণপাল একসুকৃতী চন্দ্রস্তুতশ্চন্দ্র (ৎপ) প্রাক্যোনয়পাল একশরণঃ সন্দেশইত্যাত্মকঃ ॥১। যজ্ঞে যোঽভয়দেব এক পুরুষোমল্লঃ প্রসূত (স্তু) তস্তস্মাৎ কেশবভক্তিযুক্তি-নিপুণঃ কেশীশ্বরো ধার্ম্মিকঃ। তৎসূনুর্ন্নরসিংহ এব রিপুজিত্তানুর্ম্মহীয়াং সুতঃ সোমঃ সোমকুলাব-তন্স পরমোব্রহ্মাগুদঃ কোটিদঃ ॥২। তস্মাল্লোক বিবর্জ্জনোনৃপগুরুর্বংশস্থ কর্ত্তা প্রভুঃ শ্রেষ্ঠঃ সদ্ব (সুলো) কপো বসুমতী যেনাস্তি-রাজন্বতী। দীনত্রাণ তলাগয়াগদিবিষৎপ্রাসাদ-কৃদ্ধর্ম্মবিচ্ছ্রী মন্তৈরবভূপতিগর্গজপতিঃ কীর্ত্ত্যা-চরামোপমঃ ॥ ৩। উমাং মহেশংসগণং গণেশং সংস্থাপ্য বেধাবিদধে বিধিজ্ঞঃ। নদাদিবর্য্যৈরু-মগং গুণাঢ্যং সোসাম্বয়ানামিহ পত্তনং চ ॥ ৪। গিরৌ গিরীশং গিরিজাং গণেশং খখেষুচন্দ্রে খলু বিক্রমাব্দে ॥ জ্যৈষ্ঠেঽসিতেমাসতিথৌচ চন্দ্রে প্রতাষ্ঠি পন্তৈরব (should be প্রাতি-ষ্ঠিপৎ) একভূপঃ ॥ ৫। অন্নাস্বেনাপি সম্বত ১৫০০ ॥ কৃত্বাপি পাতকং ঘোরং ব্রহ্মহত্যাদিকং নরঃ। কারয়িত্বা হরের্দ্ধাম ধুতপাপোদিবং ব্রজেৎ ॥ ৬। তীর্থে চায়তনে পুণ্যে সি (দ্ধক্ষে) ত্রেতথাশ্রমে। কর্ত্তুরায়তনং বিক্ষোর্যথোক্তাস্ত্রি-গুণং ফলং ॥৭। ফলশতগুণং শৈলে (যথো)-ক্তাৎ পরিকীর্ত্তিতং। সহস্রগুণিতং শৃঙ্গে কর্ত্তুর্দেবালয় স্য চ ॥ ৮। শুভমস্তু সর্ব্বম্ ॥

দেওরাজ্যের মধ্যে উমগা নগরীতে প্রাপ্ত দুইটি প্রস্তর লিপির মধ্যে উপরোক্তটি ক্ষুদ্রতর

লিপি ও প্রথমটি বৃহত্তর আটাশ শ্লোকের তিন হাত লম্বা ও দেড় হাত চৌড়া প্রস্তর খণ্ডে মহারাজ ভৈরবেন্দ্র স্বীয় বংশতালিকা বিক্রম সম্বৎ ১৪৯৬ সালে খোদিত করিয়া মন্দির গাত্রে আঁটিবার স্থান পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এই বৃহত্তর লিপি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। ভগ্নাবশেষ প্রাসাদ ও মন্দিরস্তূপ মধ্যে অনেক প্রস্তর খণ্ডের উপর খোদিত লিপি দৃষ্ট হয়। কিন্তু বহুকালের "কাই ও ছাতা" জমিবার কারণ সেগুলির সহজে পাঠোদ্ধার করা যায় না। পৌষ সংক্রান্তির সময় এখানে স্থানীয় লোক লইয়া একটা পনর দিন ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

মহাভারত-মঞ্জরী।

আদিপর্ব্ব।

চতুর্থ অধ্যায়—ভীষ্মদেব।

মহাভারতের কাব্যপটে ভীষ্মদেব অতি উজ্জ্বল, অতি মনোহর চিত্র। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে, ততদিন তাঁহার নাম ভারতের গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইবে। ভীষ্ম উপাধি; আসল নাম, দেবব্রত। তিনি রাজা শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি প্রথম বয়সে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি সমুদয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া মহাপণ্ডিত হইয়া উঠেন। যৌবনে যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়া ভারত-বিখ্যাত হন। কিন্তু তাঁহার অগাধ জ্ঞান ও অসাধারণ বীরত্ব অপেক্ষা, পিতৃভক্তিই তাঁহাকে চিরবরেণ্য ও চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহার পিতা একদিন মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। তিনি বনে বনে মৃগের অনুসরণ করিতে করিতে যমুনাতীরে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী খেয়া নৌকা চালাইতেছে, পথিকদিগকে যমুনা নদীর এক পার হইতে অন্য পারে লইয়া যাইতেছে। তাহার শরীর হইতে পদ্মগন্ধ নির্গত হইতেছে। রাজা মুগ্ধ হইলেন, পরাজিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণী উত্তর করিল, "আমি ধীবর কন্যা, নাম সত্যবতী।"

ইহারই গর্ভে পূর্ব্বে মহর্ষি বেদব্যাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা শান্তনু তখনই তাহার পিতার নিকট উপস্থিত হইলেন, সত্যবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। ধীবর বলিল, "তাহা ত সুখের কথা, সম্মানের কথা। কিন্তু আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই সিংহাসন দিতে হইবে।" রাজা উত্তর করিলেন, "তাহা অসম্ভব। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র দেবব্রতই রাজা হইবে।" ধীবর বিবাহ দিতে অসম্মত হইল। রাজা নিরাশ ও নিরানন্দ মনে গৃহে গমন করিলেন।

ক্রমে একথা দেবব্রত জানিতে পারিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমার পিতা কি আমার জন্য অসুখী হইবেন? তাঁহার স্নেহ ভালবাসার এই পরিণাম হইবে? দেবব্রত কর্ত্তব্য স্থির করিলেন। অবিলম্বে সেই ধীবরের গৃহে উপনীত হইলেন, পূর্ব্ব প্রস্তাব পুনরায় তুলিলেন। ধীবর উত্তর করিল, "সে ত আনন্দের কথা। কিন্তু আমার কন্যার গর্ভজাত পুত্রকেই রাজা দিতে হইবে।" অমনি দেবব্রত

বলিলেন, "প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কখনও পিতৃরাজ্য গ্রহণ করিব না।" তখন বুদ্ধিমান ধীবর হাসিয়া উত্তর করিল, "আপনি না লইতে পারেন, কিন্তু আপনার পুত্রগণ পরিত্যাগ করিবে কেন?" কুমার হাসিয়া বলিলেন, "আমি পুনরায় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি কখনও বিবাহ করিব না।" ধীবর বিস্মিত হইল, মুগ্ধ হইল। তখনই সত্যবতীকে তথায় আনয়ন করিল। দেবব্রত তাঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করিয়া রথে তুলিয়া লইলেন, অচিরে হস্তিনায় লইয়া আসিলেন। রাজা শান্তনু তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। পূর্ব্বে ভারতের সকল জাতিই সকল জাতির কন্যা বিবাহ করিত *।

দেবব্রতের ভীষণ প্রতিজ্ঞার কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। এজন্য রাজা শান্তনু তাঁহাকে 'ভীষ্ম' উপাধি প্রদান করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছা না হইলে মৃত্যু হইবে না, এই বরও দিলেন। ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছেন।

এই রাণী সত্যবতীর গর্ভে শান্তনুর দুই পুত্র জন্মিল। বলিয়াছি, তাহাদের নাম চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য। শান্তনুর মৃত্যুরপরে তাহাদিগকেই ভীষ্ম একে একে রাজা করিয়াছিলেন। তাহাদের অল্প বয়স বলিয়া, ভীষ্ম, সত্যবতীর মতানুসারে, রাজকার্য্য পরিচালন করিতেন। তিনি আজীবন বেতন-ভোগী অমাত্যের ন্যায় অবস্থিতি করিয়াছেন, কখনও স্বীয় মতকে প্রবল করিতে চেষ্টা পান নাই। তিনি পিতার সুখের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে মনে কতই আনন্দ উপভোগ করিতেন।

বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইলে, হস্তিনার সিংহাসন শূন্য হইল। কুরুবংশ নির্ব্বংশ হইতে চলিল। তখন রাণী সত্যবতী ভীষ্মকে বিবাহ করিতে ও রাজা হইতে কত অনুরোধ করিলেন। তিনি উত্তর করিলেন, "মা, আপনার বিবাহ সময়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা কোন কারণেই ভঙ্গ করিতে পারিব না। পৃথিবী গন্ধহীন হইবে, জল রস বর্জ্জন করিবে, বায়ু স্পর্শগুণ শূন্য হইবে, সূর্য্য নিষ্প্রভ হইবে, তথাপি আমি সত্য পরিত্যাগ করিব না। সেই সত্যের তুলনায় কুরুবংশ, কৌরব-রাজ অতি সামান্য, অতি অকিঞ্চিৎকর।" ধন্য ভীষ্মদেব! ধন্য তোমার চরিত্র! চরিত্র যার, পৃথিবী তার।

পঞ্চম অধ্যায়—কুরুপাণ্ডবের অস্ত্রশিক্ষা।

পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণ কৃপাচার্য্যের নিকট নানাবিধ শাস্ত্র ও যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন। এখন তাঁহারা মহাবীর দ্রোণাচার্য্যের নিকট উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। সে সময় এক ভীষ্মদেবের নীচেই দ্রোণাচার্য্য মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার যশে আকৃষ্ট হইয়া কর্ণ প্রভৃতি অপরেও তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

অর্জ্জুন রজনীতেও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন। দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া, অন্ধকারে অদৃশ্য লক্ষ্যভেদ করেন, উভয় হস্তে তুল্যরূপে বাণ বর্ষণ অভ্যাস করেন। ক্রমে অর্জ্জুন ও কর্ণ ধনুর্বিদ্যায় এবং ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে আর সকলকে অতিক্রম করিলেন।

একদিন ছাত্রগণ মৃগয়া করিতে বনে

* এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে "বিবাহ" দ্রষ্টব্য।

গিয়াছেন। তথায় অর্জ্জুন দেখিলেন, একলব্য নামে এক নিষাদ-পুত্র অবিরাম বাণ বর্ষণ করিতেছে, অবিরাম জ্যা-নির্ঘোষ নির্গত হইতেছে। অর্জ্জুন বিস্মিত হইলেন। ফিরিয়া আসিয়া আচার্য্যকে বলিলেন,—"গুরুদেব, আপনি বলিয়াছিলেন, আমিই ধনুর্দ্ধারীগণের অগ্রগণ্য। কিন্তু দেখিলাম, আপনার শিষ্য একলব্য আমাকেও অতিক্রম করিয়াছে।" আচার্য্য উহা শুনিয়া অর্জ্জুনকে লইয়া সেই বনে উপস্থিত হইলেন। একলব্যের নিকট তাহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধ অঙ্গুলী গুরু-দক্ষিণা চাহিলেন। একলব্য তখনই তাহা বাম হস্তদ্বারা ছেদন করিয়া গুরুদেবকে প্রদান করিলেন। তাঁহার হস্ত হইতে দরবিগলিত ধারে রুধির নির্গত হইতে লাগিল, তৎপ্রতি তিনি একবারও দৃক্‌পাত করিলেন না। সকলে দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। আচার্য্য ও অর্জ্জুন চলিয়া আসিলেন। একলব্য আবার অবশিষ্ট অঙ্গুলী দ্বারা বাণ বর্ষণ অভ্যাস করিতে লাগিলেন এবং চেষ্টা ও সাধনাদ্বারা অচিরে মহাধনুর্দ্ধারী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। সাধনায় কি না হয়? আজ ভারতে সে সাধনা কোথায়?

দ্রোণাচার্য্য একদিন ছাত্রগণের পরীক্ষা লইতে চাহিলেন। তিনি মৃত্তিকা দ্বারা একটী পাখী নির্ম্মাণ করিয়া এক বৃক্ষের উপর বসাইয়া রাখিলেন। পরে যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি সমুদয় ছাত্রগণকে একে একে আনিয়া সেই পাখীর মস্তক ছেদনার্থ লক্ষ্য স্থির করিতে বলিলেন। লক্ষ্য স্থির হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি দেখিতেছ?" যুধিষ্ঠির, দুর্য্যোধন, কর্ণ প্রভৃতি সকল ছাত্রই বলিলেন, "ঐ পাখী, বৃক্ষ ও আপনাকে দেখিতেছি।" তাহাতে আচার্য্য বিরক্ত হইয়া, সর্ব্বশেষে অর্জ্জুনকে ডাকিলেন। তিনি গুরুদেবের আদেশে লক্ষ্যভেদার্থ বাণ স্থির করিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুদেব তাঁহাকেও সেই প্রশ্ন করিলেন। অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "একমাত্র ঐ পাখী দেখিতেছি।" তাহাতে আচার্য্য আনন্দিত হইয়া ঐ পাখীর মস্তক ছেদন করিতে বলিলেন। অর্জ্জুন অমনি বাণ নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে দ্রোণাচার্য্য একদিন রাজসভায় গিয়া বলিলেন, "কুমারগণের শিক্ষা শেষ হইয়াছে।" তাহা শুনিয়া সকলই আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

আজ ভীষ্মদেব কুমারগণের শেষ পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। এক বিস্তৃত প্রান্তরে মনোহর মঞ্চ ও গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। আজ দলে দলে নাগরিকগণ তথায় সমবেত হইতেছে। দ্রোণাচার্য্যের শুক্ল কেশ, শুক্ল বেশ, শুক্ল উপবীত, শুক্ল শ্মশ্রু, শুক্ল মালা, শুক্ল চন্দন-চর্চ্চিত কৃষ্ণকায় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে *। ক্রমে রাজা ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্মদেব, বিদুর, সঞ্জয়, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলেই আগমন করিলেন। গান্ধারী ও কুন্তী আসিলেন। অন্যান্য রাজ-মহিষীগণও দাসীগণ সহ আসিয়া মঞ্চে আরোহণ করিলেন। তখন বোধ হইতে লাগিল যেন দেবপত্নীরা সুমেরু-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। † পূর্ব্বে ভারতে অবরোধ-প্রথা ছিল না। ‡

ক্রমে রঙ্গস্থল লোকে পূর্ণ হইল। কুমার-গণ অপূর্ব্ব বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব

* আদিপর্ব্ব ১৩৪—১৯। দ্রোণাচার্য্য এখনই বৃদ্ধ! † আদিপর্ব্ব ১৩৪—১৬।

‡ এসম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের পঞ্চম অধ্যায়ে "অবরোধ-প্রথা" দ্রষ্টব্য।

রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহারা কৃত্রিম-যুদ্ধ করিতে করিতে প্রকৃত-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। পরস্পর পরস্পরকে যথা-শক্তি গদার প্রহার করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য তাহা দেখিয়া স্বীয় পুত্র অশ্বত্থামা দ্বারা তাঁহাদিগকে নিবারিত করিলেন। দুর্য্যোধন তখন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। নিকৃষ্ট ভীম তাঁহার ন্যায় রাজপুত্রকে প্রহার করিয়াছে বলিয়া অতি অভিমানী অধীর হইতে লাগিলেন।

এখন অর্জ্জুন বিচিত্র রণকৌশল দেখাইতে লাগিলেন। কখনও দ্রুতগামী রথোপরি, কখনও ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে, কখনও ভূতলে থাকিয়া পলকে পলকে বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর লক্ষ্য ভেদ করিতে লাগিলেন। সমবেত সকলেই তাঁহার অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহা দুর্য্যোধনের অসহ্য হইতে লাগিল।

এমন সময় কর্ণ আসিলেন। তিনি অর্জ্জুনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, "অপেক্ষা কর, তোমাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ রণকৌশল দেখাইব।" এই বলিয়া বিবিধ প্রকারের রণনৈপুণ্য দেখাইলেন। দুর্য্যোধন তাহাতে আনন্দিত হইয়া কর্ণকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে আজ তুমি আসিয়াছ। আমি তোমার অধীন। তুমি এই কৌরব-রাজ্য ইচ্ছানুসারে উপভোগ কর, আর শত্রুগণের মস্তকে পদাঘাত কর।"

কর্ণ তাহাতে স্ফীত হইয়া উঠিলেন। অর্জ্জুনকে বলিলেন, "আজ নিশ্চয়ই তোমার শিরচ্ছেদ করিব। এস, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।" দুর্য্যোধন কর্ণকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই রঙ্গভূমি দুই দলে বিভক্ত হইল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি কৃপাচার্য্য বুঝিলেন, আত্মদ্রোহ উপস্থিত-প্রায়। তখন তিনি অগ্রসর হইয়া কর্ণকে বলিলেন, "রাজপুত্রেরা কখনও নীচ-বংশের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করেন না। তুমি কোন্ বংশে জন্মিয়াছ, অগ্রে বল; পরে বিবেচনা করা যাইবে, তোমার সহিত অর্জ্জুনের দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ সম্ভবপর কিনা।"

তাহা শুনিয়া কর্ণ মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। দুর্য্যোধন ভাবিলেন, এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হইলে কর্ণ এখনই অর্জ্জুনকে নিহত করিতে পারিবেন, এখনই পাণ্ডবগৌরব অস্তমিত হইবে, আজই আমি নিরাপদ হইব। তিনি অতি দর্পে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "আচার্য্য যাহা বলিতেছেন, তাহাই যদি দ্বন্দ্ব যুদ্ধের নিয়ম হয়, তাহা হইলে আমি কর্ণকে অঙ্গ রাজ্যের রাজা করিলাম। এখন তিনি অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন।" দুর্য্যোধনের আজ্ঞায় অনুচরগণ তখনই অভিষেকের দ্রব্যাদি তথায় আনিল, তখনই কর্ণ অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। দুর্য্যোধন, অঙ্গরাজ্য কর্ণকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে, একবারও পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না। পিতাও তাঁহার কার্য্যে কোন বাধা দিলেন না।

কর্ণের বৃদ্ধ পিতা, সূত জাতীয় অধিরথ সারথি শুনিলেন যে তাঁহার প্রাণের পুত্র রাজা হইয়াছে। অমনি তিনি দ্রুতপদে, স্খলিত বস্ত্রে, "কর্ণ! কর্ণ!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে ডাকিতে সেই মহাসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা কর্ণ, দীন হীন পিতাকে অস্বীকার করিলেন না। বরং তিনি তখনই মস্তক অবনত করিয়া পিতার চরণ বন্দনা করিলেন। পুত্র সত্যই রাজ্য পাইয়াছে, সত্যই রাজা হইয়াছে, জানিয়া দরিদ্র পিতা

আনন্দে বিহ্বল হইলেন। পুত্রকে সস্নেহে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন।

এদিকে কুন্তীদেবী, কর্ণ আসিবামাত্র এক দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। যতই দেখিতেছিলেন, ততই দেখিতে ইচ্ছা হইতেছিল। এখন কর্ণার্জ্জুন যুদ্ধ আরম্ভপ্রায় দেখিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইলেন। বিদুর ও পরিচারিকাগণ চন্দনজল সেচন করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। এখন কুন্তীদেবী নীরবে, উদ্বিগ্ন মনে বসিয়া রহিলেন। আর ভাবিতে লাগিলেন, কর্ণার্জ্জুনের যুদ্ধ নিবারণের উপায় কি ?

এদিকে ভীম, কর্ণের আস্ফালন ও দর্প দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। বলিলেন, "তুমি এই সামান্য সারথির পুত্র হইয়া এত গর্ব্ব করিতেছ ! তুমি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইবারও উপযুক্ত নহ।" তাহা শুনিয়া দুর্যোধন দ্রুতপদে আসিয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্, তোদের জন্মের কথাও সকলের জানা আছে।" অমনি পাণ্ডবেরা গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। উভয় পক্ষ দুই দলে বিভক্ত হইলেন। যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় সূর্য্যাস্ত হইল, কাযেই বিবাদ আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিল না। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের হস্ত-ধারণ করিয়া অতিদর্পে রঙ্গস্থল হইতে চলিয়া গেলেন। কর্ণ এখন হইতে পাণ্ডব-বিদ্বেষে পূর্ণ হইলেন। কাযেই দুর্য্যোধনের মিত্র ও মন্ত্রী হইলেন। আর শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি বন্ধুগণ দুর্য্যোধনের নীচ-প্রবৃত্তির মূলে কুপরামর্শের সলিল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন। হায়, কুসংসর্গের ন্যায় সর্ব্বনাশের কারণ আর কিছুই নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়—মহাবীর দ্রোণাচার্য্য।

এই কি সেই দেশ, যেখানে নিঃস্বার্থপর, নিষ্কাম ব্রাহ্মণবংশেও মহাবীরের আবির্ভাব হইত ? পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা কি চিরদিনের জন্য এ দেশ হইতে অদৃশ্য হইয়াছেন ? নতুবা এদেশের এত অধঃপতন হইবে কেন ?

দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজ মুনির পুত্র। তিনি অসাধারণ বীর ছিলেন। পরশুরামের নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতি দুর্লভ অস্ত্রশস্ত্র লাভ করিয়া অতুলনীয় হইয়া উঠেন।

কৃপাচার্য্য ও তাঁহার ভগিনীকে রাজা শান্তনু প্রতিপালন করিয়াছিলেন। দ্রোণ কৃপাচার্য্যের ভগিনীকে বিবাহ করিলেন। তাহার ফল, পুত্র অশ্বত্থামা।

দ্রোণাচার্য্য অতি দরিদ্র। একদিন অশ্বত্থামা, ধনীর পুত্রগণকে দুগ্ধপান করিতে দেখিয়া, দুগ্ধের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্য্য সমুদয় গ্রাম অনুসন্ধান করিয়াও দুগ্ধ পাইলেন না। তখন অন্য বালকেরা জলে পিঠালী গুলিয়া, তাহাই দুগ্ধ বলিয়া অশ্বত্থামাকে দিল। বালক তাহাই পান করিয়া, "আমি দুগ্ধ খাইয়াছি," বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। তখন সেই বালকেরা দ্রোণকে বিদ্রূপ করিল। বলিল, "দ্রোণ এতই দরিদ্র যে পুত্রকে একটু দুগ্ধও দিতে পারেন না!" তাহা শুনিয়া দ্রোণের মনে ঘৃণা হইল। তিনি তখনই অর্থের অন্বেষণে নির্গত হইলেন।

কোথায় যাইবেন ? ভাবিলেন, "পাঞ্চাল রাজকুমার দ্রুপদ আমার সহপাঠী ছিলেন, পাঠ্যাবস্থায় আমাকে "সখা," "সখা", বলিয়া ডাকিতেন। অর্দ্ধেক রাজ্যও দিতে চাহিয়া-

ছিলেন। এখন তিনি রাজা; তাঁহার নিকট গেলে অন্ততঃ দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হইবে”। এই ভাবিয়া, তাঁহার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু যেই তাঁহার সভায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে ‘সখা’ বলিয়া ডাকিলেন, তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, “যেমন মূর্খ পণ্ডিতের সখা হইতে পারে না, কাপুরুষ যেমন বীরপুরুষের সখা হইতে পারে না, তেমনি দরিদ্র ব্যক্তিও ধনীর সখা হইতে পারে না। অগ্রে রাজা হও, পরে রাজার সহিত সখ্যতা করিতে আসিও।” এই বলিয়া তিনি দ্রোণাচার্য্যকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। মহাবীরকে আশ্রয় দিলে তিনিও যে আশ্রয় প্রাপ্ত হইতেন, অহঙ্কারে তাহা বিস্মৃত হইলেন।

দ্রোণাচার্য্য এখন হস্তিনায় আসিয়া কৃপাচার্য্যের গৃহে গুপ্তভাবে বাস করিতে লাগিলেন। ভীষ্মদেব তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সভায় আনিয়া, তাঁহার উপর মহাসম্মান বর্ষণ করিলেন। গুণী ভিন্ন গুণীর মর্ম্ম কে বুঝিবে? এখন ভীষ্মদেব পাণ্ডব ও কৌরব কুমারগণের শিক্ষার ভার দ্রোণের উপর অর্পণ করিলেন।

দ্রোণাচার্য্য সে কার্য্য কি ভাবে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। এখন তিনি ছাত্রগণের নিকট গুরুদক্ষিণা চাহিলেন। বলিলেন, “তোমরা দ্রুপদ-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দীভাবে লইয়া আসিবে, এই দক্ষিণা চাহি।” ছাত্রগণ সম্মত হইয়া বহু কৌরবসৈন্য-সহ নির্গত হইল।

কিন্তু অহঙ্কার-দীপ্ত কৌরব-কুমারগণ কি দরিদ্র পাণ্ডবগণের সহায়তা লইয়া দ্রুপদরাজের সহিত যুদ্ধ করিবে? তাহা অসম্ভব। তাই কৌরবেরা পাণ্ডবগণকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া, পশ্চাতে রাখিয়া, দ্রুপদরাজকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া পলাইয়া আসিয়া, অবনত মস্তকে পুনরায় পাণ্ডবগণের সহিত মিলিলেন। পাণ্ডবেরা যখন দেখিলেন যে দুর্য্যোধন ও কর্ণের দর্প খর্ব্ব হইয়াছে, তখন অগ্রসর হইয়া মহাপরাক্রমে দ্রুপদরাজকে আক্রমণ করিলেন। তিনি অর্জ্জনের নিকট পরাজিত হইলেন। ভীম তাঁহার সৈন্য বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অর্জ্জন নিষেধ করিলেন*। পরে দ্রুপদরাজকে বন্দী করিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট লইয়া আসিলেন। দ্রোণ বলিলেন, “রাজন্, ভয় নাই। ক্ষত্রিয়ের বাক্য নবনী তুল্য কোমল ও মধুর। কিন্তু হৃদয় ক্ষুর-ধার সদৃশ। আর ব্রাহ্মণের বাক্য তীক্ষ্ণধার তুল্য কিন্তু হৃদয় নবনী-বৎ কোমল, সহজেই দ্রব হয়†। এজন্য ব্রাহ্মণের স্বভাবই ক্ষমা করা। কিন্তু তুমিত রাজা না হইলে দরিদ্রের সহিত সখ্যতা করিবে না! এজন্য আমি গঙ্গার উত্তর তীরবর্ত্তী তোমার অর্দ্ধ-রাজ্য গ্রহণ করিলাম, আর দক্ষিণ তীর-স্থিত অর্দ্ধ-রাজ্য তোমাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। তুমি এখন আমার সহিত সখ্যতা করিতে প্রস্তুত কি?” দ্রুপদ ভাবিলেন, সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা হইলে, পণ্ডিতগণ অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিয়াও, অপরার্দ্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন। তিনি মুখে সৌজন্য ও সখ্যতা প্রকাশ করিয়া, অর্দ্ধরাজ্য লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু সত্য সত্যই কি দ্রুপদ দ্রোণের বন্ধু হইল? তাহাও কি সম্ভব? তিনি কিরূপে এই অপমানের প্রতিশোধ লইবেন, দিবা রাত্রি ভাবিতে লাগিলেন। রাত্রি দিন তাঁহার প্রাণে প্রতিহিংসানল জ্বলিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে এক অগ্নি-বর্ণ পুত্র হইল। তৎপরে দ্রৌপদী নামে এক কন্যা জন্মিল। ইহাদিগের পূর্ব্বে দ্রুপদরাজের শিখণ্ডী নামে এক সন্তান হইয়াছিল। কালে দ্রোণাচার্য্যের নিকট শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন, যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়া অসাধারণ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন‡। রাজা দ্রুপদ এইরূপে দুই মহাবল সন্তান পাইয়া প্রবল হইয়া উঠিলেন। যাহার দ্বারা পিতৃকুল উজ্জ্বল হয়, সে-ই প্রকৃত সন্তান। আর সকলে কুষ্মাণ্ড মাত্র। (ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

* আদি পর্ব্ব, ১৩৮—৬১।

† উদ্যোগ পর্ব্ব, ১৮১—১।

‡ আদি পর্ব্ব, ৩—১২৩।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের নিকটে কয়েকটী কথা।

(১)

প্রিয় ছাত্রবর্গ—

আজ কয়েকদিন হইতে তোমাদের মধ্যে non-co-operation-নীতির অঙ্গ-স্বরূপ কলেজ-বর্জ্জন লইয়া, বিশেষ একটা উন্মাদনার ভাব লক্ষিত হইতেছে। এ সম্বন্ধে তোমাদিগকে আমি কয়েকটী কথা বলিব। তোমরা আমার কথাগুলি নিবিষ্ট-চিত্তে ভাবিয়া দেখিবে, এ আশা আমার আছে। চতুর্দ্দশ পুরুষ হইতে, আমাদের বংশ অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে। চরিত্রের পবিত্রতা এবং অধ্যাপনাকেই যাঁহারা জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের বংশে উদ্ভূত হইয়া, আমিও, তোমাদের অধ্যাপকতার কার্য্যে, প্রায় বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছি। এই জন্যই, আমার মনে হয় যে তোমাদিগকে এই মহা সঙ্কিক্ষণে কিছু বলিবার আমার অধিকার আছে; এবং তোমরাও উত্তেজনার মুখে, কথাগুলি উড়াইয়া না দিয়া, ভাবিয়া দেখিবে।

দেশের যাঁহারা নেতা, অপর গুণের মধ্যে, তাঁহাদের একটী গুণ সর্ব্বাপেক্ষা সমধিকরূপে থাকা নিতান্তই বাঞ্ছনীয়। সেইগুণটী—তাঁহাদের 'মতের' স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা। যাঁহাদের উপদিষ্ট পথে চালিত হইতে ইচ্ছা করিয়া, তোমরা, যাঁহাদের কথায়, জীবনের এত বড় একটা গুরুতর ব্যাপারে আপনাদিগকে চালিয়া দিতেছ, তাঁহারা যে কর্ত্তব্য-কার্য্যটীর নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন, সেটী সুস্পষ্ট, সন্দেহ-বর্জ্জিত এবং সর্ব্বপ্রকার মত-দ্বৈধ-পরিশূন্য হওয়া নিতান্তই আবশ্যক। আমি প্রথম হইতেই ইহাঁদের মতের বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়াছি; ইহাঁরা কোন্ উদ্দেশ্য লইয়া তোমাদিগকে কি কার্য্য করিতে বলেন, তৎ-সম্বন্ধে কোনই স্পষ্ট ধারণা করিতে পারা যায় না; যতই ভাবিয়া দেখা যায়, ততই ইহাঁদের কথায় পরস্পর বিরোধ ও মত-দ্বৈধই ফুটিয়া উঠে। কেন আমার মনে কোন স্পষ্ট আভাস মুদ্রিত হইতেছে না, একে একে তোমাদিগকে সেই কথাটাই বলিব।

সর্ব্বপ্রথমে "নায়কের" কথাটাই বলিব। এই পত্রিকার সম্পাদক যখন তোমাদের দ্বারা আহূত সভা-ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তোমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন এবং তোমরাও যখন তাঁহার পরামর্শ শুনিবার নিমিত্তই তাঁহাকে সভায় আহ্বান করিয়াছ,—তখন, তাঁহাকেও আমি তোমাদের নেতৃ-স্থানীয় বলিয়া ধরিয়া লইব। ইনি, তোমাদিগের যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন, তাহা অবশ্যই তোমাদের গ্রহণীয়। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। ইনি ইহাঁর নিজের মতের স্থিরতা ও দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন কি না? যদি দেখিতে পাই যে, ইনি আপন মতের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা হইলে, আজ ইনি তোমাদিগকে যাহা করিতে বলিতেছেন, সেটী যে ইহাঁর সুচিন্তিতপূর্ব্ব দৃঢ় মত, তাহা যে পুনরায় পরিবর্ত্তিত হইবে না,—তদ্বিষয়ে স্থিরতা থাকে কৈ? কেন এরূপ সন্দেহ আমার মনে উপস্থিত হইতেছে, তাহা বলিতেছি।

বেশী দিনের কথা নহে। যখন আলিগড় কলেজে ও বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে, ছাত্রবর্গের মধ্যে কলেজ-বর্জ্জনের আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছিল, সেই সময়ে 'নায়ক'-সম্পাদক, তাঁহার দৈনিক 'নায়কে', অতীব সুস্পষ্ট-ভাষায়, বাঙ্গলাদেশের ছাত্রবর্গ 'ঠেকিয়া শিখিয়াছে" বলিয়া, এ দেশে যে ঐ আন্দোলন ফল-প্রসূ হইবে না, এই কথাই বলিয়াছিলেন; এবং বাঙ্গলার ছাত্রবর্গকে কলেজ বর্জ্জন-নীতি হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইবারই পরামর্শ দিয়াছিলেন। যে সময়ে নাগপুরের কংগ্রেসের সভাপতি ছাত্রবর্গের কলেজ-বর্জ্জন-নীতির বিরুদ্ধে আপনার মন্তব্য উদ্‌ঘোষিত করিয়াছিলেন, তখনও 'নায়কে', সভাপতির মতের সহিত নিজের মতেরও মিল আছে বলিয়া, সম্পাদক, আমাদিগকে স্পষ্ট-ভাষায় বলিয়া দিয়াছিলেন। সম্পাদক বলিয়াছিলেন—

"তিনি (শ্রীযুত বিজয় রাঘব) ছাত্রদিগের স্কুল-কলেজ বর্জ্জনের বিরোধী। * * * বিশেষতঃ ছাত্রদিগের বিদ্যালয়-পরিত্যাগের বিরুদ্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, কেহই তাহার খণ্ডন করিতে পারেন নাই। * * * ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া বয়াটে হইয়া যাইলে কি লাভ হইবে? এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। তাই আমরাও এই বিষয়ে সভাপতির সহিত একমত"— ইত্যাদি। ১৯শে পৌষের 'নায়ক'।

আর, আজ যদি সেই 'নায়কে'র সম্পাদক,—যিনি, তোমরা কলেজ ছাড়িলে "বথাটে" হইয়া যাইবে বলিয়াছিলেন—তোমাদিগকে কলেজ ছাড়িবার পরামর্শ দেন ও তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া উপদেশ দেন,—তবে তাঁহার কোন্ মতটীকে আমরা ঠিক্ মত বলিয়া ধরিয়া লইব? পূর্ব্বের কথিত মতটী, না এখনকার কথিত মতটী?

এই সম্পর্কে আর একটী দৃষ্টান্ত দিব। এই কিছুদিন পূর্ব্বে, যে সময়ে গো-বধ-নিবারণের আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং অনেক মুসলমানও সেই আন্দোলনে যোগ দিতে লাগিলেন, ঠিক্ ঐ সময়ে 'নায়কে' হঠাৎ "গো-রক্ষণী-সভা" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ সম্পাদকীয় স্তম্ভে বাহির হইল। এই প্রবন্ধে সম্পাদক লিখিয়াছিলেন যে,—

"অতি পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে এত অধিক পরিমাণে গো-হত্যা হইত যে, তাহা শুনিলে গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তাহার পরিমাণে আজকাল যে গো-হত্যা হয় তাহা কিছুই নহে।"

এই কথা বলিয়া, বেদের সংহিতা-ভাগ, ব্রাহ্মণ-ভাগ ও সূত্রাদি গ্রন্থ হইতে কতকগুলি বচন উদ্ধৃত করিয়া, "সকলকে অনুগ্রহপূর্ব্বক দেখিতে ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখিতে" বলা হয়। এই প্রবন্ধটী পড়িলে ইহাই মনে অনিবার্য্যরূপে ফুটিয়া উঠে যে, প্রাচীনকালে যখন হিন্দুরা "অধিক পরিমাণে" গো-হত্যা করিতেন, তখন এ আন্দোলনটী নিরর্থক।

ইহারই কিছুদিন পরে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ যখন প্রাচীনকালের গো-হত্যা-সম্পর্কিত বচন-গুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে বসিলেন এবং বোধ করি যখন চারিদিকে নিন্দা ঘোষিত হইতে লাগিল, তখন 'নায়কে,' ঐ প্রবন্ধের ভাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা প্রকাশিত হইল। তখন 'নায়কে' লেখা হইল—

"কেন যে এমন সময়ে আমরা বেদে গো-হত্যার নানা (?) কথার উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাহার উত্তর আর কিছুদিন পরে ঘটনাচক্রে আপনি ফুটিয়া উঠিবে * * * এখন কোন হিন্দু যেন এমন রব না তোলেন যে, হিন্দু বৈদিক-যুগে গো-খাদক ছিলেন"—ইত্যাদি। (৩০শে আশ্বিনের 'নায়ক')।

তোমরা অবশ্যই দেখিতে পাইতেছ যে, 'নায়ক' কেমন করিয়া আপনার মতের পরিবর্ত্তন করিয়া লয়েন! ইঁহার কোন্ কথাটা

তোমরা খাঁটি স্থির বলিয়া ধরিয়া লইবে; যাঁহার মতের এরূপ চঞ্চলতা, তাঁহার নির্দ্দেশিত মত-দ্বয়ের মধ্যে, তোমরা কোন্‌টীকে আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিবে?

প্রিয় ছাত্রবর্গ! তোমাদের যাঁহারা অপরাপর নেতৃ-স্থানীয়, তাঁহাদের মধ্যেও, তোমাদের এই কলেজ-বর্জ্জন ও ইউনিভার্সিটী-বর্জ্জন সম্বন্ধে মতের ঐক্য দেখিতে পাইতেছি না। মহাত্মা গান্ধী কি প্রকার 'উদ্দেশ্য' লইয়া কলেজ-বর্জ্জন-নীতিটী প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন? আমরা সকলেই জানি, ইংরাজ গবর্ণমেন্টকে অচল করিবার উদ্দেশ্যই তাঁহার মুখ্য-উদ্দেশ্য। তাঁহার মতে, যে গভর্ণমেণ্ট, জাতির অবমাননা করিয়াছেন এবং আপন প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করিয়া শপথ-ভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাদৃশ গভর্ণমেণ্টের সংস্পর্শে আসিলে পাপ-গ্রস্ত হইতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কি, মহাত্মা গান্ধী-প্রদর্শিত এই মহান্ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়াই কলেজ-ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ? যদি উহাই তোমাদিগের প্রাণের একমাত্র প্রধান লক্ষ্য হইত, তবে তোমরা কেন ন্যাশন্যাল-কলেজ স্থাপনের জন্য সোৎকণ্ঠ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছ? ইহা ত এই আন্দোলনের মুখ্য-উদ্দেশ্য নহে। সহস্র সহস্র ছাত্র, কলেজ ছাড়িলেও ত গভর্ণমেণ্টকে অচল করিতে পারা যাইবে না। মহাত্মা গান্ধী ত ন্যাশন্যাল কলেজ স্থাপনকে গৌণ অবান্তর-কার্য্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

আবার দেখ, এ বৎসর যিনি নাগপুর কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও ত দেশবাসীর নেতাই বলিতে হইবে। তাঁহার নিজের মত কি ছিল, মনে করিয়া দেখ ত। ভোটে তাঁহার নিজের মত টিকে নাই সত্য, কিন্তু ভোট-দাতারা ত দেশের 'নেতা' নহেন। নেতা তিনিই। তোমরা শুনিয়াছ, এই সভাপতি, সুস্পষ্ট-ভাষায়, তোমাদিগকে কলেজ ছাড়িয়া দিতে নিষেধ-বার্ত্তাই জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা এ স্থলেও, দুই জন নেতৃ-স্থানীয় মহাপুরুষের, দুই প্রকার মত ও দুই প্রকার উপদেশ পাইতেছি।

আবার দেখ, লালা লাজপত রায়কেও কংগ্রেসের সভাপতিত্বে বরণ করা হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকেও দেশবাসীর নেতা বলিব। ইনিও কলেজ-পরিত্যাগের অনুকূল মত প্রকাশ করেন নাই। সম্প্রতি তিনি বলিতেছেন যে, ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়স্কের পক্ষে, কলেজ-পরিত্যাগ আদৌ কর্ত্তব্য নহে। এ স্থলেও আমরা মতের স্থিরতা দেখিতেছি না।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহোদয় আত্ম-ত্যাগের মহান্ আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি তোমাদিগকে কলেজ-ত্যাগের বিধি দিয়াছেন। কিন্তু একটী কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিব। তাঁহার মতেও, "স্বরাজ" লাভই মুখ্য ও প্রধান লক্ষ্য; কলেজ ত্যাগ ইহার আনুষঙ্গিক মাত্র। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালও "স্বরাজ" প্রাপ্তিকেই তোমাদের মুখ্য লক্ষ্য বলিয়া ধরিতে বলিতেছেন। কোন কোন নেতা আবার, তোমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া একথাও বলিয়া দিতেছেন যে,—কলেজ ত্যাগের পর, নূতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া, ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থার জন্যই যে, এই non-co-operation এর মুখ্যগতি, তাহা নহে। ছাত্রগণ ত্যাগ-স্বীকারে দীক্ষিত হইবে দুঃখদৈন্য বরণ করিয়া লইবে,—ইহাই ইহার লক্ষ্য। আমরা এ

স্থলেও নেতাদিগের পরস্পর কথায় ও মতে —একটীমাত্র, স্থির, দৃঢ়, অটল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দেখিতেছি না।

যখন উপদেশের উদ্দেশ্য ঠিক্ একরূপ নহে এবং উপদেশের মধ্যেও যখন মত-দ্বৈধ স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, তখন তোমরা কোন্ উদ্দেশ্যকে ও কাহার পরামর্শকে স্থির, অচঞ্চল রূপে ধরিয়া লইয়া, কলেজ পরিত্যাগে সমুদ্যত হইয়াছ? যে কার্য্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে মত-দ্বৈধ এবং পরস্পর বিরোধ থাকে, সে কার্য্যে স্বতঃই এই জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইবে যে, তোমরা কি উদ্দেশ্য লইয়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ? তোমাদিগের মনের মধ্যে, এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন সুচিন্তিত ধারণা আছে কি?

প্রবাসী-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ বাবু তোমাদিগকে বলিয়াছেন যে, Science Collegeটী দেশীয় লোকের অসাধারণ ত্যাগ-স্বীকারের অর্থ দ্বারা যখন গঠিত হইয়াছে এবং উহা যখন দেশীয়গণ দ্বারা চালিত, সুতরাং Science College ত্যাগ ছাত্রদিগের পক্ষে সমীচীন হইবে না। আমি রামানন্দ বাবুর এই যুক্তিপূর্ণ উক্তিগুলিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধেই প্রয়োগ করিতে চাই। প্রথম সংস্থাপন হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মহান্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা দেশের কত মহানুভব দানশীল মহাপুরুষগণের অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে। ইহার প্রত্যেক খানি ইষ্টক-খণ্ড দেশীয় অর্থে উৎসর্গীকৃত। ইহা সম্পূর্ণরূপে দেশীয়দিগের দ্বারা পরিচালিত। গবর্ণমেন্টের সংস্রব ও control নাম-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া রহিয়াছে। ইহা বাঙ্গালীর একটা প্রকাণ্ড গৌরবের নিদর্শন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ইহা যদি অস্বীকার কর, তাহা হইলে বড় অকৃতজ্ঞতা প্রকটিত হইবে! এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সম্প্রতি মহাপুরুষ সার্ আশুতোষের প্রভাব ও সামর্থ্যে যে নূতন শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইয়াছে,—যত দোষই থাকুক—ইহার মত জাতীয়-শিক্ষা-প্রণালী ভারতের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবলম্বিত হইতে পারে নাই। তোমরা national বা জাতীয়-শিক্ষা-প্রণালী লাভের নিমিত্ত উৎসুক্য প্রকাশ করিতেছ; কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যে প্রকার মহীয়ান্ জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহা কখনই উপেক্ষা করিতে পার না। যদি কর তবে নিতান্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে। এই শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বারান্তরে তোমাদিগকে কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদান করিব।

---

(২)

প্রিয় ছাত্রবর্গ—

তোমাদিগকে আমি আর কয়েকটী কথা বলিতে চাহিতেছি। নিজের বিচার-বুদ্ধির প্রয়োগ না করিয়া, নিতান্ত অন্ধ-ভাবে অপরের পরামর্শের বা কার্য্যের অনুসরণ—এটী অতীব নিন্দনীয়। এরূপ করিলে চিত্তের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া, অনুচিকীর্ষা ও পরতন্ত্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মহাত্মা গান্ধী নাগপুরে ছাত্রবর্গকে পুনঃ পুনঃ বলিয়া দিয়াছেন যে, ছাত্রদিগের পক্ষে ইহাই কর্ত্তব্য হইবে যে, যদি তাহারা নিজে বিচার-বুদ্ধির পরিচালনা দ্বারা, অ-সহযোগিতা বা কলেজ-বর্জ্জন নীতিকেই তাহাদের অবলম্বন-যোগ্য বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে সেই নীতিই তাহারা গ্রহণ করিবে। মহাত্মা গান্ধীর ইহাই অভিপ্রায়; ইহাই সুস্পষ্ট উপদেশ। ষোড়শ-বর্ষ-

বয়ঃক্রমের নির্দ্ধারণও—এই কথাই দৃঢ়ীকৃত করিতেছে। আমার মনে হইতেছে যে, তোমরা দুই দিন যে কাণ্ড করিয়াছ, তাহাতে মহাত্মা-জীর এই আদেশটী প্রতিপালিত হয় নাই; বরং তাঁহার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ-কার্য্যই করা হইয়াছে। একথা কেন আমার মনে আসিতেছে, তাহা বলিতেছি। যে সকল ছাত্র বি-এল্ পরীক্ষা দিবার জন্য এবং আই-এ পরীক্ষার ফি দিবার নিমিত্ত কলেজ-গৃহে প্রবেশ করিতে গিয়াছিল, তোমরা তাহাদিগের প্রবেশ-পথে শুইয়া তাহাদের প্রবেশে বাধা জন্মাইয়াছিলে। আমার মনে হয়, ইহাতে ঐ সকল পরীক্ষার্থী ছাত্রদিগের বিচার-বুদ্ধি ও স্বাধীনতার উপরেই হস্তক্ষেপ করা হইয়াছিল। উহারা ত নিজের চিত্তে বুঝিয়া, সুঝিয়া, বিচার-বিতর্ক দ্বারাই পরীক্ষা দেওয়াই শ্রেয়স্কর বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল। নতুবা উহারা যাইবে কেন? তোমরা যদি উহাদিগকে বাধা না দিয়া, পরীক্ষা না দেওয়ার পক্ষে যে সকল যুক্তি আছে, সেই যুক্তিগুলি প্রদর্শন করিতে এবং না যাইবার জন্যই বিশেষ অনুরোধ করিতে,—তাহা হইলেই মহাত্মার উপদেশের মত কার্য্য করা হইত। বাধা জন্মাইতে গিয়া, ঐ সকল পরীক্ষার্থীর স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগকেই ত ক্ষুণ্ণ করা হইল! পথ-রোধ করার অর্থই ত, প্রকারান্তরে, তাহাদিগকে, নিজের বিচার-বুদ্ধিতে জলাঞ্জলি দিয়া, তোমাদের প্রদর্শিত কার্য্যের অন্ধ-অনুসরণ করিতে বলা!! আমার মনে হয়, কোন সমর্থ ব্যক্তিকেই, তাহার অন্তর্নিহিত স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি যাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া, কেবল অন্ধানুচিকীর্ষা জাগিয়া উঠে, তদ্রূপ কোন কার্য্যে প্রশ্রয় না দেওয়াই—মহাত্মা গান্ধীজীর উপদেশের একমাত্র লক্ষ্য। তোমরা সেই লক্ষ্যের অনুকূলে কার্য্য কর নাই—বলিয়াই আমার বিশ্বাস। পথ-রোধ, একরূপ বাধা-প্রদানেরই নামান্তর মাত্র; কেন না ইহা পরীক্ষার্থীর বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগের স্বাধীনতা-কেই কুণ্ঠিত করিল।

আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা বলিব। সম্প্রতি, national বা জাতীয় কলেজ স্থাপন এবং জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য, তোমাদের চিত্ত নিরতিশয় আকুল হইয়া উঠিয়াছে। তোমরা স্বদেশ-প্রেম দ্বারা অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছ। জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতির দিকে যে তোমাদের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে, ইহা দেখিয়া আমি অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি।

কিন্তু, আমার মনে অনেকদিন হইতেই একটা গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকবার আমার মনে হইয়াছে যে, অর্থকরী বিদ্যার্জ্জনের দিকেই তোমাদের লক্ষ্য; চতুর্দ্দশ পুরুষের অনুমোদিত, জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতির দিকে তোমাদের লক্ষ্য নহে। কেন আমার মনে সর্ব্বদাই এই সন্দেহ আসিয়াছে, তাহা বলিতেছি। আমি তোমাদিগের দৃষ্টি, Post-Graduate class গুলির প্রতি আকর্ষণ করিতেছি। এই Post-Graduate-শিক্ষা বিভাগে, যে সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের অতীত গৌরব অদ্যাপি ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র প্রখ্যাপিত করিতেছে, সেই সকল বিষয়ের প্রধান প্রধান শিক্ষিতব্য বিষয়ের জন্য, শ্রেণীসকল সংস্থাপিত হইয়াছে। এ কথা তোমরা জান। ভারতের বেদ ও আরণ্যক; ভারতের সুপ্রখ্যাত দর্শন-শাস্ত্রের মধ্যে বেদান্ত, সাংখ্য, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, প্রভৃতি দর্শন-গুলি; ভারতের প্রাগৈতিহাসিক বিভাগের অবশ্য-জ্ঞাতব্য গ্রন্থ-নিচয়—এ সকলই সংস্থাপিত

হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই সকল ক্লাশের প্রত্যেক ক্লাশেই যে সকল ছাত্র বৎসরের পর বৎসর, ভর্ত্তি হইতেছে, তাহাদিগের সংখ্যা এত কম কেন? আর, ইংরাজী সাহিত্য, ইংরাজী গণিত, ইংরাজী ইতিহাস, ইংরাজী সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতি খাঁটি ইংরাজী বিভাগস্থ ক্লাশ গুলিতেই বা এত ছাত্রাধিক্য কেন? এই অত্যন্ত বিসদৃশ ছাত্র সংখ্যার তারতম্য-দর্শনে, স্বতঃই অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত মনে উদিত হয় যে,—তোমাদের এই যে "জাতীয়-শিক্ষা-পদ্ধতি" অবলম্বন ও সংস্থাপনের জন্য ব্যাকুলতা দেখা যাইতেছে, এই ব্যাকুলতাটা ঠিক্ প্রাণের কথা নহে। এটা বোধ হয় সাময়িক একটা অস্থায়ী উত্তেজনার অভিব্যক্তি মাত্র! তোমরা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে বি-এ পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করিয়া, তার পরে এই Post-Graduate ক্লাশ গুলিতে প্রবেশ করিয়া থাক। সুতরাং, কেবল সংস্কৃত বিদ্যা শিখিয়া বর্ত্তমানে উপযোগিতা লাভ করা যায় না—এই জন্যই ভারতীয় প্রাচীন-শিক্ষা-বিভাগে ছাত্রসংখ্যা তত হয় না,—এ আপত্তিও ত উত্থাপন করা অসম্ভব। তাই আমার মনে হয় যে, অর্থকরী বিদ্যাই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাহা না হইলে, কোথায় বা তিন শত—আর কোথায় বা দুইটী বা তিনটী মাত্র ছাত্র!! এমন বিস্ময়-জনক বৈষম্য কেন বৎসরের পর বৎসর দেখিতে পাই?

তোমাদের মধ্যে যখন ধীরে ধীরে এই কলেজ-বর্জ্জন-নীতি প্রবিষ্ট ও শনৈঃ শনৈঃ প্রসারিত হইতে লাগিল, তখন আমাদের মনে কি প্রকার আশা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একটা প্রকৃত কথা তোমাদিগকে আমি শুনাইতে ইচ্ছা করি। আমরা—এই ইউনিভার্সিটীর অধ্যাপকেরা—এই আশা করিতেছিলাম যে, চারিদিকের এই আন্দোলনের সময়ে, বাঙ্গলার ছাত্রবর্গ সার্ আশুতোষের পক্ষাবলম্বন করিবে এবং তাঁহারই পতাকামূলে সমবেত হইবে! আমরা কেন এই প্রকার আশা করিতেছিলাম, শুনিবে কি?

তোমরা জান, সার্ আশুতোষকে সকলে fighting man নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কেন করে? স্যার্ আশুতোষ, আপন জীবনের প্রায় সমগ্র অংশটাই, গভর্ণমেণ্টের প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর কঠোরতার বিরুদ্ধে এবং যাহাতে ছাত্রবর্গের অধ্যয়ন, অবস্থান ও পরীক্ষা বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারে সুবিধা হয়, তাহারই অনুকূলে, সর্ব্বত্র, সর্ব্বদাই অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন। যাহাতে গভর্ণমেণ্ট কোন প্রকার কঠোর-নীতি অবলম্বন না করিতে পারেন, ইহাঁর সর্ব্বতো-ব্যাপ্ত চক্ষু সর্ব্বদাই সেদিকে জাগরূক ছিল। এই ছাত্র-বৎসলতার জন্যই, ইনি অনেক সময়ে অনেক গভর্ণমেণ্টের শক্তিশালী কর্ম্মচারিগণের অসন্তোষ-ভাজন হইয়াছেন * এবং তাঁহাদের তাদৃশ প্রিয় হইতে পারেন নাই। প্রধানতঃ, ছাত্রবাৎসল্যের জন্যই ইহাঁর এই দশা!! এই নিমিত্তই, স্বভাবতঃই আমাদের মনে এই কথাটাই উদিত হইয়াছিল যে, তোমরা,—বাঙ্গলা দেশের ছাত্রবর্গ,—কখনই সার্ আশুতোষকে ত্যাগ করিবে না!

যে সময়ে ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জ্জন, ইউনিভার্সিটী সংক্রান্ত নূতন নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তন করেন, সেই সময়ে ছাত্রবর্গের মধ্যে এবং অধ্যাপকগণের মধ্যেও, পাঠ্য

* তোমাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়াই ত ইহাঁকে Sharp সাহেবের কোপদৃষ্টিতে পতিত হইতে হইয়াছিল।

গ্রন্থাবলীর গুরু-চাপে এবং পরীক্ষার প্রশ্ন ও পদ্ধতির অতি কঠোরতার একটা ভাবী আশঙ্কার সঞ্চার হইয়া উঠিয়াছিল। তখনকার দিনের সেই অতি-আতঙ্কের কথা, এখনও আমাদের মধ্যে অনেকের মনে সম্যক্ মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। 'কার্জ্জনীয়' নিয়মাবলীর প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-ভুক্ত ছাত্রবর্গ আর সহজে 'পাশ' করিতে পারিবে না,—উহাদের কৃতকার্য্যতার সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে, সর্ব্বত্র এই প্রকার একটা ত্রাসের সঞ্চার হইয়া উঠিয়াছিল! কিন্তু সেই বৎসরের শেষ ভাগ হইতেই, সেই ত্রাসের পরিবর্ত্ত, ছাত্র ও অধ্যাপকমণ্ডলী ও অভিভাবকগণের অন্তঃকরণে, হর্ষেরই উৎপত্তি হইতে আরম্ভ হয়। সার্ আশুতোষ তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন বলিয়াই, কার্জনীয় কঠোর নীতি অপকার-জনক ফল প্রসব করিতে পারে না। কত বিপদ হইতে বাঙ্গলার ছাত্রবর্গকে তিনি, তখন এবং পরবর্ত্তী 'স্বদেশী' আন্দোলনের যুগে, রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং বর্ত্তমানে ও সর্ব্বদাই করিতেছেন—একথাটা অন্ততঃ বাঙ্গলা-দেশের ছাত্রবর্গ ভুলিয়া যাইবে না—যাইতে পারে না। বর্ত্তমান সঙ্কটে বাঙ্গলার ছাত্রবর্গ, তাঁহার সাহায্যার্থে, তাঁহারই পক্ষাবলম্বন করিবে, আমরা অনেকে এই আশাই পোষণ করিতেছিলাম।

কেবল বাঙ্গলাদেশের ছাত্রবর্গ কেন? তাঁহার অসাধারণ কার্য্যকারিণী শক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই Post Graduate বিভাগের ছাত্রবর্গের কথাও বিশেষ করিয়া আমাদের মনে উদিত হইতেছিল। Post Graduate বিভাগের ছাত্রগুলি সকৃতজ্ঞচিত্তে, সার্ আশুতোষকে মমতা দ্বারা জড়াইয়া ধরিবে,—আমরা অনেকে এই আশাটাও মনে স্থান দিতেছিলাম। পূর্ব্বকালের শিক্ষা-পদ্ধতি এবং বর্ত্তমানের Post Graduate শিক্ষা-পদ্ধতি—এই উভয় পদ্ধতির দিকে একবার চাহিয়া দেখ। আমি অন্যান্য কথা-কথা এস্থলে উত্থাপিত করিব না। তোমরা national বা জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠার কথা বলিতেছ। তোমাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি—Post-Graduate শিক্ষা-কেন্দ্রে, কোন্ জাতীয় শিক্ষা-প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহা কাহার অসাধারণ মনীষা ও কর্ম্ম সামর্থ্যের পরিচায়ক? হিন্দুর বেদ, আরণ্যক ও দর্শন শাস্ত্র—বিশ্ববিখ্যাত। যে সকল বিদ্যায় হিন্দুজাতির পৃথিবী বিখ্যাত কীর্ত্তি ছিল, সেই সকল বিদ্যার কোনটাই উপেক্ষিত হয় নাই। এই সকল স্ব-জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতের অন্যত্র দেখিতে পাইবে না। এই সকলের ব্যবস্থা করিতে প্রত্যেক সময়ে প্রত্যেক বিভাগে, সার্ আশুতোষকে যে সকল বিরুদ্ধ-মতাবলম্বী শক্তিশালী ব্যক্তিগণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, এবং যে প্রকার ক্লেশ, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত, সেই সকল প্রতিকূল অবস্থা ও বিরুদ্ধবাদী লোক-দিগকে আপন মতে শনৈঃ শনৈঃ লইয়া আসিতে হইয়াছিল,—তাহা স্মরণ করিলে, সার্ আশুতোষের নিকটে দেশ ও দেশবাসী যে কত কৃতজ্ঞ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। একথা দৃঢ়তার সহিত বলিব যে, এই সকল ব্যবস্থা নানা স্থানে মঞ্জুর করিয়া লইতে এবং অবশেষে ভারত গবর্ণমেন্টের চরম-অনুমোদন লাভ করিতে যে প্রকার সূক্ষ্মদর্শিতা তর্ককুশলতা, শাস্ত্রাভিজ্ঞতা এবং সর্ব্বোপরি সাহস ও বাক্‌পটুতার আবশ্যক হইয়াছিল, তাহা কেবল সার্ আশুতোষেরই উপযুক্ত।

সর্ব্বশেষে, দেশের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় এই বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তন,—এটী অপর কোথাও দেখিতে পাইবে না। তাই বলিতেছিলাম, কোন্ মহাপুরুষের ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও যত্নে, এই সকল 'জাতীয়' শিক্ষার ব্যবস্থা Post-Graduate বিভাগে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিল? কাহার উপকারের জন্য সার্ আশুতোষকে এত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল, এবং এত বিনিদ্র রজনী শ্রম-স্বীকার করিতে হইয়াছিল? বাঙ্গালী ছাত্রের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, বিশ্ববিদিত। তাই, আমরা সাগ্রহে, সোৎকণ্ঠে, সানন্দে তোমরা যে, হে প্রিয় ছাত্রবর্গ! সার্ আশুতোষের পক্ষাবলম্বন করিয়া দাঁড়াইবে এবং বিদেশীকে দেখাইবে যে, তোমরা যাঁহার দ্বারা এত মহোপকার পাইয়াছ, তাঁহাকে বিপদে সাহায্য করিতে জান—আমরা অনেকে এই দৃশ্য দেখিবার জন্য আশান্বিত হইয়াছিলাম! সে আশা সফল হইয়াছে কি?

---

(৩)

প্রিয় ছাত্রবর্গ—

প্রাণিমাত্রেই, আপন আপন 'জাতীয়' কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম্ম ও আদর্শ বুকে লইয়া অভিব্যক্ত হয়। প্রথম প্রথম, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, evolution theory এই জাতিগত বিশিষ্টতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অংশ-সমষ্টি, অনন্তকাল হইতে ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইতে হইতে, উন্নততর জীবের আবির্ভাবের হেতুরূপে নিয়ত কার্য্য করিতেছে। জাতি-বিশেষের সীমা-নির্দ্দেশ করিবে কি প্রকারে? কিন্তু বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্য মনীষীবর্গ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, evolution-বাদ,—স্ব স্ব জাতীয় বিশিষ্টতার বিরোধী হওয়া দূরে থাকুক, বরং অনিবার্য্যরূপে, ক্রমোন্নততর জাতিগত বিশিষ্টতারই পরিপোষক theory বলিয়া পরিগণিত। তোমাদের মধ্যে যাহারা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছ, তাহাদিগকে এই তত্ত্বটী বিশেষ করিয়া বলিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। যাহারা বেদান্তদর্শনের শঙ্কর-ভাষ্য পড়িতেছ, তাহাদের নিকটেও এই তত্ত্বটী বিশেষ পরিচিত।

হিন্দু ও মুসলমান জাতিরও, বিশিষ্ট একটা আদর্শ, ও বিশিষ্ট একটা চিন্তা ও কার্য্যের ধারা আছে। আমাদের শিক্ষা এরূপ হওয়া আবশ্যক যে, সেই শিক্ষা-পদ্ধতি, আমাদের স্ব স্ব জাতিগত বিশিষ্টতাকে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত, পরিপুষ্ট এবং চরমে পূর্ণতা সম্পাদন করিয়া, জাতীয়-আদর্শ-প্রাপ্তির সহায়তা করে। যাহাতে জাতিগত বৈশিষ্ট ও আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়, সেরূপ শিক্ষা-পদ্ধতিকে 'জাতীয় শিক্ষা' বলিতে পারা যায় না। ইহা, দর্শন ও বিজ্ঞান দ্বারা অনুমোদিত অকাট্য সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, নব-প্রতিষ্ঠিত Post-Graduate-শিক্ষা-কেন্দ্রে বর্ত্তমানে যে শিক্ষা-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, উহাতে কেবল যে, জাতীয় আদর্শের বিকাশের উন্মেষক, নানা বিষয়ক, গ্রন্থগুলি অধ্যয়নেরই কেবল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা নহে। উহাতে যে একটী অতি সুন্দর বিশেষত্বের প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সে দিকে তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে কি না বলিতে পারি না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মৌলভীগণ, কেবল যে প্রাচ্য প্রাচীন বিদ্যাগুলির প্রতিনিধি তাহা

নহে ; ইঁহাদের মধ্যে, প্রাচ্য-বিদ্যার যে একটা বিশিষ্টতা-সূচক চিন্তার ধারা পূর্ব্বপুরুষ হইতে অবিচ্ছিন্ন-ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সেই প্রাচ্য-চিন্তা-পদ্ধতিটী ইঁহাদের মধ্যেই অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে। তুমি যদি উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্রস্থলগুলি হইতে সুশিক্ষিত, চরিত্রবান্, প্রাচীন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে এবং মৌলভীবর্গকে বর্জ্জন কর, তাহা হইলে, দুইদিকে দুইটী অসম্পূর্ণতা আসিয়া শিক্ষা-কেন্দ্রকে দূষিত করিবেই। বর্ত্তমান উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্রে ঈদৃশ প্রাচ্যশিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিত-গণের কোন স্থান নাই, জগতের সমক্ষে এই কথাটীই ঘোষিত করা হইবে এবং তদ্দ্বারা এই প্রাচীন ভারতবর্ষকেই অবমাননা করা হইবে। বিশেষতঃ, বর্ত্তমানকালের ইউনি-ভার্সিটী, এই সকল প্রাচীন পদ্ধতি দ্বারা শিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণকে সম্মান করে না, দেশবাসীর ও বৈদেশিক লোকের মনে, এ কথা উদিত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় নিমগ্ন এতদ্দেশীয় ছাত্রবর্গকে, ভারতের পুরুষানুক্রমিক একটা বিবিধ বিদ্যার চিন্তা-ধারার বিশিষ্টতা হইতে বঞ্চিত করা হইবে। অথচ, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গকে, সেই প্রাচীন চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়া তোলা কতদূর আবশ্যক।

প্রিয় ছাত্রবর্গ! তোমরা কি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ যে জাতীয় গ্রন্থগুলি শিক্ষা দিবার যতগুলি বিভাগ আছে, প্রত্যেক বিভাগের প্রায় প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ group-গুলিতে, ছাত্রবর্গ, একজন করিয়া প্রাচ্য-বিদ্যা-পারদর্শী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দ্বারা এবং সঙ্গে সঙ্গে একজন করিয়া পাশ্চাত্য-বিদ্যায় সুশিক্ষিত আধুনিক নিয়মাভিজ্ঞ ইংরেজী-শিক্ষিতের দ্বারা, যুগপৎ শিক্ষালাভ করিতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিব। একটী ছাত্র বেদান্ত-group লইয়াছে। একজন আধুনিক নিয়মানুসারে পাশ্চাত্য-দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ অধ্যাপক, সেই ছাত্রটীকে সংস্কৃতে বেদান্ত পড়াইবার সঙ্গে সঙ্গে, পাশ্চাত্য দার্শনিকদিগের realism, idealism প্রভৃতি মতের পাশ্চাত্য দেশে যে প্রকার উৎপত্তি, ক্রম-পরিপুষ্টি এবং বর্ত্তমানে ঐ বাদগুলি যে প্রকার আকার ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে,— এই সকল বিষয়ের তত্ত্ব তাহাকে, বেদান্তের পাঠের সঙ্গে সঙ্গে, দিনের পর দিন, শিখাইয়া দিতেছেন। আবার ঐ ছাত্রটী, বেদান্তেরই অপর কোন গ্রন্থ যখন, প্রাচ্য-প্রণালীতে শিক্ষিত প্রাচীন বৈদান্তিক পণ্ডিতের নিকটে পড়িতেছে তখন, সে প্রতিদিন ভারতীয় বেদান্তের পুরুষানুক্রম-প্রাপ্ত চিন্তা-ধারা ও শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ও তাহাতে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিতেছে। সকল বিভাগেই, Post-Graduate শিক্ষা কেন্দ্রে, এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এই মহোপকারিনী ব্যবস্থা, সার্ আশুতোষের চিন্তার ফলে সমুদ্ভাবিত। এতদ্দ্বারা সার্ আশুতোষের ঐকান্তিক স্বদেশ-নিষ্ঠা ও জাতীয়-বিদ্যা-প্রিয়তা অভ্রান্তরূপে প্রকটিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য-পদ্ধতি-ক্রমে, এদেশে, যে সকল উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে, তাহার একটীতেও, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-বর্জ্জন ভিন্ন, এ প্রকার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও মৌলভীগণের সম্মান ও উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহা-দিগের জন্যও স্থান নির্দ্দেশ করা,—কোথাও হইয়াছে কি? এই নবীন ব্যবস্থার ফলে আর একটী মহান্ উপকার সাধিত হইতেছে। কেবল গ্রন্থ পাঠ দ্বারাই ত শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়

না। অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত ও চরিত্রবল, ছাত্রদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে থাকিলে, পরিশেষে উহা হইতে যে ফল প্রসূত হয়, তদ্দ্বারা সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতি উন্নত হইয়া উঠে। একটা দৃষ্টান্ত দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। শিবচন্দ্র চতুষ্পাঠীর সংস্থাপন এবং তথায় বহুসংখ্যক বিদ্যার্থীর বিদ্যাশিক্ষা প্রভৃতির জন্য, সমগ্র সময় ও নিজের সমগ্র যত্ন, সর্ব্বদা নিয়োজিত করিতে পারিবেন, এই আকাঙ্ক্ষার পূরণোদ্দেশে, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, তাঁহার সারাজীবনের উপার্জ্জিত মুদ্রা এবং মাসিক দুইশত টাকারও উপরে যে অধ্যাপনা-কার্য্যের বেতন ছিল, তাহা ছাড়িয়া দিয়া— ঐ চতুষ্পাঠীতেই স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। এ প্রকার আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত Post Graduate বিভাগের ছাত্র স্বচক্ষে দেখিতে পাইয়াছে। এই সকল অধ্যাপকের সরল জীবন-যাত্রা প্রণালী, স্বল্পে-সন্তোষ, বিলাস-বিহীনতা—প্রভৃতি গুণের প্রভাবও ছাত্রবর্গের উপরে নিত্য পড়িতেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এইরূপ প্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া, তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। ইহার তুল্য জাতীয়-শিক্ষা আর কোথাও পাইবে না। জাতীয় বা national শিক্ষা-পদ্ধতির এইটাই মুখ্য অঙ্গ। Todhunter প্রভৃতি প্রণীত বীজগণিত ছাড়া, ভারতেও যে ভারতীয় গ্রন্থকার প্রণীত বীজগণিত এবং রেখাগণিতের শুল্‌ভশাস্ত্রাদি গ্রন্থ রহিয়াছে,—এই সংবাদটাই কয়টী ছাত্র তোমরা অবগত আছ? কিন্তু, সার্ আশুতোষের একমাত্র ঐকান্তিক চেষ্টায়, এই সে দিনও, ভারতবর্ষের দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মহীশুরাদি প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তকাগারগুলিতে পরিশুদ্ধ "শুল্‌ভশাস্ত্রে"র অনুসন্ধানে এবং তত্তৎদেশীয় গণিতাভিজ্ঞ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত তদ্বিষয়ক আলোচনার নিমিত্ত, Post Graduate বিভাগের একজন গণিত-শাস্ত্রাধ্যাপককে পাঠাইয়া দিয়া, শুল্বশাস্ত্রের তত্ত্বনির্ণয়ের পথ কত সুগম করিতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার কোন প্রয়োজন নাই। তোমরা জাতীয়-শিক্ষা পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য ব্যাকুলতা দেখাইতেছ। কিন্তু, আমাকে বলিয়া দাও বিশ্ববিদ্যালয়ে যেরূপ সর্ব্বতোমুখী জাতীয় শিক্ষাদানের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা সুষ্ঠুতররূপে স্ব-জাতীয় আদর্শানুরূপ শিক্ষা, অন্যত্র লাভ করিতে আশা করা দুরাশা হইবে না কি? তথাপি তোমরা, এই সঙ্কট-কালে. কিরূপে সেই মহোপকারী বন্ধু ও সদাহিতৈষী পরমাত্মীয়কে পরিত্যাগ করিলে, —যিনি সারা জীবন তোমাদিগেরই মঙ্গলার্থ, তোমাদের জন্য কত আত্মত্যাগ করিয়া আসিতেছেন?

যাহাতে জাতীয় আদর্শ ক্ষুণ্ণ না হয় জাতীয় আদর্শ ও culture পরিপুষ্ট হইতে পারে, এইরূপ শিক্ষা-পদ্ধতির অনুসরণ করিবার জন্য তোমরা সকলেই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছ। এটা তোমাদের ঠিক্ প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি না, তদ্বিষয়ে আমার মনে আর একটা সংশয় জাগিয়া উঠিতেছে। তোমরা সর্ব্ব প্রথমেই তোমাদের স্ব-জাতীয় একটা প্রকাণ্ড আদর্শ ও নীতিকে ক্ষুণ্ণ করিতেছ বলিয়া, আমার চিত্তে একটা দুর্ব্বিসহ কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। তোমাদের এই কলেজ-পরিত্যাগ-নীতি, সকল পিতামাতা ও আত্মীয় অনুমোদন করিতেছেন না। তাঁহারা তোমাদিগের এই ব্যবহারে নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া তোমাদিগের অর্থ-সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

তোমরা তোমাদিগের পিতামাতা ও আত্মীয়-গণকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া, একরূপ তাঁহাদিগের অভিপ্রায় ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, একটা নূতন "ফণ্ড" সংস্থাপন করিয়া, সেই "ফণ্ড" হইতে আপনাদের ব্যয়-নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিয়াছ। এই ব্যবহারকে পিতা-মাতাকে অগ্রাহ্য করা ভিন্ন অপর কোন নামে অভিহিত করিতে পারা যায় না। পাশ্চাত্য আদর্শ কিরূপ তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এটী, আমাদের জাতীয়-আদর্শের আদৌ অনুকূল নহে। একথা কি তোমরা জান না? তোমরা কি জান না যে, তোমাদের দেশের প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ কি প্রকার আদর্শ তোমাদের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছেন? পিতার ইচ্ছার সম্মান কি জানি পাছে ক্ষুণ্ণ হয়, এই আশঙ্কায় মহাপুরুষ দেবব্রত, সমগ্র জীবন রাজ-ভোগ্য বিভব বর্জ্জন করিয়া চির-কৌমার্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন! এই মহান্ আদর্শ কাহার জন্য লিপিবদ্ধ রহিয়াছে? মহারাজ দশরথের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হইবার আশঙ্কায়, পুত্র রামচন্দ্র, কত বড় আত্ম-ত্যাগ দেখাইয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন? মহাকবি কি এই বিস্ময়কর পিতৃভক্তির মহান্ আদর্শ, সুধাং অমর কবিতায়, অক্ষয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন? তোমাদিগেরই স্বজাতির ধর্ম্ম-সংহিতা-প্রণেতা মনু ব্যবস্থা দিয়াছেন যে,—"পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম, পিতা হি পরমংতপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে, প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে "ফণ্ড" হইতে সাহায্য লইয়া তোমরা এই মহান্ জাতীয়-আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিতেছ, ইহাই আমার বিশ্বাস। জাতীয় আদর্শানুরূপ শিক্ষালাভের আকাঙ্ক্ষা, যেখানে প্রথমেই জাতীয় একটা বড় আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়, সে আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি-বন্ধনটা 'বালির বাঁধের মত' শিথিল-মূল! আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, এই বালির বাঁধের উপরে নির্ম্মিত আকাঙ্ক্ষার সৌধটীও, যেন অদূর-ভবিষ্যতে বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া যাইবে, —আপন চিহ্ন ও রাখিবে না!!!

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ফাগুনে।

কুঞ্জে কোয়েল, ডাক্‌ছে মধুর, গুঞ্জে অলি ফুলে
আকুল মলয়, লতার গায়ে, পড়্‌ছে দুলে দুলে।
আজ্‌কে এমন ফাগুন মাসে
পাখীর গানে ফুলের বাসে
ছন্দে গীতে গন্ধে হাসে
পরাণ গেছে খুলে।
পাগল হবার এই তো সময় সকল কথা ভুলে।
কুঞ্জে কোয়েল ডাক্‌ছে মধুর গুঞ্জে অলি ফুলে।

আজ্‌কে মোরা কর্‌ব কেবল
'অকেজো-কাজ যত
বাতাস-বওয়া ফাগুন মাসে খেলাই মহাব্রত।
নিজ্‌কে শুধু বিজ্ঞ জানি'
গম্ভীর মুখে গম্ভীর বাণী
কইবনা আজ, লইব মানি'
অবোধেরি মত—

আকাশ বাতাস যে কথা আজ কইছে অবিরত।
আজ্‌কে মোরা কর্‌ব কেবল
'অকেজো-কাজ যত।

রুদ্ধ-দুয়ার ঘরের মাঝে শুয়েই আছো যারা
তাদেরে আজ ডাক্‌ব কেবল,
পেতেই হবে সাড়া;

সব-মেশানো এমন খনে
আপন কি পর সবার সনে
মিশ্‌ব সবাই প্রাণে মনে
হয়ে' আপন হারা
আজ ফাগুনে বিশ্ব নিখিল 'মিলন-পাগল-পারা!
রুদ্ধ-দুয়ার ঘরের কোণে রহিবি আজ কারা?

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

রামতনু।

ঋষিকল্প রামতনু লাহিড়ীর মুখ দেখিয়া মনে হইয়াছিল, তিনি বিধাতার মঙ্গল বিধানে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছেন; সংসারের ঝটিকা, আবর্ত্তে অবিচলিত চিত্তে চলিবার জন্য বুক বাঁধিয়াছেন। একে একে পুত্র কন্যা বিসর্জ্জন দিয়া, বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া, রামতনু যেমন শোকে সান্ত্বনা পাইয়াছেন, কে এমন পাইয়াছেন জানি না। পুত্রকন্যা হারাইয়া আমরা জোর করিয়া মুখে বলি, 'করুণাময় পরমেশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক'; কিন্তু হৃদয়ের অন্তঃস্থল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি, ইহার মধ্যে কতটা মিথ্যা লুক্কায়িত আছে। সন্তান-শোকের মত এত বড় দুঃখ পৃথিবীতে আর কি আছে? চিতার আগুনে পুড়িয়া নিঃশেষ না হইলে, এই শোকের আগুন নেবে না। এই নিদারুণ শোক রামতনু নির্ব্বিকার-চিত্তে সহিয়াছেন। কন্যা ইন্দুমতী ও পুত্র নবকুমার উভয়ে একই সময়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে ইন্দুমতী বাবাকে ডাকিলেন। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইন্দু, কেন আমাকে ডেকেছ?" কন্যা চোখ খুলিয়া পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বাবা, আজ আমার কাছে বস, আজ আমাকে বড় অস্থির করছে।" লাহিড়ী মহাশয় কন্যার হাতখানি নিজের হাতে লইয়া বলিলেন—"ইন্দু, আমাদের যা কর্‌বার ছিল কোরেছি, আর কিছু কর্‌বার নেই; এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর যে তিনি তোমাকে শীঘ্র এ যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করুন।" ইন্দুমতী হাত দু'খানি ধীরে ধীরে বুকের উপর আনিয়া যুক্ত-করে প্রার্থনা করিয়া বাবার মুখের দিকে চাহিয়া চির-বিদায় চাহিলেন—"বাবা, আমি যাই!" বাবা বলিলেন "যাও মা।" ইন্দুমতী চলিয়া গেলেন। ইন্দুমতীর মা "মা রে, ইন্দুয়ে!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিতেই পরলোক-বিশ্বাসী রামতনু তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলেন—"কর কি! কর কি! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর, তিনি ইন্দুর সকল যন্ত্রণা দূর কোরে শান্তিধামে নিয়ে গিয়েছেন। এখন অস্থির হয়ো না, আর একটি সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য এখনও বাকি আছে, এখন অধীর হ'লে তার সেবার ব্যাঘাত হবে। চল এখন তার সেবায় নিযুক্ত হই।"

লাহিড়ী মহাশয়ের মুখে ধর্ম্ম কথা শুনিবার আকর্ষণে কতিপয় যুবক সপ্তাহে একদিন

তাঁহার গৃহে সমবেত হইতেন। সেই সাপ্তাহিক অধিবেশনে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও বিজয়চন্দ্র মজুমদার উপস্থিত থাকিতেন। ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর যে দিন তাঁহার ভাই নবকুমারের মৃত্যু হয়, সে দিন সেই সাপ্তাহিক অধিবেশনের দিন ছিল। যুবকগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দ্বিজেন্দ্র লাল আসিয়া নবকুমারের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। রামতনু দ্বিজেন্দ্রকে সান্ত্বনা বাক্যে বলিলেন—"দ্বিজু, তুমি শিক্ষিত হ'য়ে আপনাকে সংযত কোর্ত্তে পাচ্ছ না? কোথায় তুমি তোমার জ্যাঠাইমাকে বোঝাবে, শান্ত কোর্‌বে,—না, তুমিই অস্থির হ'য়ে পোড়্‌লে!" যুবকগণ দুর্ঘটনার সংবাদ না জানিয়া সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রামতনু তাঁহার স্বাভাবিক বিনয়ের সহিত বলিলেন—"দেখ, আজ আমি তোমাদের সঙ্গে ব'স্‌তে পার্‌বো না। আমার ভুল হ'য়ে গিয়েছে, আগে সংবাদ পাঠান উচিত ছিল।" কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ধীরভাবে বলিলেন—"একটু আগে নবকুমারের মৃত্যু হ'য়েছে, তার মৃতদেহ ঐ ঘরে প'ড়ে আছে, তোমরা ও ঘরে যেয়োনা, দেখ্‌লে কষ্ট হবে।" একদিন কোনও ব্যক্তি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন-"একে একে পুত্র কন্যা হারিয়ে কি দারুণ আঘাতই পাচ্ছেন!" রামতনু বলিলেন—"দয়ার উপর কি দাবি আছে? ভগবান দয়া কো'রে যে ক'টি সন্তান রেখেছেন, তার জন্যই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাক্‌বো।"

দুই প্রকারের সাধু এই পৃথিবীতে দেখা যায়। এক শ্রেণীর লোক কত তপস্যা, কত কৃচ্ছ্র-সাধন, কত উত্থান পতনের, কত সংগ্রামের মধ্য দিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। আর এক শ্রেণীর লোকের সাধুতা জন্মগত। শিক্ষা দ্বারা নহে, সৎসংসর্গে নহে, প্র[illegible] প্রয়াসে নহে—তাঁহারা স্বভাবতঃ সতত সাধুতার পথে বিচরণ করেন। রামতনুর সাধুতাও প্রকৃতি-গত ছিল। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ন্যায়, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের ন্যায়, ভারতীয় ঋষিগণের সাধন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তপঃপ্রভাব ও ঋষিত্ব লাভ করেন নাই। জগজ্জননী তাঁহাকে আদরকরিয়া স্বহস্তে ধর্ম্মভূষণে সাজাইয়া, রক্ষা-কবচ পরাইয়া জগতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন; বলিয়া দিয়াছিলেন—যাও বৎস! সংসারের পথ কেবল সুকোমল পুষ্পময় নহে, কণ্টকাকীর্ণ পথেও চলিতে হইবে। মায়ের অভয় বাণী, আশীর্ব্বচন স্মরণে রাখিয়া অম্লান বদনে, প্রশান্ত চিত্তে, অটলভাবে মানবজীবন-ব্রত সাধন করিও।"

এই রক্ষাকবচ, এই ধর্ম্মের বর্ম্ম পরিয়া সংসার সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়াই রামতনু ডিরোজিয়োর নাস্তিকতা-প্রবণ প্রভাবে পড়িয়াও আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। আমাদের দেশের বড় বড় বক্তা ও লেখকগণ কথায় কথায় ফিরিঙ্গি যুবক ডিরোজিয়োর প্রভাবের উল্লেখ করিয়া বলিয়া আসিতেছেন—তিনি আমাদের দেশের যুবকগণের মধ্যে উদ্দীপনা ও নব-জীবন দান করিয়াছিলেন। কিন্তু, ডিরোজিয়োর-সংস্পর্শে আসিয়া আমাদের দেশের ইংরেজি শিক্ষিত যুবকগণ সুফল অপেক্ষা কুফল অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছিলেন। ডিরোজিয়োর প্রভাবে সুরাপান, নাস্তিকতা, নিষ্ঠা-শ্রদ্ধা-হীনতা, ঔদ্ধত্য, উচ্ছৃঙ্খল কালাপাহাড়ী-ভাব আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল। ভারতীয় আর্য্য ঋষি-গণের প্রদর্শিত পথ ছাড়িয়া, আমাদের দেশের লোকেরা যে পরিমাণে বিদেশের হীন অনু-

করণ করিয়াছেন—সেই পরিমাণে তাঁহারা ধর্ম্ম-হীন হইয়াছেন।

ভোগে নহে, বিলাসে নহে, ত্যাগের পথে না চলিলে আমাদের কল্যাণ নাই। এক ভূদেব ভিন্ন ভারতবর্ষের এই উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিবার লোক তখন কেহ ছিলেন না। স্বদেশের স্ব-জাতির বৈশিষ্ট্য রক্ষা না করিয়া বিদেশাগত প্রবল বন্যায় গা ভাসাইয়া দিয়া বাঙ্গালা দেশের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ ডিরোজিয়ো-প্রদর্শিত-পথে সদর্পে পদার্পণ করিলেন। সেই দলে পড়িয়া এমন, যে জন্ম-সাধু রামতনু, তিনিও পান-দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি পান নাই।

বিনা সাধনে রামতনু ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভক্ত দেখিলেই তাঁহার প্রতি আসক্ত হইতেন। বন্ধুপুত্র কেশবচন্দ্রের মুখে ভক্তি-কথা শুনিয়া অশ্রুজলে আপ্লুত হইতেন। কেশবচন্দ্রের উপাসনার সময় একটি ভক্তির কথা শুনিয়া উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে বাহিরে আসিয়া "কেশব কি মধুর বাণীই শুনাইলেন! কি সুন্দর! কি সুন্দর!" বলিয়া পাদচারণা করিতেন। একদিন দেখিয়াছি রামতনু, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন। আরাধনার কয়েক মিনিট পরেই উঠিয়া আসিয়া মন্দিরের বারাণ্ডায় পায়চারি করিতেছেন, চোখ মুছিতেছেন আর বলিতেছেন—"শিবনাথ আজ কি সুন্দর কথাই বোল্লেন!" তাঁহার কোন প্রকার কৃত্রিমতাই ছিল না। লোকে কি ভাবিবে. কি বলিবে মনেই আসিত না। তিনি দীর্ঘ উপাসনায় বেশীক্ষণ বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। যতক্ষণ ভাব থাকিত, যতক্ষণ অনন্যমনা হইয়া থাকিতে পারিতেন, ততক্ষণই উপাসনায় বসিতেন। তিনি সর্ব্ববিধ কার্য্যে অকৃত্রিম ছিলেন; তাঁহার মত খাঁটি লোকের পক্ষে, নিয়ম-রক্ষার কৃত্রিমতা অবলম্বন অসম্ভব ছিল। তিনি শাস্ত্রী-মহাশয়কে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"শিবনাথ, তোমরা যে এতক্ষণ ধরিয়া উপাসনা কর, এত কথা বল—সবই কি আন্তরিকতা পূর্ণ হয়?" শাস্ত্রীমহাশয় দুঃখের সহিত স্বীকার করিয়াছিলেন, আন্তরিকতা না থাকিলেও, প্রচারের জন্য অনেক কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বলিতে হয়। এই প্রকার প্রচার-প্রবৃত্তি প্রবল হইলে ফেনাইয়া ফেনাইয়া বক্তৃতা করিতে হয়; কোন কথা কাহারও হৃদয় স্পর্শ করে না। তাহা আমরাও বর্ত্তমান সময়ে অনুভব করিতেছি। বর্ত্তমান সভ্যতা ও শিষ্টতা কৃত্রিমতার নামান্তর মাত্র। এই কৃত্রিমতার যুগে সেই অকৃত্রিম মহাপুরুষ রামতনুর কথা বড়ই মনে পড়ে। আমাদের দেশের খাঁটি লোক একে একে চলিয়া যাইতেছেন। এখনও পল্লীগ্রামের অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধার সঙ্গে পরিচিত হইলে. খাঁটি চরিত্রের চিহ্ন পাওয়া যায়; দুদিন পরে তাহাও লোপ পাইবে।

রামতনুর বিনয়ও স্বাভাবিক। তাঁহার বিনয়ের মধ্যে বিশেষত্ব ছিল। নিয়ম মুখস্থ করা বিনয় নহে, অন্যান্য গুণের ন্যায় বিনয়ও তাঁহার স্বভাব-জাত ছিল। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী, বালক বালিকা সকলের নিকটই তিনি সৌজন্য, শিষ্টাচার ও বিনয় প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার বিনয়ে সকলেরই লজ্জায় অবনত মস্তক হইত। তাঁহার পক্ষে এই বিনয় স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু আমরা তাহার অনুকরণ করিলে হাস্যাস্পদ হইব। গুণকে প্রকৃতি-গত করিতে

না পারিলে, অন্যের গুণের অনুকরণ, কৃত্রিম অভিনয় বলিয়া ধরা পড়ে।

উদার-হৃদয় রামতনু বিশ্বপ্রেমে পরিপূর্ণ হইয়া জগতের সকল নরনারীকে সমান প্রীতির চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছিলেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, খৃষ্টান, স্বদেশ বিদেশ, আপন পর—সব তাঁহার এক হইয়া গিয়াছিল। কত নিষ্ঠাবান হিন্দু, কত খৃষ্টান, কত নাস্তিক তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তিনি কোনও মতের ব্রাহ্ম, কোনও দলের ব্রাহ্ম ছিলেন না। একবার একজন ব্যারিষ্টার, সাধারণ-ব্রাহ্ম-দল-ভুক্ত একজন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"রামতনু বাবু আদি, নববিধান ও সাধারণ—এই তিন ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের কোন্ দলভুক্ত?" সাক্ষী মহাশয় উত্তর করিলেন "রামতনু বাবু কোন্ দলের বোল্‌তে পারি না, তাঁর দলাদলি নাই।" একটি উচ্চ স্থান আছে, সেখানে যাঁহারা উঠেন তাঁহাদের দলের বন্ধন খসিয়া পড়ে। বিশ্ব-প্রেম হৃদয়ে লইয়া যখন কেহ ঘর ছাড়িয়া জগতের উন্মুক্ত স্থানে বাহির হইয়া পড়েন, তখন দলের লোকেরা সঙ্কীর্ণতার প্রাচীর উচ্চ করিয়া, দৃঢ় করিয়া বাঁধে,—ভয় হয় বিশ্বপ্রেমিকের বিশ্ববাণীর বাঁশি শুনিয়া ঘরের ছেলে মেয়েরাও বাহির হইয়া পড়িবে।

রামতনু শোকবিজয়ী-মহাপুরুষ ছিলেন। প্রেমভক্তি বিশ্বাসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তাঁহার চোখ দেখিলে হরিভক্ত কৃষ্ণকান্ত পাঠকের গান মনে পড়িত—"তার প্রেমানলে দগ্ধ হৃদয়, নয়নে মিশানা আছে।" একজন হৃদয়বান—ব্যক্তি জগতের দুঃখ ক্লেশে, অবিচার অত্যাচারে ব্যথিত হইয়া গাহিয়াছিলেন—

"সিংহশিশু করে মেষরক্ত পান,
বলী বলহীনে করে অপমান;
তুমি সর্ব্বশক্তি, তুমি ন্যায়বান,
দূরে কি বসিয়া—দেখিছ তাই!
ধনীর আস্পর্দ্ধা, কপটের জয়,
ধর্ম্মের পতন তবে কেন হয়?
তুমি যদি প্রভু দেব দয়াময়,
এ নিয়ম তবে কে তবে দায়ী"

এ তো—সংশয়ে পড়িয়া অভিমানের কান্না। বিশ্বাসী রামতনুর সংশয় ছিল না, অভিমান ছিল না। তিনি সংসারের দুঃখও বিধাতার দান বলিয়া গ্রহণ করিতেন। তাঁহার হৃদয় বীণার সঙ্গীত ছিল—

"আর বোল্‌ব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়,
দীনবন্ধু হে।
হয় রাখ সুখে, না হয় রাখ দুঃখে,
তোমার সম্পদ বিপদ আমার দুই-ই সমান;
তুমি যে বিধি কর বিধি; সেই হয় মঙ্গল বিধি,
গুণনিধি হে;
ঘোর বিপদেও বোল্‌ব তোমায়, দয়াময়।"

রামতনু প্রচারক ছিলেন না, আচার্য্য ছিলেন না, বক্তা ছিলেন না। কোনও বার্ষিক কার্য্যবিবরণীতে তাঁহার কার্য্য-সংখ্যার তালিকা বাহির হইত না। তাঁহার মধুময় পবিত্রময় ঋষি-জীবনের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারাই উপকৃত হইয়াছেন। দীনবন্ধু তাঁহার "সুরধুনি কাব্যে" রামতনুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—

"সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ-সম-জ্ঞান ঋষিদের মত।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।"

এই সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া অনেকে পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। সাধু রামতনুর পুণ্য-চরিত আলোচনা করিলে আমরাও ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

শ্রীবামনদাস মজুমদার।

ঋষি-কবি রবীন্দ্রনাথ।

হে বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্র বঙ্গের!
ত্যাগের মহিমা-গর্ব্বে কি দীপ্তি চিত্তের
উদ্ভাসিল আঁখি তব! তুমি নহ আর
ধনীর দুলাল শুধু, ভারতী মাতার
সুধা-স্রাবী সপ্ততন্ত্রী, বসন্তের পিক
মধু-কণ্ঠ অতুলন। মুগ্ধ দশদিক;
হেরিতেছে সবিস্ময়ে মহর্ষি-সন্তান
উদার নির্ভীক প্রাণে ন্যায়ের সম্মান
রক্ষিবারে রাজ-দত্ত মোহের শৃঙ্খল
ছিন্ন করি অনায়াসে তপোতেজোজ্জ্বল
প্রবোধিত ভারতের লাঞ্ছিত আত্মার
দাঁড়াল প্রতিভূরূপে। ত্যজিয়ে অ-'সার'
আজি সত্য সার-গ্রাহী ঋষি নরোত্তম
তুমি আর্য্যকুল-রবি! ভাতে নিরুপম
মেঘমুক্ত দিনমণি! লহ নমস্কার,
হে সবিতৃ বাঙ্গলার! কবি চট্টলার
করে তোমা অর্ঘ্যদান! প্রবুদ্ধ-ভারত
করিছে প্রতীক্ষা আজি ওগো সিদ্ধ-ব্রত!
রুদ্র গীতি তব কণ্ঠে শুনিতে এবার
সকল সৃষ্টির অন্তে প্রণব-ঝঙ্কার।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বিমলা।

বিমলা শঙ্খিনী জাতীয়া নারী। শঙ্খিনী নারী সাধারণত হাস্যময়ী প্রগল্‌ভা বাগ্‌বৈদগ্ধা সাহসিকা তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী, আর সকল প্রকার অভিনয়ে সুনিপুণা হইয়া থাকে। 'বিষবৃক্ষের কমলমণিও শঙ্খিনীরই আর এক মূর্ত্তি; বিমলা শঙ্খিনীর অন্যবিধ চিত্র। তিলোত্তমা পদ্মিনী'।

আপাত দৃষ্টিতে বিমলা যে ভাবে গজপতির সহিত প্রেমালাপের অভিনয় করিল, রহিম সেখের সহিত প্রণয় খেলার ভাণ করিল—তাহা কোন সতী নারী করিতে পারে না। আদর্শের চক্ষুতে ইহা নিন্দনীয়। অথচ বিমলা পতি-প্রাণা সতী নারী। পদ্মিনী কি চিত্রিনী নারীরা ইহা পারে না; পারে এক শঙ্খিনী; তাহাও সকলে নহে। মানুষের মন লইয়াই সব। মনেই পাপ, মনেই পুণ্য। আপাত-দৃষ্টে মন্দবৎ প্রতীত কার্য্য অনেক সময়ে মন্দ হয় না। মন লইয়া বিচারই বিচার। মানুষে সে বিচার ঠিক করিতে পারে না, ভুল করে। তাই উপরের কার্য্য দেখিয়াই বিচার করিতে বাধ্য হয়। বিমলা যেরূপ অভিনয়ই করুক, যেরূপ খেলাই খেলুক, অসতীত্বের যে কোন মূর্ত্তিই দেখাক, তাহাতে মন লিপ্ত ছিল না বলিয়া, তাহা দোষের নহে। মন যাহার নির্ম্মল রহিল—তাহার কার্য্য ত বাহিরের একটা খোসা মাত্র। আপাত-দৃষ্টে স-মলাবৎ প্রতীতা, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বি-মলাই।

বিমলা পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষীয়া নারী—ইহা কবির উক্তি। নচেৎ তাহার তাম্বুলরাগ

রক্ত ওষ্ঠাধর, কজ্জল-নিবিড় প্রশস্ত লোচনের চকিত-কটাক্ষ, রূপে ঢলঢল রসে টলমল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ; দেখিলে কে বলিবে ইহার বয়স চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের অধিক? এমন চাঁপা ফুলের মত কোমল ত্বক্, এমন চঞ্চল আবেশময় চক্ষু, এমন কুঞ্চিত বিপুল কেশভার যুবতীরই যোগ্য। যে নিজের যৌবনভারে নিজেই হাসে, বীণা-নিন্দিত মধুর স্বরে আপন মনে গান গায়, গোলাপ-পূর্ণ কর্পূর পূর্ণ তাম্বূলে ওষ্ঠাধর রঞ্জিত করে—তার যৌবন প্রবাহে ভাটা আসিয়াছে, ইহা কেহই বলিবে না। মুক্তাভূষিত কাঁচুলি, বিচিত্র কারু কার্য্যময় বসন পরিয়া, কনক রত্ন ভূষায় সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করিয়া, রত্নভূষিত পাদুকা লইয়া বিমলা যখন ভ্রমণে বাহির হয়—তখন তাহার রূপে পথ আলো হইয়া থাকে। কবি বলিয়াছেন, সে আলো প্রদীপের আলোর মত। তাহাতে গৃহকার্য্য চলে, কিন্তু স্পর্শ করিলেই পুড়িয়া মরিতে হয়। সে রূপের আগুনে রহিম সেখ পুড়িয়া মরিল, গজপতি অর্দ্ধ দগ্ধ হইল। নবাব কতলু খাঁ উন্মত্তের মত সেই আগুন স্পর্শ করিতে গিয়াই জন্মের মত মৃত্যুকে লাভ করিল।

বিমলা বিলাসিনী, দর্পিতা, সুখলালসা পরিপূর্ণা ও প্রগলভ-যৌবনা নারী। ইহার সৌন্দর্য্য অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায়। নির্ব্বাণ, মুদিতোন্মুখ, শুষ্ক-পল্লব অথচ সুশোভিত, অধিক বিকসিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট।

অলঙ্কার শাস্ত্রের নিয়মে, বিমলা প্রগল্‌ভা জাতীয়া নায়িকাশ্রেণীর অন্তর্গত। তিলোত্তমা মুগ্ধা, আয়েষা, মধ্যা। বিমলা যে প্রগল্‌ভা, তাহা প্রগল্‌ভার লক্ষণ দেখিলেই বোঝা যায়। প্রগল্‌ভা—

স্মরান্ধা গাঢ়তারুণ্যা সমস্ত রতকোবিদা।
ভাবোন্নতা দরব্রীড়া প্রগল্‌ভা-আক্রান্ত নায়িকা॥

স্মরান্ধা—যৌবনোন্মত্তা, কামোন্মাদিনী। যৌবনমদমত্তা বিলাসিনী সুখলালসা-পরিপূর্ণা নারীই স্মরান্ধা। কবির বর্ণনামতে মিলাইলে বিমলা স্মরান্ধা ইহা প্রতীতি হয়। বিমলা রূপে ঢলঢল, রসে টলমল। বিমলা সুখলালসা-পরিপূর্ণা। গাঢ়তারুণ্যা—প্রগাঢ়যৌবনা। যৌবনের শেষে, যৌবনের ভাবে ভাবময়ী, রসে রসময়ী, বিমলা গাঢ়যৌবনা নারী। ভাবোন্নতা—অনুভাবোন্নতা। অনুভাব আদিরসে ভ্রূবিক্ষেপ কটাক্ষাদি। যথা, সাহিত্য দর্পণে—

উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈ বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্য্যরূপঃ সোঽনুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥

ভ্রূবিক্ষেপ, কটাক্ষচালনা, নেত্রসঙ্কোচ, অশ্রুপাত, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি অনুভাবে বিমলা যে কিরূপ নিপুণা, তাহা বিমলা চরিত্র অধ্যয়ন করিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। করুণ রসে, অদৃষ্ট নিন্দা ক্রন্দনাদি, হাস্যরসে, নেত্রসঙ্কোচ বদনস্মেরতাদি অনুভাব। ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষক্ষেপ অঙ্গভঙ্গী অঙ্গচালনা হাসিখুসী প্রভৃতি অনুভাবের মধ্যেই। দরব্রীড়া—অত্যল্পমাত্র লজ্জাযুক্তা। প্রয়োজন—ক্ষেত্রে, অভিনয় হিসাবে, বিমলা সম্পূর্ণ নির্লজ্জার মত ব্যবহার করিলেও, সে সম্পূর্ণ নির্লজ্জা রমণী মধ্যে গণিত হইতে পারে না। বিমলা পতিব্রতা সতী নারী। পতিব্রতা সতী নারী হইয়া সে প্রগল্‌ভা-জাতীয়া। আক্রান্তনায়িকা—আক্রান্তঃ নায়কো যয়া সা—আক্রান্তনায়িকা। বিমলা যে কি ভাবে পুরুষগণকে অবলীলাক্রমে আয়ত্ত করিতে পারে, কেমন ভাবে তাহাদের আক্রমণ করিয়া পদানত করিতে পারে—তাহা গজপতি ও দিগ্‌গজকে দিয়াই দেখা হইয়াছে। ইহাও এক জাতীয়

আক্রান্ত-নায়িকার কার্য্য। সাধারণতঃ নায়ক বলিতে এস্থলে প্রণয়ী, স্বামী।

নায়িকা প্রথমতঃ স্বীয়া, পরকীয়া ও সাধারণী (প্রকাশ্য বার-বিলাসিনী) এই ত্রিবিধ। তন্মধ্যে বিনয়ার্জ্জবাদিযুক্তা গৃহকর্ম্ম-পরা পতিব্রতা নারীই স্বীয়া। সেই স্বীয়াই মুগ্ধা (তিলোত্তমা), মধ্যা (আয়েষা) প্রগলভা (বিমলা) ভেদে আবার এই তিন প্রকার। পরকীয়া—যাত্রাদি-নিরতা গলিত-ত্রপা কুলটা এক প্রকার। অজ্ঞাতোপযমা (অবিবাহিতা) নব-যৌবনা সলজ্জা কুমারী আর একপ্রকার। পিতা প্রভৃতির আয়ত্তা-ধীনা বলিয়া ইহারাও পরকীয়া। সাধারণী—কলা-প্রগলভা সামান্য-নায়িকা, বেশ্যা। কচিৎ অননুরক্তা, সাধারণতঃ অনুরক্তা।

বিমলা সমস্ত রত-নিপুণা, প্রখর বুদ্ধিশালিনী সুশিক্ষিতা রমণী। তাহার উপর নিজে সে প্রণয় ব্যাপারে একজন ভুক্তভোগিনী। কাজেই জগৎ সিংহকে দেখিবামাত্র তিলোত্তমার মনোমধ্যে ভালবাসার সঞ্চার লক্ষ্য করিতে পারে। নিজের দৃষ্টান্তেই সে তিলোত্তমাকে বুঝিয়া লয়। সে যে নিজেই পিতার আশ্রমে বীরেন্দ্র সিংহকে দেখিবামাত্র অনুরাগিনী হইয়া পড়ে; তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিয়া বসে। কাজেই, সে তিলোত্তমার ভাবগতিক দেখিয়া, তাহার মনোমধ্যে যে প্রগাঢ় ভাল-বাসার সঞ্চার হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারে। নিজের জীবনে স্পষ্ট উপলব্ধির জোরেই সে অত বড় পণ্ডিত পিতার সহিত তর্ক করিয়া বুঝাইয়া দেয়—"না না, প্রভু, সে লক্ষণ নয়। পক্ষ-মধ্যে তিলোত্তমার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তিলোত্তমা আমার সঙ্গে কি বয়স্যাদিগের সঙ্গে সেরূপ দিবারাত্র হাসিয়া কথা কহে না; তিলোত্তমা আর প্রায় কথা কয় না; তিলোত্তমার পুস্তক সকল পালঙ্কের নীচে পড়িয়া পচিতেছে; তিলোত্তমার ফুলগাছ সকল জলাভাবে শুষ্ক হইল; তিলোত্তমার পাখীগুলিতে আর সে যত্ন নাই; তিলোত্তমা নিজে আহার করে না; রাত্রে নিদ্রা যায় না; তিলোত্তমা বেশভূষা করে না; তিলোত্তমা কখনও চিন্তা করিত না, এখন দিবানিশি অন্যমনে থাকে। তিলোত্তমার মুখে কালিমা পড়িয়াছে।"

বিমলা, পিতার আশ্রমে, বীরেন্দ্র সিংহকে যেদিন প্রথম দেখিল, সেই দিনই তাহার চিত্ত পরের হইল। সেই দিনই সে বীরেন্দ্র সিংহে প্রাণ মন নিবেদন করিয়া বসিল। অভিরাম স্বামী শিষ্যের নিকট কন্যার বিবাহ করার কথা উত্থাপিত করিলেন। শূদ্রীগর্ভজা বলিয়া বিমলাকে বিবাহ করিতে বীরেন্দ্র অনিচ্ছুক হইল। অভিরাম স্বামী তখন কন্যাকে বীরেন্দ্র-অনুগামিনী দেখিয়া, তাহার আগমনে কন্যার অনিষ্ট হইতেছে বুঝিয়া, তাঁহাকে আশ্রমে আসিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। বিমলা তথাপি চাতকীর মত সেই বীরেন্দ্রের আগমন প্রত্যাশা করিতে লাগিল; এমনই কামো-ন্মাদিনী—যে তাহাকে শূদ্রীগর্ভজা বলিয়া বিবাহ করিতে চাহে না, তাহারই সঙ্গ-লাভের আশায় তবু সে উন্মত্তা। ইহা স্মরান্ধা প্রগল্‌ভারই উপযুক্ত। ভাবোন্মত্তা আলঙ্কারিক-মতে অনুভাবোন্মত্তা। নচেৎ, ভাবোন্মত্তা নারী কখন এত আত্ম-সম্মান-জ্ঞান-হীনা ভোগ-বিহ্বলা কামোন্মাদিনী হয় না। আদি-রসে ভ্রূভঙ্গী কটাক্ষক্ষেপাদি, অনুভাব।

কিছুদিন পরে বীরেন্দ্র আবার যাওয়া আসা আরম্ভ করিল। কয়দিনের অদর্শনে বিমলা আত্মহারা হইয়া গিয়াছিল। এখন

আবার বীরেন্দ্রকে দেখিয়া সে আনন্দের আবেগে আপনাকে হারাইয়া বসিল। বীরেন্দ্রের সম্মুখে সে যেটুকু সঙ্কোচ করিয়া চলিত, সেটুকুও আর রহিল না। অসঙ্কোচে মেলামেশা চলিতে লাগিল। পিতা প্রমাদ গণিলেন। আসন্ন অনিষ্টপাত ভয়ে কন্যাকে বীরেন্দ্রের সম্মুখ হইতে সরানই এক্ষেত্রে কর্ত্তব্য বুঝিলেন। সাব্যস্ত হইল, মানসিংহের অন্তঃপুরে মহিষী উর্ম্মিলা দেবীর তত্ত্বাবধানে বিমলা থাকিবে। সেস্থানে বীরেন্দ্রের সাক্ষাৎলাভ আর ঘটিবে না। বিমলাও ক্রমে আপনাকে সংযত করিয়া লইবে।

বিমলা সেখানে লেখা পড়া শিখিল, নৃত্যগীতাদিতে পারদর্শিনী হইল। কিন্তু যে হৃদয় তাহাই রহিল। বীরেন্দ্র শূদ্রীগর্ভজা বলিয়া কিছুতে বিমলাকে বিবাহ করিবে না; অথচ, তাহারই জন্য বীরেন্দ্র উন্মত্ত, তাহাকেই চাহে। এই অবৈধ আকাঙ্ক্ষা, এই নির্লজ্জ ধৃষ্টতা, বিমলা বুঝিত না, এমত নহে। কিন্তু যে প্রণয়ে এমত উন্মত্তা, সে এসব আদৌ গণনা করে না। এমতই কামবিহ্বলা, সেই বীরেন্দ্রকে তবু সে চাহে। নির্লজ্জ এবং ধৃষ্ট বীরেন্দ্র মানসিংহের অন্তঃপুরে আশমানীকে দূতী করিয়া পাঠাইল। আর স্মরান্ধা আর প্রগল্‌ভা বিমলা সেই দূতী দ্বারা সংবাদ আদান প্রদান করিতে লাগিল। এইরূপে তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ধৈর্য্য বুঝি আর থাকে না।

একদিন রাত্রে সহসা বীরেন্দ্র আসিয়া বিমলার কক্ষে উপস্থিত হইল। আশমানীর সাহায্যে বারিবাহক দাস সাজিয়া বীরেন্দ্র রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে। অবশ্য বিমলার ইহাতে সম্মতি ছিল না। অনেক দিনের পর সাক্ষাৎলাভ। অমনই বিমলা, সকল কথা ভুলিয়া, বীরেন্দ্রের কণ্ঠ-লগ্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। রাত্রে এমনভাবে মিলন এই প্রথম। এ মিলনে যে ফল ফলিত তাহা কখনই শুভ হইত না। বীরেন্দ্র উন্মত্ত কামুক, বিবাহে অনিচ্ছুক, অথচ তাহার প্রেমাকাঙ্ক্ষী। আর বিমলাও আত্মহারা কামোন্মাদিনী; বিবাহে অনিচ্ছুক বীরেন্দ্রের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনী। আজিকার এই বিশ্রব্ধ সমাগমের ফল বিমলার পক্ষে ভাল নহে। বিমলা-চরিত্র বুঝি আর রক্ষা হয় না।

ভগবান মুখ চাহিলেন। চোর ধরা পড়িল। বন্দী হইয়া কারাগারে প্রবেশ করিল। বিমলা তখন সমস্ত দোষ আপনার স্কন্ধে লইয়া, প্রণয়ীকে বাঁচাইতে যত্ন পাইল। পিতা অভিরাম স্বামী ও রাজমহিষী উর্ম্মিলা দেবীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া, ক্ষমা চাহিল।

সাব্যস্ত হইল, বীরেন্দ্র যদি বিমলাকে বিবাহ করিতে স্বীকার করে, তবে তাঁহার দোষের ক্ষমা হইবে। বীরেন্দ্র তথাপি বিবাহ করিতে চাহিল না। কারা-যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন অগত্যা অর্দ্ধ-সম্মত হইল; বলিল, "বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখন উত্থাপন না করে, আমার ধর্ম্মপত্নী বলিয়া পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করি—নচেৎ নহে।"

বিমলা বিপুল পুলক সহকারে তাহাই স্বীকার করিল। দাসী বেশে ভর্ত্তৃ-ভবনে প্রবেশ করিয়া, সাধারণ চক্ষে রক্ষিতা-বৎ হইয়া বাস করিতে থাকিল। বিমলা পতি-প্রাণা প্রেমবতী সতী স্ত্রী—পতির প্রণয়-লাভ করিয়া সে সুখী হইল।

বিমলা স্বভাবতই তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী। সে যখন ছয় বৎসরের বালিকা, তখনই এক

পাঠান বালককে চোরের হস্ত হইতে উদ্ধারের উপায় করে; ভয়ে বিহ্বল হয় নাই। সেই পাঠান বালকই উত্তরকালের কতলু খাঁর সেনাপতি, মহাবীর ওস্মান্। এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপে বিমলা মুক্তি-চিহ্ন-স্বরূপ অঙ্গুরী-লাভ করে।

শিক্ষাগুণে রাজান্তঃপুরের সাহচর্য্যে বিমলার তীক্ষ্ণবুদ্ধি আরও মার্জ্জিত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মানসিংহ মহিষী ঊর্ম্মিলা দেবী বিমলাকে একপ্রকার নিজ হাতে লেখাপড়া শিখাইলেন, শিল্পকার্য্যে নৃত্যগীতে সম্যক্ পারদর্শিনী করিয়া তুলিলেন। এমত মণি-কাঞ্চন সংযোগ সকলের ভাগ্যে মেলে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা পাইয়া বিমলার প্রকৃতি-দত্ত গুণ সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষ-লাভ করে। তাই বিমলা অত চতুরা, অত বুদ্ধিমতী, অত নির্ভীক, অত প্রগল্ভা হইতে পারিয়াছিল।

শৈলেশ্বর মন্দিরে প্রথম দর্শনেই বিমলার অসামান্য বাক্‌পটুতা শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হই। তাহার পর, তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি-শক্তির পরিচয় পাইয়া ততোধিক বিস্মিত হই। বিদ্যাদিগ্‌গজকে ভুলাইয়া লইয়া গিয়া, পথেই কেমন বুদ্ধি করিয়া তাহাকে বিদায় দিল; মৃত অশ্ব, পাগড়ী ও ঘোড়-সোয়ারের চিহ্ন দেখিয়া বহুতর সেনা গড় মন্দারণের পথে গিয়াছে, ইহা অনায়াসেই সে অনুমান করিল। জগৎসিংহকে সঙ্গে করিয়া আনিবার কালে, শব্দ শুনিয়া, পশ্চাতে কেহ আসিতেছে বলিয়া সে বিবেচনা করিল। পরিশেষে, গুপ্তপথ দিয়া গিয়া, বীর-পঞ্চমীর ব্রতের নাম করিয়া, জেলখানার প্রহরীর নিকট হইতে কেমন কৌশলে বর্শা লইয়া আসিল।

বিমলার নির্ভীকতা সাধারণ স্ত্রীলোকে সম্ভবে না। সশস্ত্র বীরপুরুষের কবলে পড়িয়া বিমলা ক্ষণকালের জন্য বিহ্বলা চিত্রার্পিত পুত্তলিকা-বৎ নিস্পন্দ হইয়াছিল মাত্র। তার পর যে বিমলা সেই বিমলা। তারপর অমৃতময় রসালাপে, বিশাল চক্ষুর অব্যর্থ কটাক্ষ-সন্ধানে প্রহরীকে মুগ্ধ করিয়া, নিজের বন্ধন মোচন করিয়া লইল। বিমলা এক আশ্চর্য্য রকমের অভিনেত্রী; তাহার অভিনয় অভিনয় বলিয়া বুঝে, কাহার সাধ্য। মুগ্ধ প্রহরী বিমলার ভালবাসার অভিনয় সত্য বলিয়া বুঝিবে, আশ্চর্য্য কি? বিমলা ওড়না দ্বারা বাতাস দিতে লাগিল। প্রহরী কৃতার্থ হইল। আবার বিমলা যখন তাহার নবনীত সুকুমার কোমল কর-পল্লবে তাহার কর ধরিল, কণ্ঠস্থ স্বর্ণহার তাহার কণ্ঠে পরাইয়া প্রণয়ীর আদর করিল, তখন সেই উন্মত্ত প্রহরী সশরীরে স্বর্গে গেল। সে রূপাগুণে সেখজী পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়া গেল। কবি ঠিকই বলিয়াছেন—বিমলার রূপের আলোয় পুড়িয়া মরিতে হয়। আদর্শের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, সতী-নারীর পক্ষে এ অভিনয় অবশ্য অনুচিত। কিন্তু বিমলার চরিত্রগত বিশেষ বিশেষত্ব লক্ষ্য করিলে বলিতে পারা যায় যে, তাহার কোন পাপ-স্পর্শ হয় নাই। আর মন, আরব্ধ অভিনয়-কার্য্যে, অনেক সময়েই নির্লিপ্ত ও অকলুষ ছিল, বলা যায়। নির্লিপ্ত অকলুষ মনের অভিনয়-খেলা, কার্য্যসিদ্ধির উপায়রূপে আরব্ধ বলিয়া, নিন্দনীয় নহে, মনে করা যায়। এই অভিনয় সকলে পারে না। যে পারে না, তাহার নিকট ইহা পাপের মতই ভীতি-প্রদ। যে পারে, তাহার কাছে ইহা খেলার মত সহজ। বিমলার মত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-শালিনী রমণী এমন অভিনয় করিতে পারে। বিমলার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অনন্য সাধারণ। প্রহরী রহিম সেখের নিকট হইতে

পলায়ন করিয়া আবার যখন তাহারই হস্তে ধরা পড়িল, তখন কেমন করিয়া প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব খাটাইয়া তাহারই দ্বারা নিজের কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইল। চতুরা সুন্দরী নারীরা কামী পুরুষকে মুগ্ধ এবং প্রলুব্ধ করিয়া, এক কথায় বোকা বানাইয়া, কেমন যথেচ্ছভাবে চালনা করে, তাহাদিগকে লইয়া কেমন বানরের মত নাচাইয়া থাকে—তাহার সুন্দর চিত্র দেখা গেল।

সেই হাস্যময়ী প্রগল্‌ভা নারীর চক্ষুর উপর সুতীক্ষ্ণ কুঠার সূর্য্যতেজে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, আর প্রিয়তমের (বীরেন্দ্র সিংহের) ছিন্ন শির রুধির-সিক্ত ধূলিতে অবগুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বিমলা প্রস্তরমূর্ত্তির মত তখন দণ্ডায়মানা রহিল। মস্তকের একটী কেশ বাতাসে দুলিল না; চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু পতিত হইল না, কেবল শোকভার-স্তম্ভিতা হইয়া নিষ্পলক-নেত্রে স্বামীর ছিন্ন-শির প্রতি চাহিয়া রহিল।

চক্ষুর উপর প্রিয়তমের রক্ত দর্শন করিয়া বিমলা হৃদয়ের সমস্ত সঙ্কোচ বিসর্জ্জন দিল। সে পতির নৃশংস হত্যা চক্ষে দেখিয়া মন প্রাণকে প্রতিহিংসার উত্তেজনায় কঠোর করিয়া লইল।

যে বিমলা একদিন জগৎসিংহকে বর্শা আনিয়া দিয়া শত্রু বধে আপনাকে নিমিত্ত-ভাগিনী মনে করিয়া অনুতাপ করিয়াছিল; আমি মহাপাতকিনী, আজ যে কর্ম্ম করিলাম, বহুকালেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না বলিয়া ব্যথিতা হইয়াছিল; শত্রুবধে ধর্ম্ম আছে শুনিয়াও তবু যাহার মুখে "যোদ্ধারা এখন বিবেচনা করুক, আমরা স্ত্রীজাতি" এই কথা শুনা গিয়াছিল; সেই বিমলাই আজ অবলীলাক্রমে কতলুখাঁর বক্ষে আমূল ছুরিকা বসাইয়া দিতে কুণ্ঠিতা হইল না। বিমলার মানসিক কোমল-বৃত্তি, ও দ্বিধা-সঙ্কোচ প্রিয়তমের রুধির স্রোতে ধুইয়া মুছিয়া গিয়াছে বলিয়াই, আজ সে নবাবকে প্রতিশোধ দিতে সক্ষম হইল। এ হত্যা নহে, এ দণ্ড। বিচারকের মত বিমলা নিজ হস্তে এই দণ্ডের বিধান করিয়া অনুতপ্তা হয় নাই। সামান্য মাত্রও মুহ্যমানা হইয়া পড়ে নাই—তাই "পিশাচী নহি, সয়তানী নহি—বীরেন্দ্রসিংহের বিধবা স্ত্রী" বলিয়া বাধ্য হইয়া কক্ষ হইতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে পারিয়াছিল। ইহা উত্তেজনা-জাত হত্যা মাত্র হইলে, বিমলা সে সময়ে অমন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাইয়া কখন পলায়নে সফল-কামী হইতে পারিত না।

পতিহত্যার শোধ হইয়া গেল। পতিহীনা বিধবার জীবন ধারণের উদ্দেশ্য শেষ হইয়া গেল। আর জীবনের লক্ষ্য নাই, উদ্দেশ্য নাই, ফলও নাই। তিলোত্তমাকে সুখী দেখাই এক্ষণে শেষ আকাঙ্ক্ষা, তাহাও পূর্ণ হইল। দুঃখের মধ্যে ইহা একটী অভাবনীয় আনন্দ! এই দুঃখ শোকে আনন্দ মিশিল। বিমলা পাগল হইয়া গেল। যে প্রতিশোধের জন্য সে, নারী হইয়া, পতিব্রতা কুলস্ত্রী হইয়া, হত্যা করিল, তাহা তাহার কঠোর ব্রত-পালন। এ এক প্রকার আত্মবলি। সে ঠিক পতির তৃপ্তি-সাধনের জন্য বা পতির শেষ-আজ্ঞা পালনের জন্য, আপনার হৃৎপিণ্ডচ্ছেদও করিতে পারিত। তাই নবাবকে অস্ত্রাঘাত করিল; তাই ইহা হত্যা নহে। হত্যা করা বিমলার প্রকৃতির উপযোগিনী নহে। হত্যা-কারিনী পিশাচী নারীও, মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতায়, পাপের অনুশোচনায়, কখন কখন পাগল হইয়া উঠে। আর সতী নারীতে সেই হত্যার প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে না?

অত যার চিত্তবল, অত যার নির্ভীক সাহস, অত যাহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি—সে করিবে কি? অত বড় শোকে তাহার কান্না আসিল না। শোকের আগুণ অথচ ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। শোকের তাপই ক্রন্দনের আকারে উচ্ছসিত হয়; পশ্চাৎ অশ্রু হইয়া নির্গত হয়। তাহাতে শোকের তাপ কথঞ্চিৎ শীতল হইয়া থাকে। যাহারা কাঁদে না, তাহাদের তাপ সমানই উষ্ণ থাকে। সেই উষ্ণতায় দেহের অভ্যন্তর-ভাগ ক্রমে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যায়। ফলে, সেই তাপ ইন্দ্রিয় ও পরিশেষে মনকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করে। পরিণামে উন্মত্ততা আসিয়া উপস্থিত হয়। আত্মহত্যাও ইহার বিষময় ফল। বিমলা উন্মত্তা হইয়া যে অধিক দিন বাচিয়া থাকে নাই, স্বর্গগত পতির সহিত পরলোকে সত্বরই যাইয়া মিশিয়াছিল—তাহা আমরা পাঠকবর্গকে নিশ্চয় করিয়া জানাইয়া রাখিলাম।

শ্রীরামসহায় বেদান্ত-শাস্ত্রী।

গান।

(ভৈরবী—চৌরী)

আকাশের আলোর সাথে
মিল্‌বি যদি সহজ হ'।
কাননের ফুলের সাথে
মিল্‌বি যদি সহজ হ'।
তরু-মর্ম্মর পবন দোলায়
নৃত্য-দোদুল তারার মালায়
যে গান দোলে সেই দোলাতে
দুল্‌বি যদি সহজ হ'।

আনিস্ নে তোর ঘরের কথা
বিজন মনের ব্যাকুল ব্যথা
সহজ সরল শিশুর প্রাণে
বাহির হ'।
দেখ্ রে চেয়ে আকাশ পানে
বিশ্বভুবন ভরা গানে
সেই গানের তালে হৃদয় মেলে
সহজ হ'॥

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার।

"প্রাচীন আর্য্য সমাজে বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার" শীর্ষক প্রবন্ধের (১) উপসংহারে লিখিয়াছিলাম যে, প্রাচীন ভারতে অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে বারান্তরে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। এই অসবর্ণ-বিবাহ প্রধানতঃ দুই প্রকার—অনুলোম ও প্রতি-লোম। অদ্য আমরা অসবর্ণ বিবাহ [illegible]

(১) অর্চ্চনা, ফাল্গুন, ১৩২৫।

সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করিয়া, অনুলোম বিবাহের উৎপত্তি ও উহার প্রসার সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার প্রয়াস পাইব।

শাস্ত্রে দেখিতে পাই প্রাচীন ভারতে চারিটী মূল বর্ণ ছিল—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

এই বর্ণ বিভাগের পূর্ব্বে, ভারতাগত আর্য্যদিগের যে কোন পুরুষ যে কোন নারীর পানিপীড়ন করিতেন। পরে, জাতি বিভাগের উৎপত্তি হইলে, তদানীন্তন সমাজনীতি-বিদ্‌গণ, এই বিবাহ বিষয়ে কতকটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন। তাই আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—

সর্ব্বাগ্রে দ্বিজাতীনাম্ প্রশস্তদার কর্ম্মনি।
কামস্তু প্রবৃত্তানামিমাঃ স্যুঃ ক্রমশোঽবরা॥
শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা বিশঃস্মৃতে।
তে চ স্বা চৈব রাজ্ঞঃ স্যুঃ তাশ্চ স্বা চাগ্র

জন্মনঃ। ১০।৩

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয় প্রথমে স্ব-জাতীয়া কন্যার পানি গ্রহণ করিবেন, উহাই তাহাদিগের প্রশস্ত বিবাহ। তবে তাঁহারা যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলে —তাঁহারা অসবর্ণা কন্যাদিগের ও পানিপীড়ন করিবেন। বৈশ্য—বৈশ্যা ও শূদ্রা; ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা; এবং ব্রাহ্মণ—ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রার পানিগ্রহণ করিতে পারিবেন। এই যে শাস্ত্রানুসারে উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নীচ বর্ণের স্ত্রী সহিত বিবাহ ইহাকে অনুলোম বিবাহ বলে। এই সমস্ত বিবাহ সমাজে কি ভাবে নিষ্পন্ন হইত? মহাত্মা মনু বলিতেছেন—

পাণিগ্রহণ সংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহ কর্ম্মণি। ৪৩।

শরঃ ক্ষত্রিয়য়া গ্রাহ্য প্রতোদো বৈশ্য কন্যয়া।
বসনস্য দশা গ্রাহ্যা শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে॥ ৪৪।৩অ

সমান জাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করিতে হইলে পাণি-গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ সংস্কার সম্পন্ন হইবে। আর অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহে বক্ষ্যমান রীতিমত-বিধান প্রশস্ত জানিবে। ব্রাহ্মণ যখন ক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করিবেন, তখন ক্ষত্রিয়া ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক ধৃত শর গ্রহণ করিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যখন বৈশ্যাকে বিবাহ করিবেন, বৈশ্যা বর কর্ত্তৃক প্রতোদের (গো-তাড়ন যষ্টির) একদেশ গ্রহণ করিবেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রাকে বিবাহ করিলে, শূদ্রা ব্রাহ্মণাদির প্রবৃত বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবেক।

—ভারতচন্দ্র শিরোমণি-কৃত অনুবাদ।

অবশ্য এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, সমান সমান বর্ণের বিবাহই যখন "পাণি-গ্রহণ সংস্কার" বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন অসবর্ণ-বিবাহ বিবাহই নহে। আমরা কিন্তু এ বৃথা প্রশ্নের কোন হেতু দেখি না। কারণ, প্রথমে দেখা উচিত যে "পাণিগ্রহণ" বা "পাণি-গ্রহণ-সংস্কার" এই দুইটী শব্দের প্রকৃতার্থ কি এবং উহাদের ব্যাপ্তি ব্যাপকতাই বা কি? পাণি-গ্রহণ শব্দের মুখ্যার্থ "হস্তধারণ" অর্থাৎ বর কর্ত্তৃক কন্যার হস্ত ধারণ; গৌনার্থ—"বিবাহ"। তাহা হইলে, "পাণি-গ্রহণ সংস্কার" শব্দের মুখ্যার্থ—হস্তধারণ কর্ম্ম এবং গৌণার্থ "বিবাহ কর্ম্ম।" এক্ষণে আমরা দেখিব, ভগবান মনু কোন্ অর্থে এই "পাণি-গ্রহণ সংস্কার" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। আমরা মনে করি ভগবান মনু "পাণিগ্রহণ সংস্কার" "হস্তধারণ কর্ম্ম" এই মুখ্যার্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। কেন?—কারণ, শ্লোক সংস্থিত "উদ্বাহ কর্ম্মণি" শব্দের দ্বারাই ইহা প্রতিপন্ন

হইতেছে। কেবল ইহাই নহে; শ্লোক সংস্থিত "শূদ্রয়োৎকৃষ্ট বেদনে" শব্দ দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, মহাত্মা মনু বিবাহ বিষয়েই বলিতেছেন, অন্য কোন বিষয়ে নহে।

যাহা হোক, উদ্ধৃত প্রমাণাবলী হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, উচ্চ বর্ণ নীচ বর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত এবং ইহাও শাস্ত্রানুমোদিত। এক্ষণে আমরা দেখিব, ঐ সকল অসবর্ণা স্ত্রীগণ এবং তাহাদিগের গর্ভজাত সন্তানগণ তদানীন্তন সমাজে কি ভাবে গৃহীত হইতেন। মনু বলিতেছেন—

গুরুবৎ প্রতিপূজ্যাঃ স্যুঃ সবর্ণা গুরুযোষিতঃ।
অসবর্ণাস্তু সম্পূজ্যা প্রত্যুত্থানাভিবাদনৈঃ ॥২১০। ২ অ,
[অভিমুখী বরণায় বাদনং নামোচ্চারণ পূর্ব্বক নমস্কারঃ
অভিবাদয়ে ভো অমুক শর্ম্মা অহমিত্যেবং রূপ।
তত্ পাদস্পর্শপূর্ব্বক নমস্কারঃ।—শব্দকল্পদ্রুম]

অর্থাৎ, গুরুর অন্তেবাসিগণ সবর্ণা পত্নীকে ঠিক গুরুর মত পূজা করিবেন। আর গুরুর অসবর্ণা ভার্য্যাগণও উঁহাদিগের সম্যক্ পূজনীয়া। গুরুর অসবর্ণা স্ত্রীকে দেখিলে (বসিয়া থাকিলে) গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পাদবন্দনা ও অভিবাদন করিবে।

যখন সমাজে অসবর্ণ-বিবাহ প্রথম প্রচলিত হয়, তখন অসবর্ণা নারীর গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃ-বর্ণ প্রাপ্ত হইতেন। তাই বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন—

"মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রঃ যেন জাত স এব সঃ।" ২২৯

ক্রমশঃ, পরবর্ত্তী যুগে, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার কিছু তারতম্য ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়, কারণ, অনুলোমজগণ "অপসদ" অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত নীচ বলিয়া অভিহিত হন। তথাহি—

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতে বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্য বর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদা স্মৃতাঃ ॥১০।১০

অর্থাৎ, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা শূদ্রা; ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ও শূদ্রা এবং বৈশ্যের শূদ্রাজাত এই ছয়জন অনুলোমজ পুত্র। ইহারা স্ব স্ব পিতার সবর্ণ-স্ত্রী-জাত পুত্রগণ হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। পরবর্ত্তী যুগে, ইহারও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, অসবর্ণা-স্ত্রী-জাত সন্তানগণের কোন পৃথক সংজ্ঞা ছিল না। পরে, ইঁহারা পিতৃ স্ব-জাত্য পাইলেও, পৃথক সংজ্ঞায় অভিহিত হইতে থাকেন। তাই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই অনুলোম সন্তানগণের একটী তালিকা দিয়াছেন। আপনাদের অবগতির জন্য নিম্নে আমরা উহা উদ্ধৃত করিলাম—

বিপ্রাৎ মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়াং, বিশঃ স্ত্রিয়াং
অম্বষ্ঠ;
শূদ্র্যাং নিষাদোজাতঃ পারশবোঽপি বা। ৯১
বৈশ্যা শূদ্রাস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।
বৈশ্যাৎ তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ
বিধিস্মৃতঃ।৯২।১অ

তত্র বিজ্ঞানেশ্বর—ব্রাহ্মণ্যাৎ ক্ষত্রিয়ায়াং বিন্নায়াম্ উৎপন্ন মূর্দ্ধাবসিক্ত নাম পুত্রো ভবতি। বৈশ্য কন্যকায়াং বিন্নায়াম্ অম্বষ্ঠো নাম পুত্রো ভবতি। শূদ্রায়াং বিন্নায়াং নিষাদ নাম পুত্রো ভবতি। নিষাদো নাম কশ্চিৎ মৎস্যঘাতজীবী প্রতিলোমজঃ সমাভূদিতি পারশবোঽয়ং নিষাদ ইতি সংজ্ঞা বিকল্প, বিপ্রাৎ ইতি সর্ব্বত্র অনুবর্ত্ততে। ৯১।

বৈশ্যায়াং শূদ্রায়াং চ বিন্নায়াং রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ যথাক্রমং পুত্রৌ সম্ভবতঃ। বৈশ্যেন শূদ্রায়াং বিন্নায়াং করণো নাম পুত্রোভবতি। এষ সবর্ণ মূর্দ্ধাবসিক্তাদি বিন্নাসু উঢ়াসু এব সুত উক্তো বেদিতব্যঃ। এতে মূর্দ্ধাবসিক্তাম্বষ্ঠ নিষাদা মাহিষ্যোগ্রকরণা অনুলোমজাঃ পুত্রা বেদিতব্যঃ।

অবশ্য আপনারা প্রশ্ন করিবেন, যে বিষ্ণু সংহিতায় ও অগ্নি পুরাণে ত অনুলোমজগণকে "মাতৃবর্ণা" বলিয়া উক্ত হইতে দেখা যায়। হাঁ, আমরা উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণা" ও "অনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতি মাতৃ-

সমা স্মৃতা” ইত্যাদি বচন যে না দেখিয়াছি এমন নহে। তবে এই বচনদ্বয় সাধীয়সী নহে। কেন আমরা এরূপ বলিতে অভিলাষী? কারণ, এই উক্তিগুলি মন্বাদি সংহিতা ও অন্যান্য পুরাণের উক্তির সহিত সম্পূর্ণ বিরোধী সুতরাং ইহা গ্রাহ্য নহে। আমাদের এই উক্তির সমর্থন জন্য নিম্নে কতকগুলি প্রমাণ অধ্যাহার করিব। ইহাতেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে বিষ্ণুসংহিতা ও অগ্নিপুরাণের বচনদ্বয় অগরীয়সী।

স্ত্রীষনন্তর জাতেষু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহু মাতৃদোষ বিগর্হিতান্ ॥৬।১০ম মনু।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ইহাদের অসবর্ণা স্ত্রীজাত সন্তান, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ, মাহিষ্য, পারশব, উগ্রকরণ ইহারা সকলেই পিতার সদৃশ।

উক্তঞ্চ ব্যাসদেবেন—
উঢায়াং হি সবর্ণায়ামন্যাং বা কামমুদ্বহেৎ।
তস্যামুৎপাদিতঃ পুত্রো সবর্ণাৎ প্রহীয়তে ॥১২ অ।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রথমতঃ সবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া যদি ইচ্ছা বশতঃ অসবর্ণা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তবে সেই অসবর্ণা-স্ত্রী-জাত সন্তান “সবর্ণাৎ ন প্রহীয়তে”—পিতৃ স্বজাত্য হইতে একেবারে অধিক নিকৃষ্ট হইবে না, কিঞ্চিৎ হীন হইবে।

ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণ্যাৎ জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ন সংশয়ঃ।
ক্ষত্রিয়াং তথৈব স্যাৎ বৈশ্যায়ামপি চৈবহি ॥২৮—৪৭

তবে ইহাদের মধ্যে মুখ্য ও গৌণভেদে কিছু তারতম্য ছিল, তাই আমরা মনুসংহিতায় দেখিতে পাই—

ব্রাহ্মণস্যানুপূর্ব্বেণ চতস্রস্তু যদি স্ত্রীয়ঃ।
তাসাং পুত্রেষু জাতেষু বিভাগেঽয়ং বিধি স্মৃতঃ।১৪৯
চতুরোঽংশান্ হরেদ্ বিপ্র স্ত্রীন্ অংশান্ ক্ষত্রিয়াসুত।
বৈশ্যাপুত্রোহরেৎ দ্ব্যাংশং অংশং শূদ্রাসুতো হরেৎ।

যাহা হোক, এতদ্বারা সপ্রমাণিত হইল যে প্রাচীনকালে অনুলোমজগণ পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন, পরন্তু মাতৃবর্ণ নহে। শাস্ত্রে আমরা আরও দেখিতে পাই যে, মিশ্র অনুলোমজগণও অর্থাৎ অনুলোম জাতিদিগের মধ্যে পরস্পর বিবাহজ সন্তানগণ) পিতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইতেন এবং তাঁহারা দ্বিজাতির মধ্যে গণ্য হইতেন। যথা—

“মাহিষ্যেণ করণ্যাং রথকার [illegible]” তত্র বিজ্ঞানেশ্বর মিতাক্ষরা—ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়ামুৎপাদিতঃ মাহিষ্যঃ। বৈশ্যেন শূদ্রায়ামুৎপাদিতা করণী। তস্যাং মাহিষ্যেণ উৎপাদিতো রথকারো নাম জাত্যা ভবতি। তস্য চ উপনয়নাদি সর্ব্বং কার্য্যং বচনাৎ যদাহ শঙ্খঃ—

ক্ষত্রিয় বৈশ্যানুলোমন্তরোৎপন্ন যো রথকারঃ তস্য ইজ্যা দানোপনয়ন সংস্কার ক্রিয়া অশ্বপ্রতিষ্ঠা রথসূত্রবাস্তু বিদ্যাধ্যয়ণ বৃত্তি তা চ।

এই কারণেই জাতি-তত্ত্ব বারিধি-প্রণেতা লিখিয়াছেন—পূর্ব্বকালে, মাতা যে কোন জাতীয়া হউন না কেন, সন্তানগণ পিতৃ স্বজাত্য বা তৎসাদৃশ্য ভজনা করিতেন। এই কারণে, ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ-কন্যা হইতে জাত, আভীর বা সদ্গোপগণ, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য কন্যা হইতে জাত তাম্বুলিবগণ, অম্বষ্ঠ ও বৈশ্য-কন্যা হইতে জাত সুবর্ণবণিকগণ এবং অম্বষ্ঠ রাজ-পুত্রী হইতে জাত গন্ধবনিকগণ ও তথাবিধ দ্বিজাতি সম্পর্ক অন্যান্য বহুজাতি এক সময়ে উপবীত ধারণ করিতেন। সুতরাং তাঁহারা দ্বিজাতির মধ্যেও পরিগণিত ছিলেন।
—জাতি-তত্ত্ব-বারিধি, ১ম ভাগ, ১২৯ পৃষ্ঠা।

ক্রমশঃ, সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে, এই সকল মিশ্র অনুলোমজ-গণের ও অনুলোমজগণের মধ্যে কতকগুলির দ্বিজোচিত গুণের অভাব ঘটিলে পর, তদানীন্তন সমাজ-নীতিবিদ্‌গণ দ্বিজাতির শূদ্রাপরিণয় পাতিত্য-জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন এবং মিশ্র-অনুলোমজ-গণকে দ্বিজাধিকার দানে বিরত

হন (২)। ফলে, যে মহাত্মা মনু বা ভৃগু ঔদার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া দ্বিজাতিরও শূদ্রা বিবাহের বিধি মনুসংহিতায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সেই মনুসংহিতায় কোন অজ্ঞাত নামা রক্ষণশীল ব্যক্তি দ্বিজাতির শূদ্রাবিবাহ নিন্দাসূচক নিম্নোক্ত তিনটী শ্লোক অনুপ্রবেশন (interpolation) করিয়া দেন—

"ন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥"

৩।১৪

"হীনজাতি স্ত্রীয়ং মোহাৎ উদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু স সন্তানানি শূদ্রতাং॥" ১৪

"শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥" ১৭ ঐ

যাহা হোক, পরিশেষে ইহাই স্থিরীকৃত হয় যে, মোট ছয়টী জাতি দ্বিজাতির অন্তর্গত অন্যান্য জাতি নহে। তাই মনুসংহিতায় লিখিত রহিয়াছে—

স্বজাতি জানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজ ধর্ম্মিনঃ
শূদ্রানাং তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজা স্মৃতাঃ। ১০

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়া, ও বৈশ্য ও বৈশ্যা সমান জাতিতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই স্বজাতিজ তিন পুত্র এবং ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাতে জাত মূর্দ্ধাবসিক্ত ও অম্বষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত মাহিষ্য এই তিন অনন্তরজ পুত্র, মোট এই ছয় জাতি উপনয়ন-যোগ্য ও দ্বিজ-পদ-বাচ্য। আর অপধ্বংসজ গণ শূদ্র-ধর্ম্মা। এই অনুলোমজ-গণ সমাজে কি ভাবে গৃহীত হইতেন?

ব্রহ্ম মূর্দ্ধাবসিক্তাশ্চ বৈদ্যাঃ ক্ষত্রবিশাবপি
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্।
(মহামহোপাধ্যায় ভরত মল্লিক-কৃত চন্দ্রপ্রভা-ধৃত হারীত বচন)

ব্রাহ্মণ (ব্রহ্ম) মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্য এই পাঁচ জনের যথাপূর্ব্ব গৌরব।

এখানে মহর্ষি হারীত ষড়্দ্বিজের পরিবর্ত্তে পঞ্চদ্বিজের নাম লইয়াছেন, খুব সম্ভব ঐ যুগে মাহিষ্যজাতির পতন ঘটিয়াছিল বা অন্য কারণও থাকিতে পারে। তাই হারীত উহার নাম করেন নাই। যা হোক, সামাজিক পরিবর্ত্তনের জন্য এরূপ বিধি হইল বটে, কিন্তু সমগ্র দেশে যে উহার প্রভাব বিস্তার লাভ করিতে পারিয়াছিল তাহা মনে হয় না; কারণ তাহা হইলে মহর্ষি উশনা বলিতে পারিতেন না—

শূদ্রায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাত্যাপারশবামতাঃ।
ভদ্রকাদীন্ সমাশ্রিত্য জীবেয়ু পূজকাঃ স্মৃতাঃ।

৯।২।৫

ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক শূদ্রা কন্যা বিবাহ করিলে তাহাতে যে পারশব জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারা মদ্রাদি (পাঞ্জাব?) দেশে দেবপূজা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। বর্ত্তমান সময়ে এই পারশবেরা হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজমান থাকিলেও তাঁহারা কি ব্রাহ্মণ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত নহেন? দেবার্চ্চনা কি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে?

হিন্দুসমাজ বিভিন্ন ধর্ম্ম, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আসিয়া, বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। কাজেই আমরা এখন শাস্ত্রোক্ত অনেক অনুলোম জাতির অস্তিত্ব দেখিতে পাই না। ভারতের কোন প্রদেশে মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, মাহিষ্যগণেরও অবস্থা তদ্রূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে

(২) আমরা মনে করি, মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে, ২৫ শ্লোকটি পরবর্ত্তী যুগে মনুসংহিতায় প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

(৩) এই শ্লোকটীও মনুসংহিতাতে পরবর্ত্তী যুগে যোজিত হইয়াছে।

মূল বর্ণ ক্ষত্রিয়; বৈশ্যজাতি নাই। তবে কি আমরা মনে করিব যে, ঐ সকল জাতি একেবারে কাল কবলে কবলিত হইয়াছেন। স্থূল দৃষ্টিতে এরূপ মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ভারতে চতুর্বর্ণ প্রতিষ্ঠার বহু কাল পরে, যখন জাতিগুলি জন্মগত হইয়া দাঁড়াইল, তদানীন্তন সময়ের সমাজনেতৃগণ মূল বর্ণ চতুষ্টয়ের যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন, তদ্রূপ অনুলোম জাতিরও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বৃত্তি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। (৪) হিন্দু রাজত্বের সময় যে যাহার বৃত্তি সে তাহাই করিত। যদি না করিত তবে তাহার বর্ণ সঙ্করত্ব ঘটিত। তাই মনু বলিতেছেন—"স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসঙ্করঃ।" আর বর্ণসঙ্কর হইলেই তাহারা শূদ্রধর্ম্মাবলী হইতেন। সুতরাং, তদানীন্তন সমাজের নিষ্পেষণে পরবর্ত্তীযুগে অনেকের জাতি-পতন যে ঘটিয়াছিল, তাহা ধ্রুবই। তাই আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যোচিত বংশগত উপাধি (৫) এখনও তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যে দেখিতে পাই। কে বলিতে পারে যে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ও বৈশ্য প্রভৃতি উচ্চ জাতিগুলি ইদানীন্তন সমাজের তথাকথিত শূদ্রজাতির মধ্যে প্রবেশ লাভ করে নাই? ইহার কি প্রমাণের অভাব আছে?

তৎপর আবার শাস্ত্রোক্ত বৃত্তি গ্রহণ (৬) করিয়াও, এই সকল অনুলোমজ-জাতি পরবর্ত্তী-যুগে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন ও এখনও হইতেছেন। বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বলিয়া, উদাহরণ-স্বরূপ, আমরা বাঙ্গলার দুইটী প্রধান জাতির বিষয় কিছু উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। যে অম্বষ্ঠ-গণ বাঙ্গলা দেশে বৃত্তি অনুসারে—"অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং" "বৈদ্যজাতি" বলিয়া পরিচিত, সেই অম্বষ্ঠগণই উৎকলে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত! উৎকলের কারিকাই এ বিষয়ে জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে—

> করশর্ম্মা ভরদ্বাজ ধরশর্ম্মা পরাশরঃ
> মৌদগোল্য দাশশর্ম্মা গুপ্তশর্ম্মা চ কাশ্যপঃ
> ধন্বন্তরি সেনশর্ম্মা দত্তশর্ম্মা পরাশরঃ
> শাণ্ডিল্য চন্দ্রশর্ম্মা চ অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ ইমে॥
>
> —উৎকল-কারিকা।

কার্য্যব্যপদেশে সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে অবস্থানহেতু আমরা জানিতে পারিতেছি যে, উত্তর-পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশে "বৈদ্য" বা "অম্বষ্ঠ" উপাধি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ রহিয়াছেন! আবার যে কায়স্থগণ উৎকলে করণ বলিয়া পরিচিত (৭), বাঙ্গলা দেশে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৃত্তি অনুসারে তাঁহারা "কায়স্থ" (৮) বলিয়া পরিচিত। মিথিলার

(৪) কুল্লূক মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে ষষ্ঠ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—বৃত্তয়শ্চ এষাম্ উশনা উক্তা—হস্ত্যশ্ব রথশিক্ষা অস্ত্রধারণঞ্চ মূর্দ্ধাবসিক্তানাং নৃত্যগীতনক্ষত্রজীবনং শস্যরক্ষা চ মাহিষ্যাণাং দ্বিজাতি শুশ্রূষা ধনধান্যাধ্যক্ষতা রাজসেবা দুর্গান্তঃপুর রক্ষাচ পারশবোগ্রকরণানাম্।

(৫) ভবিষ্যতে উপাধি-রহস্য উদ্ঘাটন করিবার বাসনা রহিল।

(৬) উশনা বলিয়াছেন—বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোহ্যম্বষ্ঠ উচ্যতে। কৃষ্যাজীবো ভবেৎ সোপি তথৈবাগ্নেয় বৃত্তিকঃ ধ্বজিনী বৃত্তি কোপি চিকিৎসা শাস্ত্র জীবিকঃ॥

(৭) উড়িষ্যাবাসী কায়স্থগণ করণ বলিয়া পরিচিত। কৈলাসে চন্দ্র সিংহ লিখিত প্রবন্ধ; ১২৯৫ সাল, ৪২৩ পৃষ্ঠা, নব্যভারত।

(৮) করণঃ পুং শূদ্রা বৈশ্যয়োর্জ্জাতি বিশেষ ইত্যমরঃ। অযং লিখনবৃত্তি কায়স্থ ইতি (ভট্টীকায়াং) ভরতঃ শব্দকল্পদ্রুম।

লোকেরা কায়স্থকে "লিখনী দাস"(৯) বলিয়া অভিহিত করেন।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুসমাজের মধ্যে কত মিশ্রণ সংমিশ্রণ ব্যাপার ঘটিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ গঠিত হইয়াছে, তাহা সমাজ-তত্ত্বজ্ঞগণ অবগত আছেন। বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া, অতি নীচাদপি নীচ জাতিও ইহার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারেন নাই। যাঁহাদিগকে আমরা সাধারণতঃ শূদ্র বলিয়া অভিহিত করি, তাঁহারা অধিকাংশই মূলতঃ অনার্য্য শূদ্র নহেন; পরন্তু, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই দ্বিজাতিত্রয়ের অন্তর্বংশ।

অতএব আমরা দেখিলাম যে প্রাচীন আর্য্যসমাজে অনুলোম বিবাহের বহুল প্রচলনই, সমাজে বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণী বিভাগের প্রধান কারণ। পৌরাণিক যুগের সামাজিক শাসনে এবং বৌদ্ধ ও পরবর্ত্তী যুগের নানা বিপ্লবে হিন্দুসমাজ শতধা বিভক্ত হইয়াছিল। তাহার ফলে, যে সকল উচ্চজাতির অধঃপতন ঘটিয়াছিল, আজ ইংরাজি শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত হইয়া, তাঁহারা তাঁহাদের সমাজে স্ব স্ব অধিকার-লাভে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা যে সমাজের শুভ-লক্ষণ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আশা করি, সমাজ-নেতৃগণ উদারতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিবেন।

শ্রীললিতমোহন রায়।

(৯) কায়স্থোঃক্ষরজীবিকঃ। হলায়ুধঃ।

অনাদর।

হে মোর জীবন-প্রিয়, অবহেলা ভরে
দলিয়া-মথিয়া তুমি হৃদয় আমার,
ম্লান ছায়া আঁক, তৃষিত নয়ন প'রে
মোর! সমাদরে কাছে ডাকিও না আর।
—তোমার আদরে সখা, ভুলি ভগবানে,
তব অনাদরে কাঁদি তাঁহারি সন্ধানে!

শ্রীঅনাথ বন্ধু সেন।

মধ্যযুগের ইউরোপীয় দর্শন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

স্কোটাস্ ঈরিগিনা।

(Scotus Erigena)

মানব পার্থিব ও অপার্থিব যাবতীয় জীবরাজ্যের সারাংশে গঠিত এবং বিশ্বের ক্ষুদ্রাবয়ব; একারণ সমগ্র সৃষ্টির উপরেই তাহার আধিপত্য অল্পবিস্তর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবতার সহিত মানবের প্রভেদ এই যে, মানব পাপাশ্রিত জীব, অনুতাপানলে দগ্ধ হওয়া ভিন্ন তাহার উদ্ধারের উপায় নাই। কেবল দেহের সহিতই পাপের সম্বন্ধ। দৈহিক

বিকাশের সঙ্গে ইন্দ্রিয়বৃত্তির প্রাধান্য অধিক হওয়ায় বুদ্ধির স্ফুরণ হয় না বলিয়া পাপের ক্রিয়াই অধিক প্রতিভাত হয়।

মানব মূলে দেহভাব পাইয়াছিল বলিয়াই যে পাপের আধিক্যবশতঃ তাহার এই অবনতি হইয়াছে, তাহা নয়, তদীয় অধোগতিও আবার দেহভাব প্রাপ্তির কারণ। দৈহিক বৈলক্ষণ্য, ব্যাধি, মৃতবৎ জড়তা, দেহের সহিত আত্মার বিরোধ, স্ত্রীপুংভেদ, এসকলেই পাপ, পতন, ঈশ্বর-বিচ্যুতি এবং বিশ্বপ্রেমের অভাব প্রকটিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে, ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত যখন সৃষ্টিই নাই, তখন যাহাকে আমরা ঈশ্বর-বিচ্যুতি, পাপ বা পতন বলি, তদ্দারা কোন বাস্তব সত্তার জ্ঞান না হইয়া বরং অসদ্ভাব জ্ঞানই জন্মিয়া থাকে। সৃষ্টি বিষয়ে অপটুতা, অকৃত-কার্য্যতা, এবং নাস্তিত্বের ধারণা হয়। অমঙ্গলের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, যে বস্তু যে পরিমাণে মঙ্গলকর, তাহার অস্তিত্বও ততটুকু, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠত্ব বা সারবত্তাই পরিমাপক। বাস্তবে এবং পূর্ণতায় প্রভেদ নাই। এই তত্ত্বকেই যদি সত্য বলিয়া গ্রহণ করি, তাহা হইলে ইহাও সত্য যে, যে বস্তু সর্ব্বৈব অসম্পূর্ণ, যাহাতে পূর্ণত্বের আভাস মাত্র নাই, সে বস্তুর অস্তিত্বও নাই, কিন্তু এরূপ বস্তুরই ত কল্পনা হয় না। অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে, মূর্ত্তিমান পাপ যাহাকে পাপের পূর্ণাবতার বলা হয়, তাহা জগতে দুর্লভ। সত্তা, জীবন কিম্বা মঙ্গলের অভাবকেই অমঙ্গল বলে। কোন বস্তু হইতে যদি তাহার সারভাগ বা সদ্গুণাবলী নিঃশেষে নিষ্কাশিত করা যায়, তাহা হইলে সে বস্তুর বস্তুত্বই থাকে না, তাহা তখন সর্ব্বতোভাবে লোপ পাইতে বাধ্য।

সৃষ্টি চিরন্তন এবং নিরবচ্ছিন্ন; সৃষ্টি ক্রিয়ার আরম্ভও নাই, শেষও নাই। ঈশ্বর-মহত্ত্বেই জগতের পূর্ব্ববর্ত্তী, কালে নয়; কাল দ্বারা তাঁহার অগ্রবর্ত্তিতা বা আদিমতার তুলনা হয় না। তিনি সর্ব্বাংশে, সম্পূর্ণরূপে ধ্রুব; জগতের সত্তা আপেক্ষিক। সূর্য্য কিম্বা অগ্নি হইতে যে প্রকারে তাপ বা আলোক বিচ্ছুরিত হয়, ঈশ্বর হইতেও সেই প্রকারে জগতের বিকাশ হইয়াছে। ঈশ্বরের ভাবই সৃষ্টি এবং তাহাতেই জগতের উদ্ভব। ঈশ্বরের ভাবের যেমন আরম্ভ নাই, তাঁহার ক্রিয়াশীলতারও সেইরূপ আরম্ভ নাই। প্রাণীমাত্রই মূলতঃ অক্ষয় ও অমর, নিখিল প্রাণিজগৎ অনাদি ও অনন্ত কাল সূত্রে গ্রথিত। আমরা সকলেই প্রাচীনতম কাল হইতে জীবিত রহিয়াছি, তবে বর্ত্তমানে আমাদের যে, যে পর্য্যায়ে অবস্থিত, তাহার সেই পর্য্যায়, এক অসীম কারণ পরম্পরা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর পূর্ব্বাপর পূর্ণ-ব্রহ্ম-রূপে বিরাজমান; তিনিই কেবল কালের কোন বিশিষ্ট মুহূর্ত্তে বীজরূপে অবস্থান করেন নাই। বাইবেলে যে বলে, "কিছু না" হইতে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই "কিছু না"র অর্থ শূন্য (০) নয়, পরন্তু তাহা এমন 'কিছু" যাহার তুলনা হয় না,—তাহা এক অনির্ব্বচনীয়, অচিন্ত্য, অ-পার্থিব বস্তু যাহাতে ভগবানের অসীম সৌন্দর্য্যের আদিরূপ নিহিত রহিয়াছে; সেই রূপ মানবের বাঙ্‌মানসোগোচর ত বটেই, এমন কি দেবতার ও অপরিজ্ঞাত।

জাতি, শাখা বা শ্রেণী এবং ব্যক্তি (individual) অসীম মহাসত্তা (infinite being) হইতে পর্য্যায়-ক্রমে বিশ্লিষ্ট হইয়াছে। সামান্য ও বিশেষের অনন্ত বিশ্লেষণই সৃষ্টি। সত্তা সৃষ্টির সর্ব্বপ্রথম স্তর, সর্ব্বজীবের আদি

ভাব। সত্তা হইতেই দেহাবস্থিত প্রাণ পর্য্যায়ক্রমে পৃথগ্‌ভূত হইয়াছে। প্রাণ হইতে বুদ্ধির উৎপত্তি, এবং বুদ্ধি দেবতা-ও-মানবক্রমে, ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর জীব গণ্ডিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। মানবে আবার বুদ্ধির পরিণতি জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিকাশরূপে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিতেই সীমাবদ্ধ। যাবতীয় সৃষ্টি কতকগুলি ঐককেন্দ্রিক বৃত্তের (concentric circle) সম্যক সমন্বয়। একদিকে, পারমার্থিক সত্তার (divine essence) অবিরাম বিকাশ, প্রসার ও স্ফুরণ; অপরদিকে, সৃষ্টির শেষ পরিধি হইতে জীবের ঈশ্বরানুবর্ত্তন। এই উভয় গণ্ডীর মধ্যে গমন ও আগমন ভিন্ন সৃষ্টির আর অন্য অর্থ নাই। মনুষ্য বিরচিত বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, বস্তুতঃ কিরূপে আদি-কারণ (first causes) হইতে দ্রব্যনিচয়ের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কিরূপেই বা দ্রব্য সমূহের শ্রেণী ও জাতি বিভাগ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহারই নির্ণয় করা। এই অর্থে বিজ্ঞানকে "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌" (dialectics) নাম দিয়া তাহাকে জড়-বিজ্ঞান ও নীতি বিজ্ঞানে (*) বিভক্তকরা যায়, কিন্তু প্রকৃত "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌" আদি-যুগের "সফিষ্ট" বা তার্কিক দিগের মতানুসারে কেবল কল্পনা বা খেয়ালের উপর নির্ভর করে না। স্বয়ং ঈশ্বরই নিখিল বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যার মূলীভূত কারণ এবং তিনিই "ডায়ালেক্‌টিক্‌স্‌কে" বস্তুজাতের স্বরূপের সহিত এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। এই সংযোগেরই পরিণতি-স্বরূপ মানবাত্মা জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সাহায্যে প্রকৃতিকে জয় করিয়া পরিশেষে ঈশ্বরে মিলিত হইতে পারে। জগতের পক্ষে এই পরিবর্ত্তন মানবে সাধিত হয়, মানবের পক্ষে খ্রীষ্টানে ও খ্রীষ্টে এবং খ্রীষ্টানের পক্ষে তদীয় সূক্ষ্ম শরীরের ভিতর দিয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভাবে, ঈশ্বরেই পর্য্যবসিত হইতেছে। বস্তু মাত্রেই যেমন ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত হয়, তেমনি আবার ঈশ্বরেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। স্কোটাস্‌ যে সার্ব্বজনীন পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ-বাদের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য মোক্ষলাভ। মোট কথা, পতিত দেবতা, পতিত মানব এবং পতিত জীব, সকলেরই ঈশ্বরত্বে অধিকার আছে; কেহই ঈশ্বরানুগ্রহে বঞ্চিত নয়। নরকের শাসনই আত্মোৎকর্ষের হেতু। পরমার্থ বা মোক্ষলাভ অপেক্ষা মহত্তর পুরস্কার নাই, পাপকৃত সন্তাপ অপেক্ষা অধিক যন্ত্রণাপ্রদ দুঃখও নাই। দণ্ডমাত্রই স্বকৃত কর্ম্মের ফল, ঈশ্বরাদেশ লঙ্ঘনের অনিবার্য্য পরিণাম।

সেণ্ট্‌ অ্যান্‌সেলম্‌।

(St. Anselm)

স্কোটাস ঈরিগিনা অমানিশার উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তত্তুল্য প্রতিভাবান ব্যক্তি তৎকালে আর জন্মিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। এই সময়ে(+) অর্থাৎ

* খ্রীষ্টদর্শন, ৩৮ ও ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

+ প্রাচ্য প্রদেশে বোগ্‌দাদ্‌, বস্রোয়া, বোখারা ও কুফার বিদ্যালয় এবং পশ্চিমে স্পেনদেশে কর্ডোভা, গ্রাণাডা, টোলেডো, সেভিলা, মুর্সিয়া, ভ্যালেন্‌সিয়া, আলমিরিয়া প্রভৃতির বিদ্যালয়। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে আরবীয়েরাই গ্রীক, পারসিক ও হিন্দুদিগের উপযুক্ত শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্র অ্যারিষ্টটোলীয় দর্শন এবং নব-আদর্শবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠামাত্র। তাঁহারা যে এই মতদ্বয়ের এত ভক্ত ছিলেন, তাহার কারণ ইস্‌লাম ধর্ম্মের একেশ্বরবাদের সহিত এই দুই

খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, আরবীয় শিক্ষাকেন্দ্র সমূহ যখন গ্রীসীয় এবং প্রাচ্য দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রের জনশ্রুতি মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক প্রতিপত্তি লাভ করিতেছিল, সেই সময়ে অপরদিকে ইউরোপ খণ্ডের খ্রীষ্টসমাজে, কতিপয় ব্যক্তি জ্ঞান (reason) ও বিশ্বাস (faith), উভয়ের সমন্বয়-সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। ইঁহাদের একজনের নাম জার্ব্বার্ট বা দ্বিতীয় সিলভেষ্টর্ (Gerbert or Sylvester, II) ; ইনি আরবদিগের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। টুর্সের বেরেঙ্গার (Berengar of Tours), লাফ্রাঙ্ক (Lanfranc), নীতিবিষয়ক একখানি পুস্তক-প্রণেতা টুর্সের বিশপ্, লাভার্দ্দিনের হিল্ডিবার্ট (Hildebert of Lavardin) প্রভৃতি কয়েক জনের নাম উল্লেখযোগ্য। স্কোটাস্ যে সকল গভীর বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন, এই সকল ব্যক্তির কিন্তু তাহাতে উৎসাহ ছিল না। তাঁহাদের জ্ঞানের পরিধি সঙ্কীর্ণ ছিল। এজন্য সাধারণতঃ তাঁহারা অজ্ঞানের ন্যায় সামান্য সামান্য বিষয়ের তর্কে সময়াতিপাত করিতেন। এ স্থলে তাঁহাদের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। "ঈশ্বরানুকম্পায় কি কুমারী বারাঙ্গনা কুমারিত্ব পায়?" "মূষিকে খ্রীষ্টানের মাংস ভক্ষণ করিলে কি খ্রীষ্টের মাংসও ভক্ষণ করা হয়?" খ্রীষ্টীয় দর্শনশাস্ত্রের তখনও শৈশবাবস্থা, সুতরাং এই সকল প্রশ্নের সমাধানেই তাঁহাদের অনুরাগ দেখা যাইত। কিন্তু এই সকল প্রশ্নের মূলে যে উত্তরকালের এক তুমুল সংগ্রাম প্রধূমিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

স্কোটাসের পর লাফ্রাঙ্কের শিষ্য সেণ্ট্ অ্যান্সেলম্ই ভাবুক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যে প্রথম বলিয়া গণ্য। তিনি খ্রীষ্টীয় ১০৩৩ অব্দে আওস্তায় (Aosta) জন্মগ্রহণ করেন। পরে, ১০৬০ অব্দে নর্ম্মাণ্ডির অন্তর্গত "বেক্" মঠের অ্যাবট্ (abbot) পদে এবং পরিশেষে ১০৯৩ খৃষ্টাব্দে ক্যাণ্টারবেরির প্রধান যাজকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১১০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। খ্রীষ্টধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিকল্পে তাঁহার সমস্ত জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি Monologium, Prosologium, Apologeticus, Fide Trinitales, De Grammatico, De Veritale প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থের রচয়িতা।

সেণ্ট্ অ্যান্সেলম্ ও সেণ্ট আগষ্টাইন্, উভয়ের মূলমতে ভেদ ছিল না ; একারণ, সেণ্ট্ অ্যান্সেলম্কে দ্বিতীয় আগষ্টাইন্ বলা হইয়া থাকে। আগষ্টাইনের ন্যায় তিনিও

মতের ঐক্য আছে। মূল মতের পুনরাবৃত্তি হইলেও আরবদিগের দ্বারা ইহাদের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল।

আরবীয় শিক্ষাকেন্দ্র সংশ্লিষ্ট কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় নিম্নে দেওয়া যাইতেছে—

(১) ঈরিগিনার সমসাময়িক অল্‌কেন্দি (Alkendi) ও বোগ্দাদের অল্‌ফ্যারেবী (Alfarabi)। শেষোক্ত ব্যক্তি খ্রীষ্টান দার্শনিকদিগের আদৃত একখানি কোষগ্রন্থের রচয়িতা। (২) অবিচিন্ন (Avicenna or Ibn-Sina)। ইনি একজন চিকিৎসক এবং অ্যারিষ্টটলের টীকাকার। (৩) অলগ্‌জল্ (Algazal)। ইনি বোগ্দাদের একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান এবং সন্দেহবাদী দার্শনিক (১১১১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু)। (৪) স্পেনদেশে সারাগোসার এভম্পাস্ (Avempace or Ibn-Badja), ১১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু। (৫) কাডিজের ইবন্ তপ্‌হৈল (Ibn-Tophail, খৃঃ ১১০০-৮৫)। (৬) কর্ডোভার এভ্‌রোস (Ibn-Racid, খৃঃ ১১২৬-৯৮)। ইঁহাকে "ভাষ্যকারের ভাষ্যকার" বলা হয়। ইঁহাদের সকলেই বহুশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন।

বলিয়াছেন, বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল এবং বিশ্বাস ধর্ম্ম-বিষয়ক যাবতীয় তর্ক ও চিন্তার পূর্ব্বগামী। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, অবিশ্বাসীদিগের মূলতত্ত্বে আস্থা নাই বলিয়া মূলতত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টাও নাই। বিশ্বাসীদের চেষ্টা আছে, কারণ তাহাদের মূলতত্ত্বে আস্থা আছে। বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী, উভয়ের উদ্দেশ্য কিন্তু এক, তত্ত্বজ্ঞানলাভ; প্রভেদ এই যে, একের উদ্দেশ্য সফল হয়, অপরের হয় না। অবিশ্বাসীর তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বিষয় জ্ঞানের মূল যেমন অভিজ্ঞতা, তত্ত্বজ্ঞানের মূলও তেমনি বিশ্বাস। দুয়ের কার্য্য একই রূপ। অন্ধ যেমন আলোকের অনুভূতি নাই বলিয়া আলোক কিরূপ জানে না, মূক ও বধির যেমন শব্দের অনুভূতি নাই বলিয়া শব্দ কিরূপ জানে না; অবিশ্বাসীও সেইরূপ আত্মিক অনুভূতির অভাবে তত্ত্বজ্ঞান কাহাকে বলে বুঝিতে পারে না। যেবিষয়ে যাহার অনুভূতি নাই, সেবিষয়ে তাহার জ্ঞান হইবে কিরূপে? আমরা (অর্থাৎ, বিশ্বাসীরা) বিশ্বাস করি বলিয়াই বুঝিতে চাই ও তাহার ফল-স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করি। উদার মতাবলম্বী খ্রীষ্ট সমাজের পবিত্র শিক্ষা ও দীক্ষায় কোন খ্রীষ্টানেরই সন্দেহ থাকা উচিত নয়। পরন্তু তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য যে তিনি দীনতার সহিত, ভক্তির সহিত, উক্ত শিক্ষা ও দীক্ষায় আস্থা স্থাপনপূর্ব্বক তাহা বুঝিতে চেষ্টা করেন এবং প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই শিক্ষানুযায়ী কার্য্য করেন। সত্যই যদি তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত গ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকেন, তবে নিখিল বুদ্ধির কারণ স্বরূপ সেই পরমেশ্বরের প্রতি তিনি অবশ্যই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইবেন। অপারগ হইলে তাঁহার নিজেরই অসামর্থ প্রকাশ পাইবে, তজ্জন্য অন্য কেহই দায়ী নহেন এবং মতেরও কোন দোষ নাই। না বুঝিয়া মতের দোষ দেওয়া কিম্বা তাহার বিপক্ষতাচরণ করা, অবিধেয়। বিশ্বাসের ফলে কেবল যে, ধর্ম্মের অনুবেদগাম হয়, তাহা নহে,—খৃষ্টানের লক্ষ্য কেবল বিশ্বাসী হওয়া নয়,—বিশ্বাস অবিচলিত থাকা, যেহেতু, এই বিশ্বাসেই চিন্তা ও ভাবের পরিণতি, চরম অভিব্যক্তি, ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের স্থিতিকেন্দ্র বা সন্ধিস্থল।

উপরোক্ত বিবরণ সেণ্ট অ্যান্সেল্মের প্রায় স্ব উক্তি বলিলেই হয়। উহা পাঠকালে মনে হয়, তিনি যেন কেবল ধর্ম্ম জগতেরই লোক, কিন্তু ঠিক তাহা নহে। এই ধর্ম্মপ্রাণ উদারচেতা দার্শনিক আপনাকে যত সরল ও সহজ লোক মনে করিতেন, বস্তুতঃ তিনি তদপেক্ষা বহুল পরিমাণে স্বাধীন-চিত্ত ও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তিনি একজন খাঁটী সাম্প্রদায়িক মতবাদী এবং মধ্যযুগীয় দর্শন-শাস্ত্রের মূলভিত্তি জ্ঞান ও বিশ্বাসের সদ্ভাব স্থাপনকর্ত্তা।

তাৎকালিক পদ্ধতিক্রমে সেণ্ট্ অ্যান্সেলম্ অধ্যাত্মের দিক দিয়াই দর্শন শাস্ত্রের কূট মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে, তদীয় উপদেশাবলী এক সুবৃহৎ ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হইয়াছিল। সেণ্ট্ আগষ্টাইনের ন্যায় তাঁহার তর্কও অন্তর্ম্মুখী ও অবরোহ-পন্থী ছিল। প্রথমেই তিনি ঈশ্বরকে নিখিল সৃষ্টির নিমিত্ত ও উদ্দেশ্য-সাধক-কারণ রূপে স্বীকার করিয়াছিলেন। তৎকালে তাঁহার প্রণীত ধর্ম্ম শাস্ত্র (Theodicy) একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ এবং মতের সমীচীনতায় তাহা অতুলনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। মোট কথা সেণ্ট্ অ্যান্সেলম হইতে সে সময়ে ধর্ম্মতত্ত্বের যে

পরিমাণে উন্নতি হইয়াছিল, তাহাতে ইহাকে এক পরিণত-বিজ্ঞান (science) রূপে গ্রহণ করা চলে। উত্তরকালের দার্শনিকগণ স্ব স্ব বিদ্যা ও বুদ্ধি প্রভাবে ইহার বিভিন্ন ভাষ্য প্রচার করিলেও মূল তত্ত্বের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তৎপ্রণীত Prosologium ও Monologium গ্রন্থে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ প্রযুক্ত হইয়াছে এবং তৎসহ ঈশ্বরের গুণাবলী (অর্থাৎ মৌলিকতা, নিত্যত্ব, বিরাটত্ব প্রভৃতি), সৃষ্টি বিবরণ এবং দৃষ্টান্ততত্ত্বও (exemplarism) লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এই স্থলে কয়েকটি প্রধান বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে।

(১) ঈশ্বরের অস্তিত্ব (existence of God) ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ক যুক্তিগুলির অধিকাংশই সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলমের মৌলিক। তিনি বলেন—"এমন কোন বস্তু অবশ্যই আছে যাহা স্বয়ং মঙ্গল স্বরূপ, মহান্ ও স্ব-প্রতিষ্ঠ, সেই বস্তুই ঈশ্বর।" পুনশ্চ, এই যে বিশাল প্রতীয়মান শ্রেণী-বিন্যস্ত প্রাণি জগৎ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিরাজিত, ইহার মূলে এমন কোন বস্তু অবশ্যই বিদ্যমান, যাহার অপেক্ষা মহত্তর বস্তুর অবস্থিতি অসম্ভব, সেই বস্তুই পরমেশ্বর। অধিকন্তু, আমরা সকলেই এমন এক মহাপুরুষের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি যাঁহার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী মহাপুরুষের কল্পনাই হয় না। এরূপ ধারণা হয় কেন? এরূপ ধারণা হয়, কেন না এবম্প্রকার পুরুষ বিদ্যমান রহিয়াছে। সত্তা বা বিদ্যমানতা স্বয়ংই পূর্ণতাব্যঞ্জক। একারণ, পূর্ণসত্তার ধারণা হইতে পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয়। অতএব এই পূর্ণ পুরুষই ঈশ্বর। মধ্যযুগে সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলমের এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সমীচীন বিবেচিত হইলেও এবং তিনি এই মতের প্রথম প্রচারকর্ত্তা হইলেও আধুনিক ঐতিহাসিকেরা কিন্তু ইহার দোষ দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বা মহৎ কোন বস্তুর ধারণা থাকিলেই যে সেই বৃহত্তম বা মহত্তম কোন বস্তুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল, তাহা বলা ভুল। গউনিলো (Gaunilo) নামে সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলমের সমসাময়িক এক ব্যক্তি উল্লিখিত যুক্তির এইরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন যে, যদি কেহ মহাসমুদ্রস্থিত কোন অসীমসৌন্দর্য্যশালী দ্বীপের কল্পনা করেন, তাহা হইলে সেই দ্বীপের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধিকাংশ সাম্প্রদায়িক পণ্ডিত, বিশেষতঃ সেণ্ট্ টমাস্, এই মতকে ভ্রান্ত মত বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। সত্যের সংজ্ঞা নিরূপণ (definition of truth)—সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্ dederitale (সত্যসিদ্ধান্ত) নামক গ্রন্থে সত্যের প্রকৃতি সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সত্যকে তিনি অতিন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক ভাবেই দেখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সত্য (ut debent) বস্তু সকলের সারত্ব প্রতিপাদক মিলনগ্রন্থী, পারমার্থিক সত্তার প্রতিনিধি, যাবতীয় বস্তুর সারভাগ যাহা পরিশ্রুত ও প্রমাদপরিশূন্য হইলে কেবল বুদ্ধিরই অধিগম্য হয়। সত্যের নাশ নাই, সত্য নিত্যচঞ্চল মানসরাজ্যের বহির্দ্দেশে, অর্থাৎ ভগবানে বদ্ধমূল। এস্থলেও সেণ্ট্ আগষ্টাইনের সহিত সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলমের সাদৃশ্য দেখা যাইতেছে রস্কেলিনের (Roscelin) বিরুদ্ধে পারমার্থিক ঐক্যের সমর্থন,—রস্কেলিন বস্তুতন্ত্রের (realisim) বিরোধী ছিলেন, অথচ পরফিরী প্রচারিত ত্রিমূর্ত্তিবাদের (doctrine of trinity) মূলে

তিনি পৃথক পৃথক তিনটি দেবতার কল্পনা (tritheism) করায় তদ্দ্বারা এক ভ্রান্ত মতের উৎপত্তি হইতেছিল বুঝিতে পারিয়া, ইহাও বলিতে বাধ্য হন যে, তিনটি দেবতা (God the Father, God the Son and God the Holy Ghost) পরস্পর পৃথক বটে কিন্তু তাঁহারা একই ইচ্ছাপ্রণোদিত এবং একটিমাত্র মহাশক্তি পরিচালিত। রস্তেলিনের এই ধারণা হইতে খৃষ্ট সমাজে একটু গোলযোগের সূত্রপাত হয়। সেণ্ট অ্যান্‌সেলম্ দৃঢ়তার সহিত প্রতিপাদন করেন যে, ত্রিমূর্ত্তি সংক্রান্ত বিশ্বাস কেবল কল্পনার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, বরং উহা বিশুদ্ধ জ্ঞান সম্ভূত এবং ঈশ্বরের অসীমত্বেই তাঁহার ঐক্য (unity) সূচিত হয়। এই মত হইতে সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্‌কে একজন গোঁড়া বাস্তববাদী মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি গোঁড়া বাস্তববাদী ছিলেন না। অন্ততঃ তিনি বাস্তববাদের (realism) এমন কোন ব্যাখ্যাই করেন নাই যে, তদ্দ্বারা সর্ব্বদেবত্ববাদের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তাঁহার "থিওডিসী" গ্রন্থ ভ্রান্ত বলিয়া পরিত্যক্ত হইতে পারে। মোটের উপর, তাঁহার (Monologium) গ্রন্থের সহিত "গ্রাম্যাটিকো" গ্রন্থের বড় মিল ছিল না। শেষোক্ত গ্রন্থে তিনি জাতিবাচক শব্দ (the universals) সমূহ দ্বারা কোন বাস্তব সত্তা প্রকটিত হয় না বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। কেন না, জাতিবাচক শব্দ সকল ভাষারই রূপান্তর মাত্র।

মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান,—মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলম্ কোন বিশেষ গ্রন্থ রচনা না করিলেও কয়েকটি মূল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং মনোবৃত্তির মধ্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, মনোজ সংস্কারগুলির মূলে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য লক্ষিত হয়। মনোবৃত্তি তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথা (১) স্মৃতি, (২) বুদ্ধি ও (৩) প্রেম (love)। আত্মা স্বয়ংই আত্মজ্ঞানে সমর্থ, ইহার জন্য অপর কোন বস্তুর মধ্যবর্ত্তিতা আবশ্যক নাই। ঈশ্বরে তিনি যে এক অসীম পারদর্শিতার আরোপ করিয়াছেন, তাহা বুঝা কঠিন। যদিও তিনি পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক দিগের ন্যায় মানবের দ্বিবিধ প্রকৃতির বিষয় অবগত ছিলেন না, তবু মানব প্রকৃতিতে যে জড় ও বুদ্ধির ক্রিয়া যুগপৎ লক্ষিত হয়, তাহা বুঝিতেন। আত্মার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই।

সেণ্ট্ অ্যান্‌সেলামের নীতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় মত প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক। আদি পাপ জীবমাত্রেই সংক্রামিত হইয়াছে। ইহা ঈশ্বরাজ্ঞা লঙ্ঘনের ফল। ঈশ্বর স্বয়ং মঙ্গলস্বরূপ হইয়াও পাপকে ক্ষমা করিতে পারেন না, পাপের মার্জ্জনা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব; কেন না, ইহাতে তাঁহার মহত্ত্বের (majesty) হানি হয়। তবে কি পাপ হইতে জীবের ত্রাণ নাই? অবশ্যই আছে। এই ত্রাণের নিমিত্তই ঈশ্বরকে অবতার হইতে হইয়াছিল। ঈশ্বরের নিকট পাপের মার্জ্জনা নাই, তবে তিনি পাপীকে মার্জ্জনা করেন কেন? ইহার উত্তর এই যে, পাপ সর্ব্বসাধারণে জীবমাত্রেই সংক্রমিত বলিয়া ব্যক্তিবিশেষকে দণ্ড দিলে, তদ্দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধ হয় না। সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস ভিন্ন অথবা অনন্ত নরক-যন্ত্রণা ভিন্ন, পাপীর উপযুক্ত সাজা নাই। কিন্তু জীবের সুখের নিমিত্তই যে সৃষ্টি, অনন্ত সুখই যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই জন্যই, উভয় দিক রক্ষার নিমিত্ত, ঈশ্বরকে অবতার-(incarnation) রূপ উপায় উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীদিগ্বিজয় রায় চৌধুরী।

বাসনা।

আমি চাই ফুল্ল ফুলটির মত
পবিত্র সুরভি হ'তে
আমি চাই শুধু আপনা ভুলিয়া
সুবাস বিলায়ে দিতে,
চাই—নিভৃতে ফুটিয়া সাধনা সাধিয়া
নীরবে ঝরিয়া যেতে,
কুমুদের মত প্রতিদান ভুলে
প্রেমে আত্মহারা হ'তে।
তটিনীর মত স্বাতন্ত্র্য ভুলিয়া
অনন্তে মিশিতে চাই,
নীল নভোস্থলে ধ্রুবতারা মত
স্থিরলক্ষ্য হয়ে রই।
জোছনার মত স্নিগ্ধ নির্ম্মল
সমুজ্জ্বল হ'তে সাধ ;
ভুলে যেতে চাই জগতের তুচ্ছ
অভিমান বিসম্বাদ।
জুড়াইতে চাই তপ্ত ধরাবক্ষ
সলিলের শৈত্য লয়ে,
অন্যের মালিন্য ধুয়ে দিতে সাধ
নিজ অশ্রুধারা দিয়ে।
আকাশের মত প্রশস্ত প্রশান্ত
যেন এ হৃদয় হয় ;
সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম, তিতিক্ষা, বিশ্বাসে
যেন সদা উজ্জ্বলয়।
তোমারি কাজেতে, ওহে জগদীশ,
আপনা সঁপিতে চাই,
(আমি) আর সব ভুলি, শুধু তুমি নাথ
বিরাজ এ হৃদি ঠাঁই।

শ্রীপুণ্যপ্রভা ঘোষ।

চকচকে আন্দোলন।

দেশে জয়ধ্বনি উঠিয়াছে—"জয় গান্ধী মহারাজের জয়।" যাঁহার নামে এই জয়ধ্বনি, তিনি ত্যাগী, সাধু, কর্ম্মনিষ্ঠ ও স্বদেশ-প্রেমিক। তাঁহার উদ্দেশ্য দেশের দুর্গতি মোচন। কাজেই তাঁহার অকপট আহ্বানে দেশের লোক উৎকর্ণ হইয়াছে, ও অনেকে তাঁহার অনুবর্ত্তি হইয়াছে। মানুষেরা যখন একজনের সাধুতা দেখিয়া মুগ্ধ হয় ও সাধু-পুরুষের প্রচারিত কর্ম্ম করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়, তখন ভাবের উত্তেজনার ও শ্রদ্ধার আধিক্যে আপনাদের বিচার শক্তি হারাইয়া ফেলে; যেখানে ভাবের চমক আছে, সেখানে নিজের মনের মোহকেই অনেকে সুবুদ্ধির প্রেরণা মনে করে। সাধু হইলেই যে মানুষ সুবুদ্ধি অথবা সুবিচারক হইবেন, এমন কিছু ধরা বাঁধা কথা নাই। কিন্তু সাধুতার আকর্ষণে অনেক লোকই সে কথা বুঝিতে পারে না।

মকরসংক্রান্তির দিন শুনিলাম যে, নয় মাসের মধ্যেই আমরা সকলে স্বরাজই পাইব। সে পদার্থটা কি, তাহা ভাল করিয়া কেহ কাহাকেও বুঝায় নাই, কিন্তু তবুও কালিদাসের অভিশপ্ত যক্ষের মত আশায় বুক বাঁধিয়াছি যে আগামী কার্ত্তিকী একাদশীর দিন আমরা শাপ-মুক্ত হইব। আমরা নাকি যে-যেমন

'স্নিগ্ধছায়া তরু,' তলায় আছি, সেইরূপ থাকিলেই চলিবে; কেবল বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা আপনাদের পাঠশালা ছাড়িয়া এই নয় মাস ধরিয়া যদি হিন্দি পড়ে ও চর্‌কা কাটে, তাহা হইলেই আমরা হাতে হাতে স্বরাজ পাইব। এত তাড়াতাড়ি ও এত সহজ উপায়ে ভারতবর্ষ তাহার অজানা সাধনার ধন পাইবে, এ কথায় অনেকের চমক লাগিয়াছে। চলিত কথায় বলে—সবুরে মেওয়া ফলে; তবে আমরা যখন 'বিলম্ব' বুঝাইতেও চলিতকথায় 'ছ'মাস—ন' মাস' বলিয়া থাকি, তখন মেওয়া ফলার তাড়াতাড়ি হইবে বলিতে পারি না। সিদ্ধিলাভের উপায় সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, কলেজের ছাত্রেরা, ন্যায়-শাস্ত্রের সরু সূতা না কাটিয়া, চর্‌কা ধরিলে, দেশের লোকের শারীরিক লজ্জা দূর না হইলেও, ভদ্রলোকের ছেলেরা শ্রমজীবীর কাজকে লজ্জাজনক মনে করিবে না; কাঠের চর্‌কায় যাহাই ফলুক, অনেকে হয়ত নিজের চর্‌কায় তেল দিতে শিখিবে।

এখনও কিন্তু গোড়ার কথাটার বিচার হয় নাই; স্বরাজ পদার্থটা কি, তাহা ভাবিয়া দেখি নাই। কথাটার অর্থ হয়ত এই, যে ইংরেজেরা তাহাদের চাটি-বাটি তুলিয়া জাহাজে উঠিবে, আর গোটা ভারতবর্ষের শাসন ও রক্ষার ভার এ দেশের লোকের হাতে পড়িবে। প্রথম সমস্যা এই যে ইংরেজেরা, বিনা জোর জুলমে, তাঁহাদের ব্যবসা বাণিজ্য, কল-কার্‌খানা, রেল-টেলিগ্রাফ ও এক-ছত্র প্রভুতা ফেলিয়া যাইবেন কেন? চর্‌কার ঘেনর ঘেনর শুনিয়া যে দিক্‌ হইয়া পালাইবেন, তাহার সম্ভাবনা অল্প; কারণ, আমাদের কংগ্রেসের অনেক বক্তৃতা শুনিয়াও উহারা পালান নাই। তবে আশার কথা এই যে, সুরেন্দ্র নাথ যখন তাঁহার চিরজীবনের সাধনার ফল পাইয়াছেন, তখন ফল না পাইবার কথা না উঠিতেও পারে। ধরিয়া লইলাম, ইংরেজ পালাইবেন; কিন্তু যদি অন্য কোনও বিদেশী আমাদের টুঁটি কাটিতে আসে, তখন কি করিব? তখন কি আবার দেশের বাঙ্গারাম সর্দ্দারেরা উপবাস করিয়া ও চর্‌কা ধরিয়া শত্রু তাড়াইবেন? আমরা না হয় আগামী আশ্বিনে চর্‌কা-বাহন-স্বরাজ ঠাকুরের পূজা করিব, ও কার্ত্তিকী একাদশীর উপবাসের পারণার দিনে মুক্তি-ফল পাইবার আশায় থাকিব। কিন্তু, আমাদের অগ্রহায়ণের পাকাধানে কেহ মই দিতে আসিলে, কি দিয়া আটকাইব?

ইহার উত্তরে হয়ত কেহ কেহ আমাদের কানে কানে বলিয়া যাইতে পারেন, যে নয় মাসে ভারত উদ্ধারের কথাটা ঠিক অক্ষরে অক্ষরে মিলিবে বলিয়া প্রচারিত হয় নাই; ঐ আশার কথা প্রচারের উদ্দেশ্য এই যে, দেশের লোক (বিশেষ কলেজের ছাত্রেরা) এই চমক্‌দার কথা শুনিয়া চট্‌ করিয়া, কোমর বাঁধিয়া, কাজে লাগিবে। সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, দেশের উন্নতির জন্য সকল শ্রেণীর লোককেই খুব উৎসাহে আদা জল খাইয়া কাজে লাগা চাই; তবে যাহাতে স্থায়ী উৎসাহ বাড়ে, যাহাতে বুঝিয়া সুঝিয়া আশায় উদ্দীপ্ত হওয়া যায়, সেই সত্য জিনিষটাকে আনিয়া সম্মুখে না ধরিলে, কু-ফল ফলিতে পারে। ঠিক কার্ত্তিকী একাদশীর উপবাসের পর যদি আস্ত স্বরাজ দেখা না দেয়, যদি সেদিনকার অবস্থাকেই গোঁজামিল দিয়া খাঁটি স্বরাজের গোঁড়া বলিয়া বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে প্রচারক মহাত্মার গোঁয়ার চেলার দল একেবারে চটিয়া যাইতে পারে,

এবং অন্য কোন চিত্ত-রঞ্জন কথায় না ভুলিতেও পারে। একবার বেলুনে ঘোড়া উড়িবার বিজ্ঞাপন দেখিয়া বহুলোক টাকা খরচ করিয়া দর্শক হইয়াছিল। কিন্তু, যখন দেখিল যে বেলুনে কাঠের ঘোড়া বাঁধা, তখন দর্শকেরা বেলুনওয়ালাকে মারিতে ধাইয়াছিল।

আসল কথা না বুঝাইয়া ভবিষ্যৎ-বাণী করিলে, ভবিষ্যৎ-বক্তাকে বুজরুক সাজিতে হয়, ও চেলার দলকে অন্ধ-ভক্ত করিতে হয়। এদেশ গুরুগিরি ও বুজরুকিতেই ডুবিয়াছে, দেশের লোক না বুঝিয়া সুঝিয়া শাস্ত্র, গুরু ও আচার মানিয়া তাহাদের হাড়ে-মাসে গোলামি-বুদ্ধি পাকাইয়া তুলিয়াছে। যাহাতে গোলামি বুদ্ধি বেশি করিয়া পাকে, তাহা কি স্বাধীনতা লাভের অনুকূল? আমরা সকলেই দেখিয়াছি, কলেজের যে সকল ছেলেরা আড়ির দলে জুটিয়াছে, তাহারা অপরের স্বাধীন মত ও স্বাধীন ইচ্ছা উপেক্ষা করিয়াছে, ও জোর না করিবার নামে, বেজায় জুলুম করিয়া অপরকে ইচ্ছানুরূপ পথে চলিতে দেয় নাই। অপরের স্বাধীন বুদ্ধিকে যাহারা সম্মান করিতে জানে না, তাহারা যে নিজেরা গোলামিতে ডুবিয়া অপরকে গোলামির আবর্ত্তে ফেলে, ইহাও কি তর্ক করিয়া বুঝাইতে হইবে? গান্ধি মহারাজের মন বিশুদ্ধ আছে বলিয়াই মনে করি। কিন্তু, অনেক চেলারা যে তাহাকে খাঁটি দেবতা বা নূতন অবতার করিয়া তুলিতেছে, তাহা অনেক জনরবে শুনিতে পাই। যে প্রথায় কাজ চলিতেছে, তাহাতে বাস্তবিকই নেতাকে অবতার খাড়া না করিলে, উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেওয়া চলে না। তাহা হইলেই দাঁড়াইল এই যে, গোলামি-বুদ্ধি না পাকাইলে ও গোলামিতে না ডুবিলে, স্বরাজ বা স্বাধীনতা মিলিবে না। এযে বিরোধী-কথায় জোড়া বিষম হেঁয়ালি!

আড়ির দলের নেতাদের মনের ভাব হয়ত এই যে, স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের জন্য সময়ের অপেক্ষা করিলে চলিবে না—একেবারে দেশ শুদ্ধ লোক প্রস্তুত হইয়া একটা নির্দিষ্ট দিনে উহা লাভের জন্য অপেক্ষা করা চলিবে না। যদি এইটি তাঁহাদের মনের ভাব হয়, তবে কেহই তাঁহাদের মতের বিরুদ্ধে কথা কহিতে পারেন না। আমি আড়ির দলের কার্য্য-প্রণালীর বিরোধী, কিন্তু যাহা তাঁহাদের মত বলিয়া আন্দাজে ধরিয়া লইয়াছি, তাহা সমর্থন করি। এ বিষয়ে দু-চারিটী কথা বলিলে আমার মনের ভাবও স্পষ্ট হইবে, আর উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য যাহা করা উচিৎ, তাহাও বুঝিবার সুবিধা হইবে।

প্রতি মানুষের জীবনের গতিই স্বাধীনতার দিকে। শিশু আপনার পায়ে দাঁড়াইতে চায়, ও সকল বাধা এড়াইয়া নিজের ক্ষমতায় চলিতে চায়; চলিতে শিখিবার পথ অবাধ না হইলে, কোন শিশুই মানুষ হইতে পারে না। জৈবিক ক্ষমতার হিসাবে শিশুতে শিশুতে প্রভেদ থাকিতে পারে,—কিন্তু সকলেরই বাড়িয়া উঠিবার সুবিধাটা অবাধ হওয়া চাই। সুবিধার স্বাধীনতার নামই যথার্থ স্বাধীনতা। রেলগাড়ী চলিতেছে, আর উপযুক্ত টাকা দিলেই যে কেহ যে কোন শ্রেণীর যাত্রী হইতে পারেন, যদি কেহ টাকা দিয়াও টিকিট কিনিতে না পায়, অথবা শ্রেণী-বিশেষের টিকিট কিনিয়াও, সে শ্রেণীর গাড়িতে উঠিতে না পায়, তবে রেলের সুবিধা হইতে সে বঞ্চিত হয়। যদি রাজ্য শাসনে এমন ব্যবস্থা থাকে যে, অমুক লোক অমুক প্রদেশের বলিয়াই, সে সৈন্য-বিভাগে হউক অথবা অন্য

কোন বিভাগে হউক ঢুকিতে পারিবে না, তবে স্বাধীনতার পথে সে লোকের পূর্ণ বাধা। সামাজিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা; জ্ঞান-লাভে হউক, পদমর্য্যাদা-লাভে হউক, যদি সমাজের কোন শ্রেণীর কোন লোক আপনার পথে পা বাড়াইতে বাধা পায়, তবে সে সমাজ দাসত্ব-দোষে দুষ্ট। শাসন তন্ত্রে হউক, বা সমাজ-তন্ত্রে হউক, যদি আমরা দেখিতে পাই যে একটা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর বা দলের লোক কর্ত্তাগিরি চালাইয়া বলিতেছে, অপর শ্রেণীর লোকেরা উপযুক্ত নয়, অথবা উপযোগী কি না, তাহার বিচার তাহাদের হাতে, তাহা হইলেই শাসন-তন্ত্র ও সমাজ-তন্ত্র গোলাম গড়িবার কারখানা হইয়া দাঁড়ায়,—মানুষের মুক্তির পথে বাধা হইয়া দাঁড়ায়। খাঁটি স্বরাজ সেইখানে, যেখানে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে তাহার উন্নতির পথ মুক্ত। যেখানে মানুষ আপনার অধিকার-লাভের জন্য অন্যের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, সেখানে, অনুগ্রহ-দত্ত অধিকার যত বড় হইলেও, মানুষের স্বাধীনতা নাই! যদি একটা দীর্ঘ তালিকায় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া যায় যে, দেশের লোকে অমুক অমুক বড় বড় অধিকার পাইবে, তাহা হইলে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের পথ প্রস্তুত হয় না; বরং উহাতে দেশের গোলামী স্বীকৃত হয়। শাসন-তন্ত্রে ও সমাজ-তন্ত্রে যদি মানুষের কোন অধিকার-লাভের পথ খোলা থাকে, আর যত বড় হইলেও কোন অধিকার বিশেষের নাম একটা বাছাই করা তালিকায় নির্দ্দিষ্ট না থাকে, তবে মানুষের স্বাধীনতা আছে বলিতে পারি। এই স্বাধীনতা লাভের জন্য কোন সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না, অর্থাৎ সকল সময়েই ঐ সুবিধা অবাধ থাকা চাই; যে যেমন উপযুক্ত, সে সেইরূপ ভাবেই অবাধ পথে চলিতে পারে। কাজেই, মানুষ যে উপযুক্ত হইলেই অধিকার পাইবে, এই কথাটাই উঠিতে পারে না। দেশের লোকে যদি নিজে আপনাদের দেশ রক্ষা করিতে না পারে, তবে দেশটাও আমাদের হাতে সঁপিয়া দিলে স্বাধীন হইব না। যদি কার্ত্তিকী একাদশীর পর জার্ম্মানী বা রুশিয়া জলপথে বা আকাশ পথে আসিয়া ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলে, তবে রাসপূর্ণিমার দিনে আমাদের সকল নাচন শেষ হইবে।

আর একটী কথা,—সেইটাই বড় কথা। স্বাধীনতা-লাভের একেবারে গোঁড়ার কথা হইল এই যে, মানুষের আত্ম-সম্মানের জ্ঞান বাড়িবে ও স্বাধীনতা লাভের জন্য যথার্থ আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে,—যাহা কিছু স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা, তাহা এড়াইবার জন্য প্রতিজ্ঞা জন্মিবে। যদি সামাজিক বিধানের ফলে আমরা দাসত্ব করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকি, যদি শিক্ষায় ও কর্ম্মে পরের পা-চাটার প্রবৃত্তি সংস্কার-বদ্ধ হইয়া থাকে, তবে যতদিন সেই বিধান ভাঙ্গিবার জন্য উৎসাহ না জন্মিবে, ততদিন স্বাধীনতাকে প্রিয় পদার্থ বলিয়াই মনে হইবে না। এ সম্পর্কে আড়ির দলের লোকেরা বলিয়া থাকেন যে, আগে স্বরাজ হাতে আসা চাই, ও তাহার পরে সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার করা সম্ভব হইবে। স্বাধীনতা-লাভের পথে যাহা বাধা, তাহার গায়ে রাজনৈতিক ছাপ দাগা আছে, না সামাজিক বিধানের ছাপ আছে, সে কথা কি বিচার্য্য? বাধাগুলির শ্রেণী ভাগ করিয়া যাহারা 'আগু-পিছুর' কথা তুলেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির প্রশংসা করা কঠিন। অগ্র-পশ্চাতের জ্ঞান না থাকিলে, মানুষকে যখন মূর্খ বলে—

তাহা আহাম্মক বলে,—তখন সে বিষয়ে একটু বিচার করা উচিৎ। দুঃখ-নিবৃত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন দার্শনিক মতগুলিকে পাকা বলিয়া মনে করি না বটে, কিন্তু দুঃখ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে বুদ্ধের একটী বচন খুব যুক্তিযুক্ত মনে করি, বুদ্ধ বলিয়াছেন। যাহা নাশ করিতে হইবে, আগে তাহার মূল খুঁজিয়া বাহির করা চাই। আমাদের গোলামি-বুদ্ধির শিকড় কোথায়, তাহা যদি খুঁজিয়া না দেখি, আর যদি সেই শিকড় তুলিবার কোন উদ্যোগ না করি, তবে স্বাধীনতা-লাভের হুজুগে যতই ডাল-পালা কাটি না কেন, বদ্ধমূল শিকড় আবার গজাইবে।

যেখানে একজাতের লোক অন্য জাতের পা-চাটাকে পরমার্থ মনে করে, ও মনুষ্যত্ব জাগাইয়া পরের সমকক্ষ হইতে চায় না, নীচ হইয়া থাকাই জন্ম-কর্ম্মের প্রাকৃতিক ফল মনে করে, তাহারা দাসত্ব-ব্যাধি-গ্রস্ত। এই জন্যই নির্ব্বিবাদে দেশের লোকেরা বহুশতাব্দী ধরিয়া দাসত্ব ভোগ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। 'ধর্ম্ম গেল' বলিয়া কখনও কখনও একএকবার মাথা নাড়া দিয়াছে, কিন্তু দেশের প্রীতিতে ও আত্ম-সম্মানের জন্য মাথা তুলে নাই। আত্ম-সম্মানের জন্য ও স্বদেশ-প্রীতির তাড়নায় যে যোট বাঁধিতে হইবে, এ কথা সকলেই ইউরোপীয় শিক্ষায় পাইয়াছি; ইয়ুরোপীয়দের কাছে এবারকার মহাসমরের সময়ে slave mentality কথাটা পাইয়াছি; সেই জন্যই তোতা-পাখির মত ঐ কথাগুলি আওড়াইতেছি। কিন্তু আমাদের গোলামি-বুদ্ধির শিকড় যে কোথায়, তাহা খুঁজিয়া দেখিতেছি না। সেদিন ভবানীপুরের যুবকদের একটী সম্মিলনীতে শ্রীমান্ গোকুলচন্দ্র নাগ নামে একটী বালক তাহার প্রবন্ধে বর্ত্তমান সময়ের আন্দোলনের সমালোচনা করিয়া লিখিয়াছিল,—যদি একটী পাখি তাহার খাঁচায় বাস করা সুখকর মনে করে ও পায়ের শিকলকে স্বাধীনতার বাধা না ভাবে, তবে, তাহার পক্ষে, মুক্ত-আকাশে উড়িবার আকাঙ্ক্ষা ও ছটফটি অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এদেশের বালকেরা যে সকলেই মোহে পড়িয়া বুদ্ধি হারায় নাই, আলেয়ার আলোকে ধ্রুব-তারা ভাবে নাই, সেই আশার কথা জানাইবার জন্যই এই দৃষ্টান্তটির উল্লেখ করিলাম। ব্যাধিগ্রস্তের যে খাদ্যে অরুচি হয়, সেত ব্যাধির ফলে। ব্যাধি সারাইবার দিকে দৃষ্টি না করিয়া যাঁহারা পোলাও খাওয়াইয়া অরুচি ভাঙ্গিতে চাহেন, ও অরুচি ভাঙ্গিবার পর, ঔষধ দিতে চাহেন, তাঁহাদের 'অগ্রপশ্চাৎ-জ্ঞান' কি বড়ই প্রখর?

যে মুহূর্ত্তে মানুষের মনে আত্ম-সম্মানের বোধ জন্মিবে, যে মুহূর্ত্তে স্বাধীনতার যাহা কিছু বাধা তাহা এড়াইবার ইচ্ছা জন্মিবে, যে মুহূর্ত্তে আমাদের পুরাতন ব্যাধিকে আমরা ব্যাধি বলিয়া চিনিতে পারিব, ও ঐ ব্যাধি ধ্বংস করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা জন্মিবে ও উদ্যোগ বাড়িবে, সেই শুভ-মুহূর্ত্তেই প্রতি মানুষের মনে স্বরাজ্যের গোড়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমাদের লক্ষ্য কি ও বাধা কি তাহা যেদিন ঠিক ভাবে ধরিয়া ফেলিতে পারিব, যেদিন হুজুগ ছাড়িয়া উৎসাহিত মনে অথচ ধীরভাবে কর্ত্তব্যপথের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব, সেই দিনই স্বরাজ আসিবে। আর উহার জন্য কার্ত্তিকী একাদশী পর্য্যন্তও অপেক্ষা করিতে হইবে না।

আমাদের সাধারণ শ্রেণীর লোকেরা না

জাগিলে যে দেশ জাগিবে না, তাহা ত সর্ব্বত্রই স্বীকৃত। উহারা যে আমাদের সামাজিক অবস্থার ফলে ভারতবর্ষকে আপনাদের দেশ বলিয়া চিনিতে পারিতেছে না। কতকগুলি সামাজিক শিক্ষা-জনিত-সংস্কার একেবারে ধ্বংস না হইলে যে দেশের সাধারণ লোকেরা আমাদের সঙ্গে যুটিবার দিকে মন ফিরাইতে পারিবে না, সে কথা অন্য সময়ে বিচার করিতে চেষ্টা করিব। এবারকার মত এইটুকু বলিয়াই কথা শেষ করিতেছি যে, চরকা কাটা ভাল কথাই বটে, তবে আমাদের ব্যাধির খাঁটি নিদান বুঝিবার জন্য নিজেদের বুদ্ধির চরকায় একটু তেল দিলে ভাল হয়। যে সময়ে আমাদের বল-সঞ্চয়ের দরকার, যে সময়ে অতর্কিতভাবে ধীরে ধীরে বল বাড়াইবার দরকার, সে সময়ে অযথা বিদ্বেষ-বুদ্ধি জাগাইয়া ক্ষুদ্রবলকে পিশিয়া মারিবার জন্য একটা বৃহৎ বলকে প্রতিদ্বন্দ্বী করিয়া তোলা সুবিচারের কাজ নয়। আড়ির দলের কেহ কেহ হয়ত একথায় চোখ টিপিয়া বলিতে পারেন যে, বাহিরের একটু টেপা-টিপিতেই অথবা অত্যাচারেই তাঁহারা কর্ম্মপথে চলিবার উত্তেজনা পাইবেন। যদি এইরূপ উত্তর পাই, তাহা হইলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের যাহা উত্তেজনা ও উৎসাহের স্থায়ী-মূল বা উৎস, তাহা আমরা ধরিতে পারি নাই। আর সেই জন্যই কৃত্রিম উপায়ে উত্তেজনা খুঁজিতেছি। যাঁহারা সামাজিক দুর্দ্দশার চিন্তা চাপা দিয়া, উল্টা পদ্ধতিতে কাজ করিতে চাহিতেছেন, তাঁহাদের যদি একবার অগ্র পশ্চাতের জ্ঞান জন্মে, তবে দেখিতে পাইবেন, যে বাহিরের অত্যাচার না খুঁজিয়াই তাঁহাদের মনের মধ্যে উত্তেজনা ও উৎসাহের স্থায়ী উৎস পাইবেন। জাতি সাধারণের মধ্যে যদি অল্প পরিমাণেও আত্মসম্মানের বোধ জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে যে সমাজ-বিপ্লব ঘটিবে, তাহা হইতেই স্বাধীনতা-লাভের জন্য স্থায়ী-উৎসাহ ও বল জাগিয়া উঠিবে। গল্প আছে— একজন তাহার নিজের কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রাণের টান জন্মাইতে না পারিয়া বাহিরে উত্তেজনা খুঁজিতেছিল, ও তাহাকে উত্তেজনা দিবার জন্য তাহার এক বন্ধু রাস্তার এক দুষ্ট ছেলেকে দিয়া পিছন হইতে তাহার কানমলার ব্যবস্থা করিয়াছিল; লোকটী তাহাতে উত্তেজিত হইল বটে, কিন্তু কাজ হইল না। এ সম্পর্কে আর একটী কথা বলি; যদি ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানেরা কোন অত্যাচার না করিয়া ন্যায়-শাসন চালাইতে থাকেন, তাহা হইলে দ্বৈত-বনবাসীরা কি করিবেন? দেশের উত্তেজিত লোকদিগকে বলি তাহারা যেন আপনা-দের উদ্দীপ্ত আগুনে আপনারাই পুড়িয়া মরিবার ব্যবস্থা না করেন। নানা কারণে, এ সময়ের আন্দোলন বেশ চক্‌চকে হইয়াছে বটে। কিন্তু যাহা কিছু চক্‌চকে তাহাই সোণা নয়। একবার ভাবিয়া দেখিবেন, ইহা সম্ভবপর না হইলেও হইতে পারে যে,—

চর্‌কা বাহন স্বরাজ ঠাকুর, ঢেকুর তুলে উপোসে,
চোৎ ক'রে ঠিক কর্বে কাৎ দুর্দ্দশাটার কুপো সে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সপ্তম অধ্যায়—যুধিষ্ঠিরের যৌবরাজ্যে অভিষেক।

যুধিষ্ঠির যৌবনে পড়িয়া অতুল রূপবান ও বলবান হইয়াছেন। বিশুদ্ধ স্বর্ণের ন্যায় তাঁহার শরীরের বর্ণ। চক্ষু তাম্রবর্ণ ও আকর্ণলম্বিত। উন্নত নাসিকা। সিংহের ন্যায় শরীর; যে দেখিতেছে, সেই মোহিত হইতেছে। তিনি স্থির ও ধীর, সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়। সকলেই তাঁহাকে অতি গৌরবে "ধর্ম্মরাজ" বলিয়া ডাকিতেছে। ভীমের বর্ণও তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়। বিশাল বক্ষ, বৃষস্কন্ধ। বাহুযুগল স্থূল ও দীর্ঘ। অর্জ্জুন সুশ্যামল, কমল-লোচন ও সিংহ-স্কন্ধ। তাঁহার সুপ্রশস্ত বক্ষস্থল। নকুলের শ্যাম কলেবর, রক্ত চক্ষু, মহাভুজ। সহজে অলৌকিক রূপলাবণ্য সম্পন্ন। সকল ভ্রাতাই পরস্পরে অত্যন্ত অনুরক্ত। প্রত্যেকেই অগ্রজের আজ্ঞাকারী। প্রজাগণ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মাচরণে, ভীমের ধৈর্য্যে ও অর্জ্জুনের স্বভাব-মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইল। পঞ্চ-পাণ্ডব প্রজাগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন।

তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি রাজা ধৃতরাষ্ট্র চরমুখে সকলই জানিতে পারিলেন। ভাবিলেন, এ রাজ্য পাণ্ডুর, এখন সকলে তাঁহার পুত্রকে রাজা করিলে উপায় কি? তাহাপেক্ষা তিনিই এখন যুধিষ্ঠিরকে যুবরাজ করিবেন; আসন্ন বিপদ নিবারণ করিবেন। পরে, সময় পাইলে সাবধান হওয়া যাইবে। এইরূপ ভাবিয়া অন্ধরাজ যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। প্রচার করিলেন তাঁহার পরে যুধিষ্ঠিরই হস্তিনার রাজা হইবেন।

ইহাতে কি দুর্য্যোধন সন্তুষ্ট হইলেন? তাহা কি সম্ভব? যুধিষ্ঠিরের যে সকল সদ্‌গুণ দুর্য্যোধনের তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত অসদ্‌গুণ। তিনি চঞ্চল, উদ্ধত, শাসনের বহির্ভূত; হিংসা-পরায়ণ, পরশ্রীকাতর, অতি অভিমানী ও পাপাত্মা। তিনি পিতার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন, পাণ্ডবগণের ঘোর শত্রু হইলেন।

সকলেই বুঝিলেন, মহাঝটিকার সূচনা হইতেছে। কিন্তু উপায় নাই দেখিয়া সকলেই নীরব রহিলেন। এক দিন ধৃতরাষ্ট্র সভা করিয়া বসিয়াছেন। দুর্য্যোধনাদি সকলেই আছেন। এমন সময় দ্রোণাচার্য্য অর্জ্জুনকে বলিলেন—"আমি যে তোমাকে এত শিখাইয়াছি, তাহার গুরু দক্ষিণা দাও।" অর্জ্জুন উত্তর করিলেন—"কি দিব বলুন।" আচার্য্য বলিলেন, "রণস্থলে আমি তোমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তুমি আমার সহিত তুল্য ভাবে প্রতি-যুদ্ধ করিবে, এই গুরুদক্ষিণা চাহি।"* অর্জ্জুন অগত্যা সম্মত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্র ভাবিলেন, ইহার তাৎপর্য্য কি? দুর্য্যোধন ভাবিলেন, তাহাতে কি? কর্ণ ত আমার পক্ষে আছেন।

ভীষ্ম, বিদুর, সঞ্জয় প্রভৃতি সজ্জনেরা দ্রোণাচার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দূরদর্শীর কথায় কুজন কবে কুপ্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে?

---

* আদিপর্ব্ব, ১৩৯—১৪।

অষ্টম অধ্যায়।

কণিকের উপদেশ।

অন্ধরাজ আদেশ দিলেন, আর পাণ্ডবগণ নানা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া, নানা দেশ জয় করিয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তার করিলেন। অপরের রাজ্য হইতে বহু ধনরত্ন আনিয়া তাঁহার রাজকোষ পূর্ণ করিলেন। তাহাতে কি ধৃতরাষ্ট্র সন্তুষ্ট হইলেন? যখন তিনি দেখিলেন কোন যুদ্ধেই পাণ্ডবগণ পরাজিত হইল না, কোন পাণ্ডবই নিহত হইল না, পরন্তু তাঁহারা শৌর্য্য-বীর্য্যে দৃপ্ত হইয়া উঠিল, সকলেরই প্রশংসা-ভাজন হইল, তখন তিনি চিন্তায় আকুল হইলেন, নিদ্রা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, পাণ্ডবগণকে যুদ্ধে নিযুক্ত করিয়া ভাল করি নাই।

শেষে তিনি মন্ত্রীবর কণিককে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিলেন, বলিলেন,—"দ্বিজোত্তম, পাণ্ডবগণ দিন দিন বর্দ্ধিত হওয়ায়, ঈর্ষান্বিত হইয়াছি। ইহাদের সহিত এখন সন্ধি করা কর্ত্তব্য, কি যুদ্ধ করা উচিত, পরামর্শ দিন। আমি তদনুসারে কার্য্য করিব" *।

মন্ত্রীবর উত্তর করিলেন,—"রাজন্, আমার মত প্রকাশ করিতেছি, কিন্তু আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। আপনি সতত শত্রুর গৃহে ছিদ্র অন্বেষণ করিবেন, কখনও নিজ গৃহে ছিদ্র হইতে দিবেন না। দিলে আপনিই অগ্রে দুর্ব্বল হইবেন। যে কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহা সুসম্পন্ন না করিয়া কদাচ পরিত্যাগ করিবেন না। শত্রু প্রবল হইয়াছে বুঝিলে, তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবেন। শেষে সুসময় ও সুবিধা পাইলে, তাহাকে প্রস্তরে নিক্ষেপ করিয়া নিহত করিবেন। সময় বিশেষে, আপনি অন্ধ ও বধিরের ন্যায় অবস্থিতি করিবেন। শত্রুগণের দোষ দেখিয়াও দেখিবেন না, শুনিয়াও শুনিবেন না। কিন্তু মহারণ্যে মৃগের ন্যায় সতত সতর্ক থাকিবেন। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও, উপেক্ষার বিষয় নহে। আবার শত্রুকে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে দেখিয়াও যিনি উপেক্ষা করেন, তিনি দিন দিন বর্দ্ধিত ব্যাধির ন্যায়, তদ্দারাই বিনষ্ট হন। শত্রুকে সতত আশা দিয়া ঘুরাইবেন। আশাপূর্ণ করিলে অঙ্গীকৃত সময় উপস্থিত হইলে, একটি অলীক প্রতিবন্ধকের উল্লেখ করিয়া আবার আশা দিবেন। আপনি ক্রুদ্ধ হইলেও, তাহা গোপন করিয়া রাখিবেন। প্রহার করিবার সময়েও প্রিয়বাক্য বলিবেন। দুর্ব্বল বা তুল্যবান শত্রুর নিকট বিক্রম দেখাইয়া, বলবানের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া, কাপুরুষকে ভয় দেখাইয়া, লোভীকে লোভ দিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই রাজনীতি দ্বারা পরিচালিত হইবেন। যে কার্য্যই করিবেন, তাহার মর্ম্ম, শত্রু কি মিত্র কেহই যেন পূর্ব্বে জানিতে না পারে। পাণ্ডবেরা দুর্য্যোধনাদি অপেক্ষা অধিক বলবান্ হইয়াছেন। শেষে যাহাতে শোকগ্রস্ত হইতে না হয়, তাহাই করুন।"

নবম অধ্যায়।

জতুগৃহ দাহ।

মন্ত্রীবর পরামর্শ দিয়া প্রস্থান করিলেন। আর রাজা ধৃতরাষ্ট্র গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। চরেরা তাঁহাকে বলিয়াছে,—"প্রজারা বলাবলি করিতেছে, ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ, সেইজন্য

* আদিপর্ব্ব, ১৩৯—২৭।১৪০—৩।

তিনি পূর্ব্বে রাজ্য পান নাই, এখন কিরূপে পাইবেন? যুধিষ্ঠিরই পাণ্ডুর রাজ্যের অধিকারী। আমরা তাঁহাকেই রাজা করিব' (১)। পূর্ব্বে রাজা করিবার অধিকার প্রজাগণেরই ছিল। দুর্য্যোধনও উহা শুনিয়াছেন, তিনি দুঃশাসন, শকুনি প্রভৃতির সহিত পরামর্শ স্থির করিলেন। পরে, জনকের নির্জ্জন-গৃহে উপস্থিত হইয়া মনের ভাব প্রকাশ করিলেন, পাণ্ডব ও কুন্তীদেবীকে বারণাবত নগরে পাঠাইতে অনুরোধ করিলেন। অন্ধরাজ উত্তর করিলেন,—"বৎস, তুমি যাহা ভাবিতেছ, আমিও তাহাই ভাবিতেছি। তবে তাহা পাপজনক বলিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেছি না" (২)।

সভায় সকলে একত্রিত হইয়াছেন। অন্ধরাজ যুধিষ্ঠির মধুর বচনে বলিলেন,—"বৎস, বারণাবত অতি রমণীয় নগরী। তথায় পশুপৎ উৎসব হইতেছে। তোমরা জননীকে লইয়া তথায় গমন কর" (৩)।

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "আপনি আমাদের পিতৃতুল্য। আপনি যাহা বলিবেন, আমরা তাহাই করিব।"

পঞ্চ-পাণ্ডব সকলের নিকট বিদায় লইয়া বারণাবত চলিয়াছেন। বিদুর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেছেন। পরে ম্লেচ্ছভাষায় যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—"লৌহ নহে, অথচ শরীর নাশ করে, এমন বিষয় ও তাহার প্রতিকারের উপায় যিনি জানেন, শত্রুরা তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। যাহা তৃণ কাষ্ঠাদি বিনাশে সমর্থ, তাহা বিবরস্থিত ব্যক্তির অনিষ্ট করিতে অসমর্থ। যিনি চক্ষু মেলিয়া চলেন, তিনিই পথ ও দিক্ দেখিতে পান। ভ্রমণ করিলে পথ জানা যায়। নক্ষত্র দেখিলে দিক্ জানা যায়। ধৈর্য্যহীন ব্যক্তি কখনও বড় হইতে পারে না।" যুধিষ্ঠির সেই ভাষায় উত্তর করিলেন,—"বুঝিয়াছি।" তখন বিদুর সকলের নিকট বিদায় লইয়া, বিষণ্ন মনে প্রস্থান করিলেন। (৪)

এখন কুন্তীদেবী যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বিদুর কি বলিলেন?" পুত্র উত্তর করিলেন,—"তিনি আমাকে সতর্ক করিলেন। বলিলেন,—গর্ত্তে থাকিলে অগ্নি অনিষ্ট করিতে পারে না। চারিদিকে ভ্রমণ করিলে পথ ঘাট জানা যায়।"

অন্ধরাজ পূর্ব্বেই তাহার মন্ত্রী পুরোচনকে বারণাবতে পাঠাইয়াছেন। তিনি পাণ্ডবগণকে মহাসমাদরে গ্রহণ করিলেন। এক সুন্দর গৃহে লইয়া গেলেন এবং বহু উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি ও আহার্য্যাদি প্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও নগরাধ্যক্ষ, সকলের গৃহে গমন করিয়া সকলকে আপ্যায়িত করিলেন। এদিকে, পুরোচন অন্ধরাজের আদেশানুসারে এক বৃহৎ গৃহ প্রস্তুত করিলেন। দশদিবস পরেই পাণ্ডবগণকে তথায় স্থানান্তরিত করিলেন। যুধিষ্ঠির সেই গৃহ পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে তাহা লাক্ষা, ধুনা, শণ, তৃণ, চর্ব্বি, ঘৃত প্রভৃতি দাহ্য বস্তু দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে।

---

(১) আদিপর্ব্ব, ১৪১—২৩।২৭।

(২) আদিপর্ব্ব, ১৪২—১৩।

(৩) বর্ত্তমান এলাহাবাদের নিকট বারণাবত নগরী ছিল বলিয়া অনুমান হয়। R. C. Dutt's History of Civilization in Ancient India, I—125.

(৪) পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই ম্লেচ্ছ ভাষা গ্রীক ভাষা।

তিনি সে কথা ভীমকে বলিলেন। ভীম বলিলেন,—"তাহা হইলে আমাদিগের এখানে বাস করা উচিত নয়।" তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির বলিলেন,—"দুর্য্যোধন দুরাত্মা, পদস্থ, সহায় সম্পন্ন ও ঐশ্বর্য্যবান। আমরা দীনহীন, সহায়-বিহীন। আমরা এখান হইতে পলায়ন করিলেও সে অনুচর দ্বারা আমাদিগকে নিহত করিতে পারিবে। আমাদের পক্ষে সতত সাবধান হইয়া বাস করা অসম্ভব।" তখন সেই গৃহে থাকাই স্থির হইল। পাণ্ডবেরা দিবসে মৃগয়া করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আর সাবধানে সেই গৃহে রজনী কাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে একবৎসর অতীত হইল।

একদিন এক ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরের নিকট নির্জ্জনে আসিয়া বলিল,—"মহাত্মা বিদুর আমাকে পাঠাইয়াছেন। তিনি ম্লেচ্ছ ভাষায় আপনাকে সাবধান করিয়াছিলেন। তাহাতেই বুঝিবেন, আমি তাঁহারই লোক। আমি খনক। তিনি বলিয়াছেন,—'ইহা জতুগৃহ। পুরোচন আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ইহাতে অগ্নি দিবে। সে দিনের আর বেশী বিলম্ব নাই।"

পাণ্ডবগণের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিবার অভিপ্রায়ে সেই গৃহের এক কক্ষে পুরোচন বাস করেন। অন্য কক্ষের মধ্যে খনক বসিয়া নিঃশব্দে সুরঙ্গ প্রস্তুত করিতে লাগিল। পরে এক রাত্রিতে কুন্তীদেবী বহু ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেন। আহারান্তে সকলে গৃহে গমন করিল। ক্রমে রজনী গভীর হইল, রাজপথ জনশূন্য হইল। প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। এমন সময়, সেই জতুগৃহ অকস্মাৎ অগ্নিময় হইয়া উঠিল। তখনই বারণাবতের নরনারী সকলেই দৌড়াইয়া আসিল। সকলেই প্রাণপণে অগ্নি নিবারণে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সাধ্য কি? দেখিতে দেখিতে সেই গৃহ ভস্মে পরিণত হইল। বারণাবতের সকলেই পাণ্ডবগণের জন্য হাহাকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। প্রভাত হইবামাত্র তাহারা পাণ্ডবগণের শরীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। ক্রমে সেই ভস্মরাশির মধ্য হইতে পাঁচটী পুরুষ ও একটী স্ত্রীলোকের দগ্ধদেহ বাহির হইল। পুরোচনেরও মৃত দেহ প্রাপ্ত হওয়া গেল। সেই দিনই সে সংবাদ হস্তিনায় প্রেরিত হইল। পঞ্চ-পাণ্ডব ও কুন্তীদেবীর মৃত দেহ বাহির হইয়াছে জানিয়া, ধৃতরাষ্ট্র সভায় বসিয়া পুত্রগণ-সহ হাহাকার করিয়া রোদন করিলেন। শেষে তাঁহাদের প্রেত-কার্য্যও যথাবিধি নির্ব্বাহ করিলেন। (৫) এখন পিতাপুত্রে আনন্দ করিতে লাগিলেন,—"আমরা নিরাপদ!" "আমরা নিরাপদ!" শকুনি বলিলেন,—"আমি যাহার কর্ণধার, সে কবে বিপদাপন্ন!" সকলেই ভুলিলেন এ বিশ্বের নিয়ন্তা আছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

(৫) আদিপর্ব্ব, ১৪০—১৩।১৪৭।১৪১—১৭।১৩।

সঙ্গণিকা।

নব্যভারতে প্রবন্ধ বিশেষে আলোচিত যে কোন প্রশ্নের যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে অপর-পক্ষ বিচার করিয়া সন্দর্ভ প্রেরণ করেন, সাগ্রহে পত্রস্থ করা হইবে।

* * *

বিদ্যালয় বর্জ্জন। সহযোগিতা-বর্জ্জনের ফলে, ছাত্রেরা স্কুল কলেজ 'বয়কট' করিতেছে। জাতীয়-শিক্ষা সমস্যার জটিলতা অদ্যাপিও সমাধান হয় নাই। সে শিক্ষার কি প্রকার ব্যবস্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহার আদর্শ কিরূপ হওয়া সমীচীন, কি উপায়ে তাহা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতে পারে,—এ সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত ও নিষ্পত্তি সুদূর-পরাহত। 'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।'

* * *

বয়কটে ছাত্রদের ব্যবহার। বর্ত্তমানে ছাত্রবর্গের মধ্যে যে প্রকার সম্ভাবনা-পূর্ণ-আশা-প্রদ উৎসাহ, উদ্দীপনা, সরলতা, সততা, নির্ভীকতা এবং প্রগাঢ় স্বদেশ-প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমরা কি পর্য্যন্ত যে আনন্দিত, ভাষায় প্রকাশ করা সুকঠিন। কিন্তু বিদ্যালয় বর্জ্জন ব্যাপারে, তাহাদের নামে, যে সকল ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা সেই সকল ব্যবহার কোন মতেই অনুমোদন না করিতে পারিয়া দুঃখিত আছি। ভরসা করি, সে ঘটনা সকল কেবল ক্ষণিক উত্তেজনা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফল। সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, আত্মপ্রতিষ্ঠানে সকলেরই সমান অধিকার আছে। ব্যক্তিগত মতকে প্রচার করা অথবা যাহাতে সেই মতটী সাধারণে বরণ করিয়া লয়, সে বিষয় কায়মনোবাক্যে তৎপর হওয়া সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা পাওয়া,—আত্মপ্রতিষ্ঠারই অঙ্গবিশেষ ও উচিত কার্য্য। তাহাতে বাধা দিলে চলিবে না। তাই বলিয়া কিন্তু, অপর পক্ষেরও যে ব্যক্তিগত একটা মত থাকিতে পারে, তাহা বিস্মৃত হওয়াও দোষনীয় হইবে। অপর পক্ষের সেই মতের গৌরব মানিয়া লইতে হইবে, তাহার মর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। কোন প্রকার অবৈধ শক্তি প্রয়োগে অপর পক্ষের সেই স্বাধীন চিন্তা, স্বতন্ত্র মত ও পৃথক আদর্শকে বিকশিত হইবার পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইলে এবং সেই মতের অনুবর্ত্তী কাজে বাধা দিলে, অনধিকার চর্চ্চা হয়,—ইহা বে-আদবী, ইহা নীতি-বিরুদ্ধ সংগ্রাম।

* * *

মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ অ-'সার'-জ্ঞানে যাহা ত্যাগ করিয়া হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন, সুরেন্দ্রনাথ সেই 'সার' গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম মন্ত্রীপদে বরিত হইয়াছেন। শক্তি ও ক্ষমতা লাভ করিয়া যে তাহার সৎ-ব্যবহার করিতে পারে না, তাহাকে লোকে 'বোকা' বলে। সুরেন্দ্র নাথের অগাধ বুদ্ধিমত্তায় আমাদের কোন দিন সন্দেহ ছিল না, আজও নাই। সেইহেতু, তিনি যে, সুযোগ বুঝিয়া, তাঁহার বেতন বাৎসরিক ৬৪০০০৲ টাকায় ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে আমরা তাঁহার কার্য্য কে 'সাবাস' 'সাবাস' করিতে বাধ্য। উষ্ণ রক্তাধিক্যের দিনে তিনি বিগত ত্রিশ বৎসরের উর্দ্ধকাল ধরিয়া শাসন-ব্যয় সংক্ষেপ করিবার প্রয়াসী ছিলেন এবং সময়ে অসময়ে লেখনী চালাইয়া ছিলেন, উচ্চকণ্ঠে

বক্তৃতা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা আমাদের অবিদিত নয়। কিন্তু, প্রসিদ্ধ মার্কিন-কবি লংফেলোর উপদেশ—'গত-অতীতকে তাহার মৃতের সমাধি করিতে দাও" (Let the dead past bury its dead) তা বটেই তো; তা' নিয়ে ঘাটিয়ে কাজ কি? 'শষ্যাঙ্ক গৃহমাগত' চিরন্তন নীতি। মাননীয় মহোদয়ের শুভবুদ্ধির পরাকাষ্ঠায় এই নীতির প্রয়োগেই—বেতন প্রাপ্তির পর, বৎসরে ১২০০০৲ টাকা খয়রাতিতে দান। অলমতি বিস্তরেণ।

* * *

তণ্ডুলের রপ্তানি। বাঙ্গালীর 'চাল' না হ'লে চলেই না। ক্ষুধার তৃপ্তি—চাল; বিশ্রামের আশ্রয়—চাল; আর, খেয়ে না খেয়ে চাল-টাকে বজায় রাখিতে ব্যস্ত থাকিতে হয়। আমার হেসেলে চাল 'বাড়ন্ত' বলিয়া অরন্ধন, আর সাত সমুদ্র তের নদীর পারে ষোড়শোপচার মদ মজ্জার আয়োজন; মোটেই কাজের কথা নয়। 'চাচা, আপনা বাঁচা'; আগে, ভাঁড়ারে খাবার চালের সালিয়ানা খরচমত সঞ্চয় হোক্, তার পরে রপ্তানির কথা. সমগ্র ভারত হইতে, স্থানীয় প্রয়োজনমত তণ্ডুল রক্ষা না করিয়া রপ্তানি হইতে পারিবে না, এই প্রস্তাবটা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইলে, আমলাবর্গ তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইয়া ছিলেন এবং প্রস্তাবটী গৃহীত হইয়াছে জানিতে পারিয়া আমাদের ধড়ে প্রাণ আসিয়াছিল। বিশেষ ভাবে, বাঙ্গলার চালের অন্তর্প্রাদেশিক রপ্তানি বন্ধ করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু সফল হয় নাই। 'নেই-মামা থেকে, কাণা মামাও ভাল"।

* * *

চিকিৎসকের ব্যবস্থা। দরিদ্রের খাঁটি বন্ধুর কাজ করিয়াছেন, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ। পাকা লোকের পাকা কাজ। বাঙ্গলার প্রতি থানায় তিনজন করিয়া ডাক্তার মোতায়েম করিবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি সমগ্র বাঙ্গলার আজ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের সাশ্রয় কল্পে, স্বীয় ব্যবসার্থে বসিলে, প্রতি থানায় তিনজন করিয়া চিকিৎসক মাসিক ত্রিশ টাকা করিয়া ভাতা পাইবেন, তাহার অর্দ্ধেক দিবেন রাজকোষ, অপরার্দ্ধ দিবেন বোর্ড; চিকিৎসকের প্রথম আপত্তি দূর হইল; মোটা ভাতের জন্য আর ভাবিতে হইবে না। যোগেন বাবুর এই প্রস্তাব, মন্ত্রী ও তদীয় সাঙ্গপাঙ্গ সদস্য গণের বিকট প্রতিবাদ সত্ত্বেও, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় অনুমোদিত হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে মন্ত্রীবর্গের ইজ্জতের যে হানি, সহযোগিতা-বর্জ্জন-দলের সেই অনুপাতে বল-সঞ্চার। তাহার নিদর্শন কথঞ্চিত পাওয়া গিয়াছে সেদিন, 'মহারাজাধিরাজের' রাজধানীতে, প্রথম মন্ত্রীর সমাগমে। 'হোল কি এ হোল কি, এ যে বড় আশ্চর্য্যি'!

* * *

শ্রমজীবী ও ধর্ম্মঘট। ভাগ্যিস্ এটা শীত-কাল, কোনক্রমে তাই কাল কাটিতেছে! এখন শুধু চাকুরী রাখিতে প্রাণান্ত হইতেছে; এটা গর্ম্মিকাল হইলে, 'প্রাণ রাখিতে প্রাণান্ত' হইতে হইত, সুনিশ্চয়। ঠিকা বা বাড়ীর হাওয়া গাড়ীর চালকেরা কোটালের কটু ব্যবহারে 'বাপ্, বাপ্' ডাক ছাড়িয়া কর্ম্মে ইস্তফা দিতে বাধ্য হইয়াছিল। ঘটনাচক্রে, তাহাদের দুঃখ কিছুটা বিদূরিত হওয়ায়, তাহারা আবার কাজে ফিরিয়াছে। তাহারাও যেই ফিরিল, কলিকাতার ট্রাম গাড়ীর চালক-

গণ কর্ম্মত্যাগ করিল, ভাত কাপড়ে তাহাদের অচল হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া। হাওয়া গাড়ী চালকদের ধর্ম্মঘটে, কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল, ধনী লোকদের, বিশেষতঃ সাহেবদের। ট্রাম-গাড়ী বন্ধ হওয়াতে অসুবিধায় পড়িয়াছেন, নিরন্ন কেরাণীবৃন্দ; সত্য সত্যই যাহাদের প্রাণ রাখিতে নিত্য প্রায় প্রাণান্ত হইতে হয়। এই দুই ধর্ম্মঘটের উৎপত্তি প্রসার, স্থিতি ও অবসানের সম্ভাবনা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের আলোচনার উপযুক্ত বিষয় না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সমজদার লোকের বিবেচ্য বিষয় বটে। 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম'। বিংশ শতাব্দীতে শক্তি কিসে এবং কাহার? যাঁহাদের শক্তি অঙ্গরাগ-গত বা করায়ত্ত বা ব্যাঙ্কপোষিত, তাঁহাদের মুহূর্ত্তের কুঞ্চিত-ভ্রূক্ষেপে এক ধর্ম্মঘট অনতিবিলম্বেই সিদ্ধির সিন্দুর লাভ করিয়া পরিসমাপ্ত হইল। আর অপরটী শক্তির অভাবে মুহ্যমান, আজও গড়াইতেছে,—গুলি পর্য্যন্ত খাইতেছে! দীন মসীজীবিদের কাতরক্রন্দন, শত অস্বস্তি অসুবিধা কে বা শোনে, তোয়াক্কা রাখেই বা কয়জন? 'আয়া সমজ কে বীচ মে'?

* * *

শৈল-বাস। 'সবুরে মেওয়া ফলে', সন্দেহ নাই। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া গভর্ণমেণ্টের নিদাঘে শৈল-বাসের বিরুদ্ধে নিষ্ফল তীব্র প্রতিবাদ চলিয়া আসিতেছে। আমলা ও মন্ত্রীবর্গ প্রকাশ করিলেন, কেবল প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা এবং তাঁহার প্রয়োজন মত আহুত অস্থায়ী ভাবে তদীয় আমলাগণের মধ্যে কেহ কেহ ব্যতীত কার্য্যালয় প্রভৃতি কিছুই দারজিলিংএ যাইবে না। এই অভিমত প্রকাশ করা সত্বেও, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক মহাশয় তাঁহার প্রস্তাবটী প্রত্যাখ্যান করেন নাই এবং ব্যবস্থাপক সভা তাহা গ্রহণ করিয়াছেন। এই স্থলে কিন্তু এই প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করা বা না করা, আমলাতন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাই বলিতে হয়,—'কাকস্য পরিবেদনা।'

* * *

বাঙ্গালায় নূতন শাসন নীতি। মিণ্টো-মর্লি শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইলে তিন জন সন্ন্যাসী পাওয়া গিয়াছিল, তাহারাই শাসন-গাজন-কার্য্য সমাধা করিতেন; বিশেষ কোন অসুবিধার কথা শোনা যায় নাই; কোন অনুষ্ঠানের ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় নাই। খরচ ছিল, বাৎসরিক (১,৯২০০০৲ টাকা) প্রায় দুই লক্ষ টাকা। শাসন কার্য্য একই প্রায় রহিয়াছে, কিন্তু নূতন শাসন প্রণালী প্রবর্ত্তনে সন্ন্যাসী জুটিয়াছেন, সাতজন ও খরচের প্রসার সাত সমুদ্রের মত অপার-রূপ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে (৪,৪৮০০০৲ টাকা) প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা। ইহার সহিত যোগ করিতে হইবে, মাননীয় সভাপতি ও সহযোগী সভাপতির বেতন, মন্ত্রীদের সম্পাদক ও নিম্নতর কর্ম্মচারীবর্গের বেতন, আনুসঙ্গিক অপরাপর খরচ! নূতন শাসন প্রণালীর সমপক্ষ-দলের মধ্যে যাঁহারা এতাবৎ কাল, আমলাতন্ত্রের শাসন-পদ্ধতির ব্যয়-বাহুল্যের বিষয়ে আপত্তি করিয়া আসিতে-ছিলেন, তাঁহাদের বিবেচনার বিষয়। নূতন প্রণালীতে সন্ন্যাসী জুটিয়াছেন তো অনেক, এখন শাসন-গাজন কার্য্য কিরূপ চলে, সং-শয়ের বিষয়। দেখা যাক্ কি হয়;—চৈত্র সংক্রান্তির বেশী দেরী নাই;—বজেট-'চড়ক' আগত-প্রায়। সে পর্য্যন্ত আমরাও এ বিষয়ে 'চুপ দিলাম'।

মহাত্মা গান্ধী। বিশেষ পরিতাপের বিষয়, মহাত্মাজীর সূচিত সহযোগিতা-বর্জ্জন-মন্ত্র বরণ করিয়া লইয়া আমরা সম্পূর্ণ জীবন গত করিতে পারিলাম না। ইহাতে মহাত্মাজীর অথবা তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যধারা বা প্রণালীর কোন দোষ দেওয়া যায় না। তাহাতে আমাদেরই অক্ষমতা, সৎসাহসের অভাব, কার্য্যকারিতার ভনিতা, এবং সর্ব্বোপরি, লাভালাভ গণনা-স্পৃহা প্রকটিত হয়। সে যাহাই হোক, মহাত্মাজীর প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে দুইটীকে শ্লাঘা না করিলে, কৃতঘ্ন হইতে হয়। প্রথমটী,—হিন্দু মুসলমানে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠা। ভারতবর্ষকে(Dictyledon দ্বিভাগ যুক্ত বীজের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। যেমন মুগ মুসুরি ছোলা, আম জাম কাঁঠাল, প্রভৃতি বীজের দুইটী ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং পক্ষদ্বয় স্বরূপ এই বীজে শাঁসের মধ্যে বীজের প্রাণ, বীজের অঙ্কুর, বীজের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিহিত থাকে ও সংরক্ষিত হয়; তেমনি ভারতের প্রাণ, ভারতের অঙ্কুর, ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ও আশা, দুই বীজ শাঁসের ন্যায়, হিন্দু এবং মুসলমান এই দুইয়ের মধ্যে নিহিত আছে। বীজের এই পক্ষদ্বয়ের একটীকেও বিনষ্ট করিলে, বীজের সমূহ প্রাণ বিনষ্ট হয়; তেমনি, হিন্দু মুসলমানের যে কোন একটীর অবনতিতেই ভারতের প্রাণ-হানির সম্ভাবনা। দুইটীকেই একত্রে মিলিয়া, পাশাপাশি এক আবরণে যুক্ত হইয়া, তাহাদের দুইয়ের মধ্যে স্থাপিত প্রাণ, অঙ্কুর, সম্ভাবনাটীকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে। এই নীতি স্বতঃসিদ্ধ, অতি পুরাতন, ও সনাতন। এপর্য্যন্ত কিন্তু, ক্ষণিক স্থানীয় সফলতা ভিন্ন, এই মিলন সার্ব্বজনীন ভাব ধারণ করে নাই। আজ যাহা করিয়াছে, তাহা কেবল মহাত্মা গান্ধীর প্রসাদে। যে অমোঘ শক্তি এই জীবনপ্রদ প্রাণময় অনুষ্ঠানকে সফলতা দান করিয়াছে, আমরা সেই অভূতপূর্ব্ব অজানা চিন্ময় শক্তিকে বরণ করি ও ভক্তিভরে তাহার নিকটে প্রণত হই। দ্বিতীয়টী, ধনী দরিদ্র সকলের সম্মত ও স্বীকৃত পানদোষ নিবারণ। এ বিষয়ে যে সিদ্ধিলাভ হইয়াছে, তাহা অভাবনীয়, সে অসাধ্য-সাধন কেবল মহাত্মা গান্ধীরই সাধ্য। বিধাতার কৃপায়, এই অনুষ্ঠান নিত্য হোক, সত্য হোক, ধন্য হোক, এই প্রার্থনা। এই সিদ্ধির ফল যে কতদূর ব্যাপক, দেশের দরিদ্র নারায়ণের, দীন শ্রমজীবি ও ঘৃণিত নিন্দিত, সমাজ-বিতাড়িত কারামুক্ত অভাগাগণের সেবাতে যে জীবন উৎসর্গ করিয়া নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, সে ভিন্ন অপরে কতদূর প্রকৃতরূপে ধারণা করিতে পারিবে, বলা যায় না। মহাত্মা গান্ধীর যদি সমস্ত কার্য্য ইহাতেই পর্য্যবসিত হইত, আর কিছুতেই তিনি যদি হস্তক্ষেপ না করিতেন, তাহা হইলেও আমরা তারস্বরে বলিতাম,—"মহাত্মা গান্ধী মহারাজ কী জয়!"

* * *

সাধু সাবধান! হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা।

মানের 'আড়ি' না প্রাণের দায়?

"ঘানি টানা বলদের গলায় ঘণ্টা থাকে, ঘণ্টার আওয়াজ থামিয়া গেলেই বুঝা যায় যে টান থামিয়া গিয়াছে, এই জন্যই ঘণ্টা বাঁধা"—এই কথা শুনিয়া এক নৈয়ায়িক বলিয়াছিলেন, "গরুটা যদি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাথা নাড়ে?" শোনা যায় তাহাতে কলু উত্তর করিয়াছিল, "গরু ত আর ন্যায়শাস্ত্র পড়ে নাই?" বাস্তবিক সহজ জিনিষটা জটিল করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি পণ্ডিতেরই আছে,—জ্ঞান-বৃদ্ধ বিজয়চন্দ্রের 'আড়ি' প্রবন্ধ তাহার এক প্রমাণ। মানব যজ্ঞে আহুত হইয়া ছাগ এতদিন আভিজাত্য গৌরবে লাফাইতেছিল, এমন সময় এক নিদারুণ দৃশ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া সে হঠাৎ ধরিয়া ফেলিল যে সে যজ্ঞের উদ্‌যাপনের অর্থ তাহার নিজের আয়ুঃশেষ। তখন সে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া পালাইয়া নিজের গুহায় আশ্রয় লইল, এবং মানব-পক্ষ হইতে পুনরায় নিমন্ত্রণ, পত্র আসিয়া পৌছিলে-সে বলিল, "প্রাণ মান দুই-ই বজায় রাখিয়া যদি কোন দিন যাওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে এ নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইব, নতুবা নহে। আপাততঃ বিদায়।" পরম পণ্ডিত বিজয়চন্দ্র এই মারাত্মক সহযোগিতার প্রত্যাখ্যানের নাম দিয়াছেন "আড়ি", যেন কত অভিমানের ব্যাপার। অথচ প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রাণের দায় মাত্র।

এই সোজা কথাটা লেখকের মনে আসে নাই। না আসিবার প্রথম কারণ "আড়ির" প্রবর্ত্তকগণের উপর তাঁহার বিজাতীয় ক্রোধ। "যাহারা আমাদের মোড়ল সাজিয়াছেন" বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধের আরম্ভ। এ তীব্রতা কেন? যাহাকে গাঁয়ে মানে সেই মোড়ল, তা' সে নিজেই নিজেকে জাহির করুক বা অন্য কেহই তাহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করুক। লেখক ত জানেন যে গাঁয়ে তাহাদের দলকে মানিতেছে? হয়ত তাহা গ্রামের মূঢ়তা, এমন কি দুর্ভাগ্য,—হয়ত তাহারা বিজ্ঞতর নেতার নেতৃত্ব স্বীকার করিতে পারিত। কিন্তু সে সব নেতা যদি ঘরের কোণে বসিয়া কেবল নিজ নিজ নেতৃত্বের দাবীটুকু অনুভব করিতে থাকেন, তবে কে তাঁহাদিগকে সেই কোণ হইতে টানিয়া বাহির করিবে? বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। যাহারা কাজ করে, মানুষকে বিশ্বাস করে, ভ্রম সত্ত্বেও নিজেরা বাহির হইয়া দশের কাজে লাগিয়া যাইবার সাহস রাখে, তাহারাই দেশনায়ক। অহম্মন্য মোড়ল বলিয়া গালি দিলে তাহার ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না।

প্রবন্ধকারের রাগের দ্বিতীয় প্রমাণ, তাঁহার 'গান্ধী' নামটীর উপর পর্য্যন্ত বিরুদ্ধভাব। তিনি নাগপুর কংগ্রেসের মহাসম্মিলনকে 'মোড়লের গাঁধি' বলার লোভটুকু সম্বরণ করিতে পারেন নাই; এমন কি সে জন্য প্রবন্ধের ঐ অংশটীকে অসংলগ্ন করিয়া ফেলিতেও সংকোচ বোধ করেন নাই। নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা-ভঙ্গ প্রয়াস কি সুবুদ্ধির কার্য্য?

লেখকের অধীরতার এইরূপ বহু নিদর্শন ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীর মধ্যে বিদ্যমান। তিনি অস্বাভাবিক জোরের সহিত বলিয়া উঠিতেছেন—"এই মিথ্যাকথাটাও যদি স্বীকার

করিয়াই লওয়া যায়" "অতিবড় মূর্খেরা অসার দম্ভে যাহাই বলুক", ইত্যাদি। জ্যামিতি পাঠের সময় যখনই দেখিতাম গ্রন্থকার "must be" বলিয়া বয়ান দিতেছেন, তখনই বুঝিতাম একটা গোড়ায় গলদ্ আছে, এবং "if not" বলিয়া সে গলদের একটা মীমাংসা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রন্থকারকেই করিতে হইয়াছে। এখানে কিন্তু লেখক কেবল তাঁহার প্রচণ্ড তার বেগেই সমস্ত আপত্তিকে উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছেন, কোন প্রমাণ প্রয়োগের ধার ধারেন নাই। তাহাতে গোড়ায় গলদের সন্দেহটা বাড়াইয়াছে মাত্র। বাস্তবিক তিনি যে জিনিষটাকে "এই মিথ্যা" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার মত সত্য কথা খুব অল্পই আছে। এদেশের "জ্ঞানের মন্দির" গুলি যে ইংরাজের সুবিধার্থেই সৃষ্ট, ইহা কি মিথ্যা কথা? বিশ্ব বিদ্যালয়ের জন্মেতিহাস, উচ্চ শিক্ষার প্রসাররোধ, নিম্ন শিক্ষার অব্যাপকতা, এবং এই শেষ বিষয়ে ইংলণ্ডের সহিত ভারতীয় ব্যবস্থার পার্থক্য, এ সকলই সে কথার সত্যতার পরিচায়ক। "অতিবড় মূর্খেরা" বলিয়া প্রবন্ধকার উচ্চকণ্ঠে যাহা বলিয়াছেন তাহাও বিচার-সহ নহে। তাঁহার মতে, "প্রাচীন কালের জ্ঞান অতিবড় হইলেও, একালের জ্ঞানের তুলনায় ক্ষুদ্র।" সত্যই জ্ঞান বাড়িতেছে, না জ্ঞানপথের দুর্গমতা বাড়িতেছে? আগে যেখানে সহজভাবে হাঁটিয়া যাওয়া যাইত, এখন সেইখানে, peacockএর মত হইয়া, হাতে ভর দিয়া যাইতে হয়, কিন্তু তাহা বলিয়া রাস্তা অধিক চলা হয় না। চিত্তশুদ্ধি প্রসাদে তখন খালি চোখেই যাহা ধরা পড়িত, এখন ল্যাবরেটরীর সাহায্যে তাহাকে ধরিতে হয়। ইহাকে evolution বলিতে হয় বলিতে পার, কিন্তু তাহা ক্রমবিবর্ত্তন মাত্র, ক্রমোন্নতি নহে। বাস্তবিক, জ্ঞানের চরম লক্ষ্য যে সত্যলাভ, তাহা সেকালেও যতদূর অধিগত হইয়াছিল, একালেও তাহা অপেক্ষা অধিক আয়ত্ত হয় নাই। কেবল তাহার পথ, জীবন-যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে, জঞ্জালপূর্ণ হওয়ায় বিড়ম্বনা বাড়িয়াছে মাত্র। এখন—

> গ্রন্থ বলে আমি সব, যন্ত্র বলে আমি,
> পন্থা বলে আমি সব হাসে অন্তর্য্যামী।

নতুবা "রসো বৈ সঃ" প্রভৃতির বিনাযন্ত্রে আবিষ্কৃত বহু পুরাতন সত্যের সহিত আজ কালকার কোন্ বৈজ্ঞানিক সত্যের তুলনা হইতে পারে?

ধীরতাই আলোচনার প্রাণ; তাহার অভাবে প্রবন্ধ সারশূণ্য হইয়া পড়ে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে। লেখকের বক্তব্য স্থূলতঃ এই —

ইংরাজের শাসনযন্ত্রকে বিকল করিতে হইলে রেল, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফকে বিকল করিতে হয়, ঐ গুলিই ইংরাজ শাসনকে একচ্ছত্র করিয়া রাখিয়াছে। সেইখানেই যখন আমরা নিরুপায়, তখন জন কতক উকীল হাকিম ডাক্তার কেরাণীর কাজ ছাড়াইয়া লাভ কি? সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূঢ়তা এই ছাত্রদলকে ক্ষেপান। কলেজ যখন আমাদেরই টাকার, আর তাহাদ্বারা ইংরাজের যতই বলোপচয় হউক না কেন, আমাদেরও যখন উপকার হইতেছে, তখন তাহার উপর রাগ করিয়া লাভ নাই। বিশেষ সংস্কৃত সাহিত্য যত উন্নতই হউক না কেন, তাহা যখন ইংরাজী প্রভৃতি নবীন সাহিত্যের তুলনায় ক্ষুদ্র, তখন জ্ঞানের হিসাবেও ইংরাজীর উপযোগিতা অবশ্য স্বীকার্য্য। হয়ত আমরা নূতন এবং ভাল একরূপ কোন একটা কিছু একটা গড়িয়া তুলিবার জন্যই এই বর্ত্তমান শিক্ষাকে বর্জ্জন করিতেছি, কিন্তু সেই নূতনটা যখন আজিও কল্পনামাত্র, তখন তাহার অনুরোধে বর্ত্তমানকে ত্যাগ করা সঙ্গত নহে। আমাদের এক ধুয়া ইংরাজী শিক্ষায় গোলামী বুদ্ধি

বাড়িতেছে, কিন্তু বুদ্ধিটীর পাকাবীজ আমাদের স্বদেশ ও সমাজের ব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যবাদের মধ্যেই নিহিত আছে, তাহা যতদিন অক্ষুণ্ণ ততদিন কলেজ ছাড়িলে গোলামী বুদ্ধির অবসান হইবে না। বরং বর্জ্জন করিতে হয় ত কর কংগ্রেসকে, কারণ তাহাতে এক দলকে আপ্‌কে ওয়াস্তে এবং আর এক দলকে গোঁয়ার গোবিন্দে পরিণত করিতেছে, আর জিনিষটাও কিছু এদেশী নহে।

কংগ্রেস সম্বন্ধে লেখকের শেষ কথাগুলি পাদপূরণের "চ বৈ তু হি" বলিয়া ছাড়িয়া দিলেও, তাঁহাকে একবারে অব্যাহতি দেওয়া যায় না। ইউরোপীয় বিপ্লবতরঙ্গের বাহিরে সাগর গর্ভে বসিয়া সহস্রাধিক বৎসরের অভিজ্ঞতায় ইংরাজ যে সাম্রাজ্য-গঠন-বিদ্যালাভ করিয়াছে, তাহা এক তুড়িতে উড়াইয়া দেওয়া কাহারই সাধ্য নহে, এবং অ-সহযোগ-নীতির তাহা প্রধান লক্ষ্যও নহে। তাঁহারা বলেন, প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের সহযোগিতার ফল দুর্ব্বলের সর্ব্বনাশ। আমাদেরও তাহাই হইতেছে। আমরা পরের ভাবে ভাবিত হইয়া, নিজেদের আদর্শ ও স্বাধীনচিন্তা হারাইয়াছি। পরের সৃষ্ট অভাবকে নিজেদের প্রকৃত অভাব মনে করিয়া আমরা নিজেদের কর্ম্মপ্রচেষ্টাকে পর্য্যন্ত বিপথে চালিত করিতেছি। আমরা ভুলিয়া গিয়াছি যে, সে পথের সমস্ত চাবি যাঁহাদের হস্তে, তাঁহারা কৃপাপরবশ হইয়া বহু কষ্টার্জ্জিত সেই সমস্ত সুবিধা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবেন না। আর আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের দয়াবৃত্তিও খুব প্রবল নহে। সেদিন জালিয়ানওয়ালাবাগে ও পার্লিয়ামেণ্টে তৎসম্বন্ধীয় আলোচনায় কালা-জীবনের মূল্য পরিমাপ হইয়া গিয়াছে। অবাধ-বর্দ্ধিত ম্যালেরিয়া, নিরন্নতা প্রভৃতির সাহায্যে যে পরিমাণ কার্য্য বহুদিন হইতেই নিঃশব্দে চলিতেছিল, সেদিন সশব্দে তাহার ঘোষণা হইয়াছে মাত্র। সুতরাং, সেরূপ স্থলে ভিক্ষার প্রলোভন যতই থাকুক, প্রয়োজন কিছুই নাই। অন্ন স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য টাকা চাই। সে টাকার জন্য পুরুষানুক্রমে হাত পাতিয়া আমরা যে ছিটাফোঁটা পাইয়াছি, তাহাতে তৃষ্ণা মিটে নাই, জ্বালা বাড়িয়াছে মাত্র। এ অবস্থায় একবার নিজেদের চেষ্টা নিজেরা করিয়া দেখা উচিত। খরচের টাকাটা আমাদেরই বটে; কিন্তু যে টাকা বাহির করিতে আমরা বাধ্য ও যাহার নিয়োগ সম্বন্ধে অমারা কর্ত্তৃত্বশূন্য, তাহাকে নিজের বলি কি করিয়া? যে কন্যাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়া যায়, সে কন্যার পিতৃত্ব-স্বীকার কি পুরুষকার? সেখানে মারা চলে ও মরা চলে, ঘর করা চলে না। আমরা মরণের পথই ধরিতে চাই। কি স্বদেশবাসী কি বিদেশী, বিরুদ্ধবাদী কি বিরুদ্ধচারী, কাহারও সহিত আমাদের শত্রুতা নাই। আমরা কেবল এই ইচ্ছাকৃত মৃত্যুর দ্বারা পূর্ব্ব-সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাই। ভরসা, এই তুষানল শুদ্ধির পর, আমরা আপন তেজেই প্রদীপ্ত হইয়া উঠিব। কথায় কথায় প্রবলের দ্বারে গিয়া অনর্থক ধন্না দিয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে না। এই সুমহৎ কর্ত্তব্যের সম্পাদনার্থ যাহার যাহা কিছু পিছটান আছে, সমস্ত ঝাড়িয়া ফেলিয়া আমরা সকলে মুক্ত হইব, চাই কি সেজন্য বিদ্যাশিক্ষা পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিব। আমাদের এখন শ্রেষ্ঠ শিক্ষা দেশবাসীর সহিত আত্মীয়তা স্থাপন। প্রবলের আনুগত্য-মোহে আমরা এতদিন স্বদেশকে ও স্বজনকে ভুলিয়াছিলাম, এখন সব ছাড়িয়া সেই নষ্টপ্রায় মহাবস্তুটীর উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। আমরা নিতান্তই দুর্ব্বল, নিতান্তই নিরাশ্রয়; আমাদের ভরসা এক ভগবান্, আর আমরা নিজেরা!

ভগবানের প্রীত্যর্থ আমরা অধর্ম্ম পথ পরিত্যাগ করিব, পরস্পরের প্রীত্যর্থ আমরা পরস্পরের সেবা করিব।

ইহাই অ-সহযোগিতার মর্ম্মকথা। ইহা মতবাদ মাত্র নহে, কারণ ইহার সত্যতা ও শক্তি সেদিন মাত্র ইজিপ্টে পরীক্ষিত হইয়া গিয়াছে। ভারতের ন্যায় মহাদেশে এ নীতির কোন দিন পূর্ণ প্রবর্ত্তন হইবে কিনা সন্দেহ,—অসম্পূর্ণ প্রয়োগে নির্য্যাতনের ভয়ও যথেষ্ট আছে,—কিন্তু শেষফল সম্বন্ধে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ঝড়ে গাছকে ফেলিতে না পারিলে শক্ত করিয়াই রাখিয়া যায়,—নির্য্যাতনেও আমাদের শক্তিবৃদ্ধিই করিবে। গান্ধি মহারাজই যে কেবল খাড়া থাকিবেন তাহা নহে, এযুগে ছোট বড় অনেক গান্ধীই জন্ম পরিগ্রহ করিয়া জয়ডঙ্কা বাজাইবেন। পূর্ব্বে একবার বারীন্দ্র-যুগেও এইরূপ ছোট বড় অনেক বারীন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। তবে, দুই যুগে প্রভেদ অনেক। সেটা ছিল কৌশলের যুগ, আর এটা সত্যের যুগ। তাহাতে লুকাইবার ছিল অনেক, সুতরাং ধরাপড়িবার ভয় ছিলও যথেষ্ট। এখানে সবই খোলা, সুতরাং ধরা পড়িয়া মুহ্যমান হইবার ভয় নাই। সে যুগে বোমাকে সহায় করিয়া জগৎ বিজয়ী কূটনীতি-বিৎ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছিল,—এযুগে ভগবানকে সহায় করিয়া নিজেদের মধ্যে যাহা অসত্য প্রধানতঃ তাহারই বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। তখনকার উদ্দেশ্য ছিল, যে কোনরূপে স্বাধীনতা লাভ, এযুগের অব্যবহিত উদ্দেশ্য ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে চরিত্র লাভ। তাহার পর স্বরাজ ত আপনা হইতেই আসিবে। রেল টেলিগ্রাফ ডাকঘর ত অবান্তর কথা। এই চরিত্ররূপ মহা কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কংগ্রেস যে সাধনমার্গ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তাহাও বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য। তাঁহারা দেখিয়াছেন, অত্যুগ্রসাধনা চরিত্র লাভের পরিপন্থী,—তাহাতে কর্ম্মের উন্মাদনা থাকে এবং যোগ্যতা লাভের পূর্ব্বেই ফললাভ আসিয়া কর্ম্মীকে শিথিলপ্রযত্ন করিয়া দেয়। তাই, তাঁহারা দেশমাতৃকার প্রতি 'যথাসম্ভব' দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। উহা কেবল তাঁহাদের নিজেদের "হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিবার" কৌশল মাত্র নহে।

বাস্তবিক মানুষকে অল্পই করিতে হয়, মানুষ অল্পই করে। ঠিক ভাবে কার্য্যারম্ভ হইলে, সমস্ত কাজটা যেন আপনা হইতেই সমাপ্ত হইয়া যায়। ইহাই স্বভাবের নিয়ম। ভাগ্যক্রমে, দেশের মতিগতি যেন একটু ফিরিতেছে বলিয়া বোধহয়। কল্যাণকে ত আর চিনিতে বিলম্ব হয় না,—বিলম্ব হয় ধরিয়া রাখিতে। প্রধান বিঘ্ন হয়, মোয়ার লোভে ও জুজুর ভয়ে। সেরূপ উপদ্রব যে এক আধটুকু আসিবে না, তাহা সম্ভব নহে। দেশে চাকর বাকরের অভাব ঘটিবার সম্ভাবনা হইলেই ধনীরা চটিয়া উঠেন। ইহাও কতকটা সেইরূপ। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, দিন দুনিয়ার যিনি মালিক তাঁহার ইচ্ছায়, সত্য অমর এবং দীনহীনও জ্ঞানের অধিকারী। এ জ্ঞানের পথ কোনরূপ লোভ বা ভয় দেখাইয়া কেহ চিরদিনের মত রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। একদিকে মুটে মজুর, চটকল ও বেশ্যাপল্লী—অন্যদিকে চাকুরে বাবু, কলের পাখা ও কোম্পানির কাগজ। এই দুইদলের মধ্যে পড়িয়া জ্ঞান বেচারি এত দিন মারা পড়িতেছিল। সেদিন চলিয়া যাইতেছে। লোকে পুনরায় তপোমাহাত্ম্য শুনিবে ও শিখিবে, এবং বুঝিবে যে তত্ত্ব

বারির অপেক্ষাও বলবান অস্ত্র আছে। সত্যই, ক্রোধকে অক্রোধ দ্বারা জয় করা যায়। তখন আর ভারতীয় জনসাধারণকে কোনরূপ ভয় বা লোভ দেখাইয়া ঠেকাইয়া রাখা যাইবে না। রেল ও ডাকের বিরাট সরঞ্জামে জ্ঞান-সূর্য্যের গতিরোধ হইবে না। ইতিমধ্যেই সত্যের অভয়বাণী শ্রুত হইতেছে,—সকলেরই নিকট সে ডাক পৌঁছিয়াছে। হাকিম, উকিল, কেরাণী প্রভৃতি বহুদিনের দুর্ভাগ্য যাঁহাদের তাঁহারা সে আহ্বানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা জানিনা, আর না পারিলে ক্ষতিও নাই। কুলিমজুরের ভিতর হইতে সে ডাকের শ্রোতা আবিষ্কৃত হইবে। তাহাদের বুদ্ধি, দারিদ্র্যের পীড়নে মলিন হইলেও, কিছু কম বিকৃত। সাড়া তাহারাই প্রথমে দিবে এবং তাহাই দিতেছে। সাফল্যও কিছু কিছু দেখা যাইতেছে। কুলিমজুরেরা যে সাড়া দিতেছে তাহা নিঃসন্দেহ। হিন্দু মুসলমানের সৌহার্দ্দ্য এবং মদের দোকানের আপেক্ষিক নিস্তব্ধতাই তাহার প্রমাণ। তাহারা নিরক্ষর হউক, কিন্তু অশিক্ষাকে শিক্ষা বলিয়া গর্ব্ব করিতে শিখে নাই; টাকা কড়ির মত তুচ্ছ জিনিষকে দেবতার আসনে বসাইয়া তাহার দ্বারে আত্মবলিও দিতে শিখে নাই। একদিকে অভিমানহীন নিরক্ষরতা ও অপরদিকে মদোদ্ধত অতিবিদ্যা। এ উভয়ের মধ্যস্থলে আছে ছাত্রসমাজ, তাহারা সবে মাত্র উদর-দর্শনের পাঠ আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের অনেকের মধ্যে সদ্বৃত্তি ও সহৃদয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ ভাবে বর্ত্তমান। ছাত্রসমাজকে ক্ষেপান হইয়াছে বলিয়া বিজয়বাবু বিশেষ বিরক্ত, কিন্তু তাঁহার অভিযোগ কি ঠিক্? অ-সহযোগিতার দুন্দুভি-ধ্বনি একই মুহূর্ত্তে সকলের কাণে পৌঁছিয়াছিল। কুলি মজুরের দল তাহার অর্থ বোধ করিতে না পারিয়াও জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক বাদকের মর্য্যাদা রক্ষায় অগ্রসর হইয়াছিল। বাবুর দল একটু হাসিয়া অভ্যস্ত কার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আর বিপদে পড়িয়াছিল, এই ছাত্রের দল। অবস্থা "নযযৌ, ন তস্থৌ" এর মত। হৃদয়ে সদ্ভাব আছে এবং জিনিষটাকেও তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু ধরিবার সাহস নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুশিক্ষায় তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। দুরারোহ মঙ্গলবর্ত্মে আরোহণ করিবার শক্তি তাহাদের নাই। নিজেদের উপরও বিশ্বাস তাহাদের নাই—কি জানি শেষে বা কি বিপদ্ ঘটে, এই ভাবনাতেই তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। শেষে, শ্যাম ও কুল দুই-ই বজায় রাখিবার জন্য, জাতীয় ও বিজাতীয় উভয়বিধ বিদ্যাক্ষেত্রেই পরীক্ষার টাকা জমা দিল। এই ছাত্রদলের মধ্যে জন কতকমাত্র সত্যসত্যই গারদ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহারাই সাগর ছেঁচা মাণিক, ভারত মাতার সুসন্তান, অ-সহযোগ আন্দোলনের মূর্ত্তিমান্ সার্থকতা। এই আন্দোলন না থাকিলে তাহারা ঝাঁকে মিশিয়া গতানুগতিক পথে মহলা দিতে থাকিত। যীশুখ্রীষ্টের সারল্যময় জালিক শিষ্যগণের মত তাহারা ডাক শুনিয়াই বুঝিল ও চলিয়া আসিল। ভাবিল—"তাই ত বটে? কি করিতেছি? এ শিক্ষায় কি ফল? বিদ্যা?—তাহা ত মৌলিকতাশূন্য। ধর্ম্ম?—তাহার ত নামগন্ধও নাই; থাকিলে অন্ততঃ সারল্য, সাহস ও সহৃদয়তা থাকিত। ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্র হইতে নিজে পলাইয়া নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব হইত না। স্বাস্থ্য?—সে ত আভিধানিক শব্দ মাত্র; তাহার অভাবেই ত

আমাদিগকে রেলে ষ্টীমারে ও সর্ব্বত্র কিলচড় সহ্য করিয়া ক্ষমাবৃত্তির চর্চ্চা করিতে হইতেছে। অর্থ?—সে ত মাড়োয়ারি ও ইউরোপীয় বণিকের ঘরে? আমাদের যা আছে তা চাকুরি; তাহা ত দুই এক ক্ষেত্রে মাত্র সোণার শিকল, নতুবা লোহার? আর তাহা দ্বারা জীবিকার্জ্জনের অর্থ বিদেশী প্রতিষ্ঠিত ভারত লুণ্ঠন যন্ত্রের খোরাক যোগান? তা'র চেয়ে কেন মায়ের ছেলে মায়ের কোলে ছুটিয়া যাই না? যাহা পারি, যেরূপ পারি, তাঁহার সেবায় কেন আত্মোৎসর্গ করি না? কাজ করিতে করিতেই কাজ শিক্ষা হইবে, আর সেবাধর্ম্মই আমাকে কালে প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী করিয়া তুলিবে। অতএব আর চিন্তা কি? অন্তরে সাহস আছে, ঊর্দ্ধে ভগবান্।" এই বলিয়া তাহারা কর্ম্মসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়াছে। ভগবান্ তাহাদের সহায় হউন।

"মহাত্মারা" (এই কথাটার মধ্যে গান্ধী মহাশয়ের প্রতি কটাক্ষ বিদ্যমান) ঐসব ছেলেদের যে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে বিজয় বাবুর বড় রাগ। সংস্কৃতের উপর তাঁহারা কি অতিরিক্ত জোর দিয়াছেন, তাহা জানিনা; কিন্তু, আমাদের ভারতীয় ধাতুটা যে কি রকম, তাহা জানিবার আর কোন ভাল উপায় আছে কি? ইংরাজী পড়িতে হয় পড়, কিন্তু তাহাকে নিজেদের করিয়া লও; কোথায় তাহারা অন্যায় বা জাতীয় প্রকৃতির বিরুদ্ধ কথা বলিতেছে, তাহা বুঝা উচিত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে যদি আমরা বিদেশী মুখ নির্গলিত বাক্যমাত্রকেই উদরস্থ করিতে থাকি এবং যাহা কিছু এদেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কারের বিরোধী তাহাকেই ভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতে শিখি, তাহা হইলে ব্যাপারটা কি অতি অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায় না? Non-co-operation কথাটার মৌলিক অর্থ যাহাই হউক না, তাহার উদ্দেশ্য নিজেকে জানা ও সবল করা। ইহার জন্যই প্রয়োজন, সংস্কৃত সাহিত্য কিছু চর্চ্চা। ইউরোপেও সংস্কৃত চর্চ্চা হইতেছে। অনেকে বলেন এখান অপেক্ষা গভীর ভাবেই হইতেছে,—কিন্তু কই, সেখানে ত কেহই শিখাধারী পণ্ডিত সাজিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই? এদিকে আমরা ত বেশ হ্যাট্ কোট পরিয়া কালা সাহেব সাজিয়া বসিয়া আছি। এইটাই বিপদ্। কেহ বলিবেন—"হ্যাট কোট যদি সত্যসত্যই ভাল হয়, তাহাকে অবলম্বন করিলে দোষ কি?" দোষ কিছুই নাই,—কিন্তু ভাল কি মন্দ, তাহার ত বিচার চাই? আমরা যে দেশীয় দিক্‌টা না দেখিয়া, না জানিয়াই তাহাকে দণ্ডিত করি! সুতরাং "মহাত্মারা" সংস্কৃতের উপর একটু বেশী জোর দিয়া অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। আর বলাই বাহুল্য যে, সংস্কৃতের একটু অধিক চর্চ্চা হইলেই "প্রাচীরে রোধিয়া অবাধ অসীমে" রাখা হয় না। হরবোলা হইলে বিড়াল, কুকুর, এমন কি বাঘের ডাকও ডাকা যায়,—কিন্তু তাহাদিগকে আগে শিখিতে হয়, মায়ের ডাক। এ হিসাবেও সংস্কৃতের চর্চ্চা এদেশের ছাত্রগণের পক্ষে অবশ্য করণীয়,—জাতীয় বিশেষত্বের সমস্ত তত্ত্বগুলিই তাহার মধ্যে নিহিত।

শিক্ষার কোন নূতন ব্যবস্থা না করিয়া পুরাতন ব্যবস্থাটীকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় লেখক বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন। ঘরে আগুন লাগিলে লোকে আগে বলে—"বাহিরে আইস", —তা' বাহিরে কোন ঘর থাকুক বা নাই থাকুক। বিদেশী ভাষায় শিক্ষা, পুস্তকের ভার, অর্দ্ধেক আহার, পরীক্ষা-ভীতি, স্বাস্থ্য ও

সাহস হানি, এবং ক্ষীয়মাণ সহজ বুদ্ধি ও প্রচীয়মান গোলামী বুদ্ধির প্রভাবে ছেলে-গুলি প্রতিনিয়ত সর্ব্বনাশের পথেই অগ্রসর হইতেছে। অতএব, প্রথম কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে বাহিরে আনিয়া মুক্ত বাতাসে দাঁড় করান। ঘরের কথা, তাহার পরে। "মহাত্মারাও" সেই ভাবেই কথা বলিয়াছেন, সুতরাং দোষের-ত বড় বিশেষ কিছু দেখিনা। ঐ গোলামী বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রবন্ধকারের বক্তব্য অতি নিদারুণ। কথাটা নাকি বিলাতী এবং তাহার জন্ম রহস্য না কি বড় নিগূঢ়। এত বড় পাণ্ডিত্যের সম্মুখে মস্তক অবনত না করিয়া উপায় নাই। কিন্তু নারিকেলের দর বলিতে গিয়া, পিতামহের এ বংশ পরিচয়ে প্রয়োজন কি? ভারতীয় ছাত্রগণের চরিত্রে গোলামী-বুদ্ধি জিনিষটার কি অস্তিত্বাভাব? তা যখন বলিবার যো নাই, তখন নামটীর মূলনির্ণয়ের কথা না পাড়িলেও ক্ষতি ছিল না। এখন দেখা যাউক, গোলমী বুদ্ধির চিকিৎসা সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য কি। তিনি বলেন, "সামাজিক বৈষম্যের ফলে আমাদের হাড়ে মাসে যে বুদ্ধি জড়াইয়া আছে,—তাহা দূর করিতে না পারিলে ইউরোপ বিদ্বেষ জ্বালাইয়া আমরা মানুষ হইতে পারিব না।" শুনিয়াছি, ভারতবর্ষের কোন কোন বিশিষ্ট সম্প্রদায় ঐ সমস্ত জঘন্য সামাজিক ব্যবস্থা হইতে অব্যা-হতি লাভ করিয়াছেন। কিন্তু, তাঁহাদের ভিতর হইতে গোলামী-বুদ্ধি গিয়াছে বা কমিয়াছে কি? তা যদি না গিয়া থাকে বা না কমিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে গোলামী-বুদ্ধির বীজ অন্যত্র নিহিত, এবং এই বুদ্ধির জন্য বিলাতী শিক্ষার আংশিক দায়িত্ব যখন কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, তখন সে শিক্ষা সম্বন্ধে একটু সতর্ক হইলে হানি কি? আর এরূপ সতর্কতাকে ইউরোপ-বিদ্বেষ নামে অভিহিত করিবারই বা কারণ কি?

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, পুরাতন অভ্যস্ত পথ ও বহু সুবিধার পথ ত্যাগকরা কোন কালেই সহজ নহে, এবং কেহই ইচ্ছা করিয়া তাহা করিতে যায় না। যাঁহারা করেন, তাঁহারা উপায়ান্তর না পাইয়াই করেন। এই নূতনের অনুসরণ করিতে গিয়া যদি ভুল-ভ্রান্তি হয়, তাহা লেখকের ন্যায় প্রবীণ পণ্ডিতের নিকট মার্জ্জনীয় হওয়া উচিত। ত্যাগের পথে যাহারা চলিয়াছে, তাহাদিগকে দুর ভিসন্ধির অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিতে হয়। সদভিসন্ধি সত্ত্বেও যাঁহারা অনভিজ্ঞতা বশতঃ ভুল করেন, তাঁহারা কি শ্রদ্ধার পাত্র নহেন? কাজ করিতে গেলেই ভুল হয়! ভ্রান্তি শূন্যতার অভিমান কর্ম্মশূন্যেরাই করিতে পারে।

শ্রীঅরবিন্দপ্রকাশ ঘোষ।

বিধির বাদ।

কালীঘাটে ধৌত শত পাতকীর কলুষে মলিন
কৃশাঙ্গী সে আদিগঙ্গা কেঁচোসম পঙ্কমাঝে লীন।
তারি কিনারায়,
স্নিগ্ধবেণু বনচ্ছায়ে সুপ্ত লুপ্তপ্রায়
আছে এক গ্রাম,
পুঁটুরিয়া নাম,
অতন্দ্রিত
মশকের মৃদুগুঞ্জ নিস্বনমন্দ্রিত।
সেইখানে, নিরালায়, লাউলতামণ্ডিত কুটীরে,
পানাপচা পুকুরের তীরে,
থাকিত মহেশ,
খরক্ষৌর-বিমুণ্ডিত কেশ,
টিকি ওলা।
ব্যবসা ঠাকুর পূজা। আর ভিজা চাল, কলা, ছোলা,
দক্ষিণা দু এক আনা মাঝে মাঝে।
ইহা ছাড়া পালে, পর্ব্বে, ব্রত, নেম আদি ক্রিয়া কাজে
পাওনা অশেষবিধ, সিধে, সাধা, বিদায়, ফলার
চমৎকার!
একরূপে চলিত সংসার
দস্তার টাকার মত
অবিরত
নানা দিক হতে নানা ধাক্কা খেয়ে খেয়ে।
ঘরেতে ছিলেন শুধু ব্রাহ্মণী, ও একমাত্র মেয়ে
আঁধার ঘরের মণি,
আদরের খনি,
দুর্ব্বলের অবলম্ব, দরিদ্রের বুকজোড়া ধন,
যাহারে ঘেরিয়া অনুক্ষণ
ছুটিত আনন্দ উৎস, উছলিত হাসি,
যদিও ছিল না ঘরে হীরা মুক্তা মাণিক্যের রাশি,
রথ, হস্তী, অশ্ব, দাসদাসী।
যদিও দুবেলা
কন্যার বরাদ্দ ছিল পাকশালে নিত্য হাঁড়ি ঠেলা,

গিন্নিরে করিতে হ'ত কড়া মাজা থেকে ছড়াঝাঁট,
কর্ত্তারে কাটিতে হ'ত কাঠ
হাট হ'তে সোজা
বহিয়া আনিতে হ'ত তেল নুন শবজীর বোঝা
রৌদ্রতপ্ত রক্ত মুখে, ঘর্ম্মসিক্ত শ্লথ কলেবরে,
দীর্ঘঘন-নিশ্বসিত-বিক্ষুব্ধ-পঞ্জরে,
দিবা দ্বিপ্রহরে।
গৃহ ছিল সুখশান্তিময়।
প্রীতির পীযষভরা আছিল সে তিনটি হৃদয়
আপনা-বিস্মৃত
দুঃখের জলন্ত চুল্লীমাঝে অবিকৃত।
আচম্বিতে একদিন
সুখসুপ্তিলীন,
গ্রামখানি সচকিত করি চতুর্গুণ,
রাত্রির বসন প্রান্তে জ্বালাইয়া মশাল,আগুন,
অট্টহাস্যে, হট্টগোলে,
ঢাকঢোলে,
ব্যথিত মথিত করি আকাশ, বাতাস, জলস্থল,
কোথাহতে এলছুটে বরপক্ষ দল,
অর্থলোভে তৃষার্ত্ত, পাগল,
রক্তআঁখি, শক্তিমদে চূর,
সর্পসম বক্রগতি, বিষতুণ্ড, বিষম নিষ্ঠুর,
আক্রমিল মহেশের পুরী অসহায়,
চলি গেল,দণ্ডছয়ে লণ্ড ভণ্ড করি সমুদায়,
ভাণ্ডারে পাশিয়া,
ছিঁড়ে, ছুড়ে ছড়াইয়া, পিষিয়া চষিয়া,
করি ছারখার,
জাগাইয়া উচ্চ হাহাকার,
শূন্য করি গোলা ও গোয়াল,
পাকশাল,
কর্ত্তার কপালে লেখা
চিন্তারেখা
নির্ম্মম পরুষ হস্তে করি পরিস্ফুট,
তিনফুট

কাপড়ের দৈর্ঘ্য হতে ছাঁটি,
খসাইয়া গৃহিণীর নাসা হতে,—গিনিসোনা খাঁটি—
নথটুকু, হাত হতে তাগা,
হানিল কন্যার ভালে জবারক্ত সিন্দুরের দাগা,
পরাইল রতন শৃঙ্খল
—ঝঙ্কৃত মুখর, সমুজ্জ্বল,
হস্তে, পদে, কণ্ঠে, কটিতটে,
জড়ায়ে বাঁধিল লাল চটে।
বহিলয়ে গেলা শেষে
কোন দূর দেশে
কেহ নাহি জানে,
হিল্লী দিল্লী পারে কোন জেলা বর্দ্ধমানে।
হেথা শূন্য ঘরে,
দৈন্যজীর্ণ দম্পতির হৃদয়ে, উদরে,
জ্বলিল বাড়ববহ্নি শিখা লেলিহান
রাবণের চিতাসম উদ্দীপ্ত, অতৃপ্ত, অনির্ব্বাণ!
গেল কত দিন কত রাত,
দেখিতে দেখিতে গত মাসছয় সাত।
বর্দ্ধমান হ'তে আজো আসে নাই চিঠি অর্দ্ধখানা।
নাহি আছে জানা
কন্যার সংবাদ।
স্বামী স্ত্রীতে ভেবে ভেবে উন্মনা, উন্মাদ।
কাটে বেলা পিয়নের পথপানে চাহি অহরহ।
হেনকালে এল পত্রবহ
ডাক হরকরা,—
পিপাসিত চাতকের নেত্রপথে অভ্র জলভরা,—
কিন্তু কোথা জল?
এযেগো দারুণ বজ্রানল!
এযে লাল খাম!
টেলিগ্রাম!
ব্যাপারটা এই :—
মেয়ের কলেরা। ঘরে জামাতাও নেই
গেছে দূরে,
সেবা করিবার লোক মেলে নাই সাতগ্রাম ঘুরে।

অবস্থা সঙ্কট।
চিকিৎসক মেলাও দুর্ঘট।
বিনামূল্যে পরজনে কে করিবে দয়া ?
স্মরিতে পিতারে তাই সকাতরে মরিছে তনয়া।
শুনি বাক্যহত
মহেশের দৃষ্টি হতে ছায়াবাজি মত
মুছে গেল বিশ্ব ছবি,
নির্ব্বাপিত রবি।
পথমাঝে গড়াল সে পড়ি।
ক্ষণপরে উঠিয়া দাঁড়াল ধড়মড়ি
দেখিল প্রমাদ গণি
সেদিন বেস্পতিবার, বারবেলা পড়িবে এখনি!
তাই তাড়াতাড়ি
বাড়ী থেকে যাত্রা ক'রে, যতক্ষণ নাহি ছাড়ে গাড়ি
ভাবিল কাটাবে ইষ্টিশনে,
কষ্টেস্থষ্টে, বসিকাষ্ঠাসনে।
এ হেন কুক্ষণে
ধন, মান, আপ্তবন্ধু ত্যজে লোক না করি বিচার,
ক্ষণিকের স্বস্তি কোন ছার ?
শুধু একবার
মালপত্র গোছাবার ফাঁকে
দেখা ভাল পথে যদি বিঘ্ন কিছু থাকে।
তাই সে বসিল ঘরে গিয়ে, কোলে নিয়ে,—
Map নয়, Bradshaw নয়,
Time table ? তাও নয়।
মহেশ কাজের কাজী,
বসিল কোলেতে নিয়ে পাঁজি।
দেখিলেন সর্ব্বনাশ! সে দিন যে অমাপ্রতিপদ,
যাত্রানাস্তি কোনমতে। আবার বিপদ,
যোগিনী সম্মুখে!
তাই মনোদুখে
চক্ষুদাটি লক্ষধারে বহিতে লাগিল অশ্রুজল,
অনর্গল।

ভাবিয়া না পায় চারা,
—উত্তাল-বিপত্তি-সিন্ধু-মাঝে-আত্মহারা—
কোথা কূল, কোথায় কিনারা।
বুঝায়ে বলিল তবে নলিন গাঙ্গুলী
উপদেশ বচন মামুলী :—
"কেন ভয় পাও?
সর্ব্বমঙ্গলার রাজ্যে, অমঙ্গল, সম্ভবে কি তাও?
অভয়ার নাম স্মরি যাত্রা কর ঘুচিবে বালাই,
কোন চিন্তা নাই।
দুর্গানাম বিঘ্নবিনাশন।"
টিক্‌টিকিও করিল এ বাক্য সমর্থন
করি টিক্ টিক্।
মহেশ ভাবিল, "আহা! ঠিক।"
অতএব বাহিরিল দুর্গানাম উচ্চারিয়া মুখে।
হেনকালে মাথা গেল দরজায় ঠুকে।
ফিরে ঘরে ঢুকে।
মিনিট পনের খালি
আবৃত্তি করিল দুর্গা, দুর্গা, কালী, কালী,
তার পর বাহিরিয়া এল চট্‌পট্।
গৃহিনী সাজায়ে দিল দ্বারদেশে জলভরা ঘট,
আমপাতা গাদি।
সেথা বসি পড়ি গেল 'বৃষজগতুরগান' আদি
সমস্কৃত পদ্য।
ইহা পাঠে কার্য্য সিদ্ধি না কি সদ্য সদ্য।
অতঃপর উত্তরিল রাজপথ পরে;
বেলা যায়, চলিল সত্বরে,
জপিতে জপিতে দ্রুত দুর্গা কালী নাম
অবিশ্রাম।
সহসা একি উৎপাত! পথমাঝে কে আনিল শব?
নহে অসম্ভব
নিয়ে যাবে পথিকের ডানদিক ঘেঁসে!
চক্ষু স্থির! যায় বুঝি ফেঁসে
দুর্গা, কালী, পূর্ণ ঘট, বৃষ, গজ তুরঙ্গের গড়া
মঙ্গলের ঘড়া।

মহেশ অচিরে
দাঁড়াইল ফিরে
বামে রাখি মৃত দেহটারে।
কৌশলে অশুভ হতে নিষ্কাসিল শুভ কোন মতে
পোস্ত যথা অহিফেন হ'তে।
পুনরায় চলি দ্রুতগতি,
অবসন্ন অতি,
উপনীত্ত ইষ্টিশনে।
সেইক্ষণে,
বাঁশির নিস্বনে
ফুকারিয়া উঠিল এঞ্জিন
অর্ব্বাচীন।
টিকিট হল না কাটা, গাড়ি ছাড়ে ছাড়ে!
মহেশ ছুটিল বেগে, ঠেলি কারে, পড়ি কারো ঘাড়ে
ধাক্কা ও হুঁচট খেয়ে
খেয়াল না করে
বাঁচে কিবা মরে,
ছুটে প্রাণ পণে,
ইহকাল পরকাল নাহি চাহে, শুধু ভাবে মনে
"একটি দরজা যদি খোলা পাই, বাঁচি।"
অবশেষে উঠিয়াছে পাদানিতে, হেনকালে হাঁচি
শুনা গেল কানে।
শেল যথা পশিল পরাণে।
কে হাঁচিল? কে হাঁচিল? চেয়ে দেখি সবমুখপানে,
বক্ষে, শিরে করি করাঘাত,
অকস্মাৎ
হতভাগ্য বসি প'ল ভূমে।
চকিতে লুকাল গাড়ি ক্ষিতি যেথা নভতল চুমে।
হোথা বর্দ্ধমানে,
মেয়ের পরাণ-পাখী পিঞ্জরের বাঁধন না মানে,
ঝাপটি মরিছে পাখাছটী,
এখনি লইবে ছুটি,
উড়ে যাবে কোন অজানায়।

তার আগে একবার দেখিবারে চায়
স্নেহময় জনকেরে, মাগি লবে অন্তিম বিদায়।
হেথা কালীঘাটে,
মাটিতে লুটায়ে রাজবাটে,
বুকফাটা বেদনার অশ্রুভারে অবভুগ্ন পিতা
মনে মনে সাজাইছে আপনার চিতা,
শোকে মুহ্যমান।
দুজনার মধ্যে কত ক্রোশ ব্যবধান!
মিলনের ছিল এক পথ
বাষ্পরথ।
দুরন্ত দুস্তর পরে একমাত্র পুল।—
তাও আজি বিপর্য্যস্ত, বিধ্বস্ত, বিচূর্ণ বিলকুল
হাঁচির বোমায়!
হায়! হায়! হায়!!
শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ভাত কাপড়ের শণি।

দেশের লোকের ভাত কাপড়ের অভাব বাড়িয়াছে; কার্ত্তিকের পচানে জ্বর বারমেসে ম্যালেরিয়ায় দাঁড়াইয়াছে; মানুষের খাঁটি মূলধন যে পৈতৃক প্রাণ, তাহাই বুড়া বয়স পর্য্যন্ত ধড়ে রাখা কঠিন হইয়াছে। কাহার দোষে বা কিসের ফলে এই দুঃখ, তাহাতে তর্ক থাকিতে পারে, কিন্তু যদি তর্ক উঠে যে এই অবস্থাটাই সত্য কি না, তাহা হইলে গোলে পড়িতে হয়; কেন না রাজ্য শাসনের প্রচলিত নিয়মে এসকল বিষয়ের ঠিকুজি ছাপা হয় না। মাঝে মাঝে মানুষ গণ্তি হয় বটে কিন্তু দুঃখের গণনা হয় না! কখনও কখনও মনে হয়, যে এই দুঃখের কথা চাপিয়া রাখাই যেন দল বিশেষের ইচ্ছা ও স্বার্থ। কেন এইরূপ মনে হয়, তাহা বলিতেছি।

দেশে উঠিল আর্ত্তনাদ, আর সেই সময়ে কয়েকজন ইতিহাসজ্ঞ পণ্ডিত একেবারে আকবর বাদসাহের দিনের খাতা-পত্র খুলিয়া প্রমাণ করিতে বসিলেন, যে সেকালে টাকা পয়সার যে মূল্য ছিল, সে হিসাবে বিচার করিলে সে কালের অভাব ও দারিদ্র্য একালের চেয়ে বহুগুণে অধিক ছিল। অল্প হউক অধিক হউক, দুঃখটা দুঃখই; দুঃখনিবৃত্তির উপায় না ভাবিয়া বিদেশের তত্ত্বজ্ঞেরা বসিলেন একটা জটিল সমস্যার রফা করিতে—আর আমাদের হইতে লাগিল দফা রফা।

অন্যদিকে আবার শুনিতে পাই যে আমাদের দুঃখের কথা নাকি কাল্পনিক। যাঁহারা আমাদের কল্পনা শক্তির সুখ্যাতি করেন, তাঁহারা বলেন, দেড়শত বৎসর

ধরিয়া এদেশের সুখ-সমৃদ্ধি বাড়িয়া চলিয়াছে। সর্ব্বসাধারণের মাথার উপরে কাপড়ের ছাতা, গায়ে জামা, পায়ে জুতা ও ট্যেঁকে টাকা; এ দৃশ্য ভারতবর্ষের কোন যুগে পূর্ব্বে দেখা যায় নাই। চাষায় যত টাকা দিয়া কোর্টফিস কেনে ও উকিলকে ধনী করে, সে কালের ভদ্রলোকের ঘরেও অত টাকা ছিল না। আগে জমিদারেরাও খড়ের চালায় বাস করিত, এখন পল্লীতে পল্লীতে কোঠা বাড়ী। বড় বড় জমীদারেরা, সেকালে তাহাদের পাড়া গাঁয়ের আবাসে, খালি গায়ে খড়ম পায়ে ঘুরিত, আর চিঁড়ে-দই-য়ের ফলার দিয়াই বড় মানুষি ফলাইত; এখন প্রজার ঘরে টাকা হইয়াছে বলিয়াই তাহারা বড় বড় সহরে বাস করিতেছে, ইন্দ্র ভবন গড়িতেছে, গাড়ি মোটর হাঁকাইতেছে, নন্দন বনে বেড়াইতেছে ও রাজভোগ খাইয়া প্রতিদিন ডাক্তারকে ৩২৲ টাকা করিয়া দর্শনি দিতেছে। প্রজারা যদি কল্প তরু না হইয়া থাকে, তবে তাহার ছায়ায় এত ভোগ বিলাস বাড়িতে পারিত কি? যদি নিত্য ত্রিশ দিন গোরুটী দশসের করিয়া দুধ দেয়, তবে তাহার ঘাস জলের অভাব হইয়াছে বলা চলে না; প্রজাকে পিষিয়া মারিয়া টাকা আদায় করিলে এই স্থায়ী ঠাট বজায় থাকিত না; মূলার ক্ষেত করিয়া চাষাকে উপড়াইলে এতদিন সকল ক্ষেত উজাড় হইয়া যাইত। যাহাকে দুর্ভিক্ষ বলে তাহা দেশে নাই, কারণ টাকা দিলেই বাজারে যত খুসি খাদ্য কিনিতে পারা যায়।

সর্ব্বসাধারণের যে টাকা বাড়িয়াছে, তাহার আর একটী প্রমাণ এই যে কন্যাদায় ঘুচাইতে গেলে অধিকাংশ লোককে আগেকার চেয়ে বহুগুণে বেশী টাকা পণ দিতে হয়। এ কাজ যদিও বহু কষ্টে অনেক সম্পত্তি বেচিয়া করিতে হয়, তবুও ত বুঝিতে পারা যায়, যে মানুষের সম্পত্তি আছে ও সে সম্পত্তির মূল্য আছে। বাপের টাকার অনটন দেখিয়া দু-চারিটী মেয়ে আত্মহত্যা করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত টাকা পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়াই বরের বাপেরা দাবি উপস্থিত করিয়া থাকে; আবার একথাও সত্য, যে কাহারও মেয়ে একেবারেই অবিবাহিতা পড়িয়া থাকে না। দেশে যে টাকা বাড়িয়াছে তাহার প্রমাণে, লোকে আরও দশটা দৃষ্টান্ত দিতে পারে।

তবে যে গোড়ায় বলিলাম, দেশে রোগ ভোগ বাড়িয়াছে ও অন্ন ভোগ কমিয়াছে, সেটা কি মিথ্যা কল্পনা? আমাদের সমৃদ্ধি, মহাদেশের মত বিস্তৃত হইলেও তাহার চারি পাশে কি মহাদেশের চেয়ে বহু-পরিমাণে বিস্তৃত দুঃখ দারিদ্র্যের সাগর, অস্বীকৃত হইতে পারে? যাঁহারা দেশের দুঃখ কষ্ট অস্বীকার করেন না, সমৃদ্ধির কথাও ভুলেন না, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলিবেন, যে উপার্জ্জন-পটু ধনী বিদেশীরা এ যুগে আমাদের গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়াছে, আর দেশের লোকের মনে নূতন নূতন সুখ ও সুবিধা লাভের জন্য ছোঁয়াচে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, কিন্তু উপার্জ্জনের বল বুদ্ধি বাড়ে নাই; তাই আকাঙ্ক্ষাটা দুরাকাঙ্ক্ষা হইয়া আমাদিগকে দুঃখে কষ্টে ডুবাইতেছে। ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন বা বলিতে পারেন, যে বিদেশীরা তাহাদের লাভের মাত্রা যে ভাবে চড়াইয়াছে, ও যত সম্পদ জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহাতে দেশের লোকের দুর্দ্দশা না বাড়িয়া যায় না। প্রত্যুত্তরে বলা চলে যে, বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য না চলিলে কোন দেশেরই ধন সম্পদ বাড়িতে

পারে না। কোন শ্রেণীর বণিককেই লাভের মাত্রা কমাইতে বলা যায় না। আর ব্যবসা বাণিজ্য চলিয়াছে বলিয়াই দেশের ধন দৌলত বাড়িয়াছে ও নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে; দেশের লোক এখন উপার্জ্জন পটু হইলেই সকল দুর্দ্দশা ঘুচিয়া যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের সকল জটিল কথা এ প্রবন্ধে তোলা চলে না; এ দেশের লোক বিশেষ উপার্জ্জন পটু হইলেও, এ কালের রাজ বিধানের ফলে, বিদেশের সঙ্গে অবাধ স্বাধীন বাণিজ্য চালাইতে পারে কিনা, সে কথাও এ প্রবন্ধে ঠিক বিচার করা অসম্ভব। এ সম্পর্কে এখানে কেবল এইটুকু বলিতে পারি, যে আমরা যদি খাঁটি দুঃখের তাড়নার সময়ে অতি সূক্ষ্ম আস্‌মানি বিচার ছাড়িয়া, এই মাটির সংসারের দিকে তাকাইয়া 'আটপউরে' কাণ্ডজ্ঞান লইয়া চলি, তবে বুঝিতে পারিব, যে যাহা বিনা জোর জুলুমে যায় না,—যাহার উপর জোর জুলুম করিবার বল আমাদের নাই, তাহার সঙ্গে আড়ি করিলে কেবল বলক্ষয় হইবে, কিন্তু দুঃখ ঘুচিবে না। এখন আড়ি সাজে না, কিন্তু যে আড়াআড়ি সকল অবস্থাতেই উত্তম, তাহা সাজে।

এই আড়া আড়ি ও ব্যবসা বাণিজ্যের কথা একটু বুঝাইয়া লিখিতে গেলে আঠার পর্ব্ব মহাভারত লিখিতে হয়,—গৌড়ায় যে কাঁদুনির সুর ধরিয়া ছিলাম তাহা ভাঙ্গা হয় না। দুঃখের মূল, সে দিকের বিচারেও ধরা যায় বটে তবে যে মাটি সহজে খুঁড়িয়া এখনকার সঞ্চিত বলে গোটাকতক শিকড় কাটিতে পারা যায়, সেই মাটি খুঁড়িতেই বিচারের ক্ষমতা তুলিব।

কবি, স্বদেশ-প্রীতির টানে সোনার বাঙ্গালা আঁকিয়াছেন; আর সেই চিত্র বড় মনোহর; তবে যখন খাঁটি মাটির বাঙ্গলার দিকে মোটা দৃষ্টিতে তাকাই, উহার জ্বরে কাঁপা ও ছায়ায় ছাপা পল্লি বাটে যাহা দেখি, তাহাতে আর সেখানকার সেঁতা বাতাস প্রাণে কবিতার বাঁশি বাজায় না, প্রাণ সেখানে শিঙ্গা ফুঁকিতে চায়। আগাছার জঙ্গলে, পাতা পচা বদ্ধ জলা, ও বিষে কুষ্ট মশা, মানুষকে উদ্বাস্ত করিতে বসিয়াছে। কয়েক জন মেডিকেল কলেজের পাশ করা বুদ্ধিমান সুচিকিৎসকের মুখে শুনিয়াছি যে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, পাড়াগাঁয়ের বেশীর ভাগ লোকে জ্বরের আক্রমণ এড়াইতে পারে না, আর জ্বরের সময়ে উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য না পাইয়া ভুগিয়া ভুগিয়া মরে। অভাবের কষ্ট কেমন করিয়া হয়? কোন্ শনির দৃষ্টিতে মানুষের টাকা কড়ি উড়িয়া পুড়িয়া যায়? যাহারা দেশের সঙ্গে পরিচিত, তাঁহাদের অনেকেই বলিবেন, যে আয়ের চেয়ে ব্যয় বাড়িয়াছে অনেক কাজেই রোগের বেলায় পথ্য চলে না। একথা সত্য, যে ফেসন্ অর্থাৎ নূতন দাঁড়া—দস্তুরের ঢং, মেলেরিয়ার মত পাড়াগাঁয়ে সংক্রামক হইতেছে, ও অনেকে লোকের কাছে মান রাখিতে গিয়া রোগের সময় প্রাণ রাখিতে পারিতেছে না; কিন্তু এই কারণই দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ নয়! ভূস্বামীকে যাহা দিতেই হইবে, উকিলকে যাহা না দিলেই নয়, বিবাহে যাহা শোষিবেই ও শ্রাদ্ধে যাহা গড়াইবেই তাহা ছাড়াও যে অনেক ঢং—এ মানুষের টাকা খসে, ও তাহার ফলে বড়ই কাহিল হইতে হয়, সে কথা স্বীকার করিয়াও অন্য কারণ খুঁজিয়া দেখিব। দুর্দ্দশা ঘুচাইবার উপায় স্বরূপে কেহ কেহ যাহা বলিয়া থাকেন, তাহারই একটু সমালোচনা করিলে আমাদের উদ্দিষ্ট কারণটির সন্ধান পাওয়া যাইবে।

কেহ কেহ হয়ত জ্বর জ্বালার কথার প্রসঙ্গে, একটা সোজা উপায় নির্দ্দেশ করিবার জন্য অধীর হইয়াছেন; তাঁহারা বলিতে চাহেন যে জলাশয় পরিষ্কার রাখিলে ও জঙ্গল কাটিয়া ফেলিলে যখন আপদ যায়, তখন অন্ততঃ ঐ প্রসঙ্গে এত তর্ক ও বিচার কেন? কথাটা এত সোজা নয়। যেখানে সার তৈ'রী করা ও জমিতে সার জমাইয়া দেওয়া অর্থসাধ্য ও শ্রম-সাধ্য, সেখানে যদি অনেক আগাছা জন্মিয়া মাটিতে মিশিতে পায়, তবে সার জমাইবার কাজটা সহজ হয়. যাহারা কোন বিষয়ের কার্য্য কারণ ভাল বুঝে না ও রোগটাকে কপালের ফল ভাবে, তাহারা লোক মুখে, পুঁথির কথা শুনিয়া, নিজেদের মনে এমন একটা টান জন্মাইতে পারে না, যাহাতে আশুলাভের পথটা ছাড়িয়া দিতে পারে। অন্য রকমের জঙ্গল ও বাঁশের ছায়া সম্বন্ধে অন্য কথা আছে; বাসের ঘরের জন্য, বারুয়ের বরজের জন্য ও আরও দশটা বিশেষ কাজের জন্য, যেখানে বাঁশ ছাড়া গতি নাই, যেখানে জ্বালানি কাষ্ঠ কিনিতে হইলে নিজের ঘর সংসার পুড়িয়া যায়; সেখানে গাছ পালা কাটা, অথবা সাজাইয়া গুছাইয়া অল্প করিয়া রাখা বড় সুসাধ্য নয়; বসত ভিটের কাছেই খানিকটা বন বাদাড় না থাকিলে স্ত্রীলোকদের পক্ষে লজ্জা রক্ষা করা চলে না কারণ তাহারা পুরুষদের মত 'গুরু কাজ' ও 'লঘু-ক্রিয়ার' জন্য মাঠে ও গাঙ্গের পাড়ে যাইতে পারে না। নিজে হাতে নিজেদের মলাদি লইয়া, মাঠে পোঁতার ব্যবস্থাটা, এদেশের সংস্কারে যখন চলিতেই পারে না, তখন ঘরের কোণের ছায়ার তলাতেই রোগের বীজ পুষিতে হয়। আমাদের মান মর্য্যাদার সংস্কার ও জাত রাখার সংস্কার যে ভাবে আছে, তাহাতে বিদেশের দৃষ্টান্ত কেন, মনুর কালের বিধিও চলিবে না।

বাঙ্গালা দেশের চাষারা বেশী টাকা পায়, পাট বেচিয়া, বাজারে যখন যত খুসি চাল কিনিতে পাওয়া যায়, তখন অল্প লাভের জন্য ধান না বুনিয়া চাষারা নীচু জমিতে পাটের চাষ করিবেই; পাটের মত লাভের আর একটা কিছু না পাইলে, উহা ছাড়িতে পারে না। গাঁয়ের অনেক জলায় পাট না পচাইলে পাটের রোজগার অসম্ভব। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ লোকের সংস্কারের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অদৃষ্টে মরণ না থাকিলে যে পাট পচাইলেই মানুষ মরিতে বসিবে, এ কথায় প্রায় কাহারও দৃঢ় বিশ্বাস নাই। লাভের কথাটা মানুষের বড় কাছে, কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা ভাবিয়া বুঝিতে হয়।

যাঁহারা পাড়া গাঁয়ের সীমা ঘেঁষিতেও নারাজ, তাঁহাদের কেহ কেহ, হিতৈষী বক্তা সাজিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন যে, যায় জমিদার সকল শ্রেণীর বিদেশ প্রবাসীরা আপনাদের পূর্ব্বপুরুষের গ্রামগুলিতে গিয়া বাস করুন; তাহা হইলে সকলের সুবুদ্ধিতে গ্রামগুলির উন্নতি হইতে পারিবে। অনেক লোক যদি ঐ উপদেশে সহর ছাড়ে, তবে সহরের বসত ভিটার মূল্য অনেক কমিবে, ও যাহারা সহর-বাসে নাছোড়বান্দা তাহাদের সুবিধা হইবে; কিন্তু এই উপদেশ পালনে যে বাধা আছে, তাহা বলিতেছি।

পাড়া গাঁয়ে জন্ম হইলেও যাঁহারা দাতাকর্ণ পড়িয়াই পড়া শেষ করিতে চাহেন না, সহরে শিক্ষিত হইয়া শিক্ষিতদের সংসর্গে মানুষ হইতে চাহেন, শিক্ষালাভের পর প্রচার ব্রত লইতে চাহেন না বা পারেন না, মহাভারতের বনপর্ব্ব পড়িয়াও যাঁহারা দিবসের অষ্টমভাগে

জন্ম-ভিটায় বসিয়া শাক সিদ্ধ করিয়া তৃপ্ত নহেন, অর্থাৎ কিছু রোজগার করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে চাহেন, তাঁহারা বারমাসের মধ্যে একমাসের ছুটিতে স্বাস্থ্যের সন্ধানে শৈশবের লীলা ভূমিতে ফিরিতে পারেন না; সংখ্যায় এই শ্রেণীর লোকই দিন দিন অধিক হইতেছে। হিংসা দ্বেষ ও পচানে জ্বর না এড়াইয়া, ইঁহারা জন্ম ভিটায় আসন পাতিলে কতটা কি হইত জানি না। কিন্তু কথা এই, যে মানুষকে যখন বাড়িতে হইবে, তখন ঠাঁই নড়ার প্রয়োজন; কাজেই গ্রামের উন্নতির অন্য উপায় দেখিতে হইবে। কোন মানুষের কপালেই যে জন্মভিটার ফোঁটা দাগিয়া রাখা চলে না, ভিটা কামড়াইয়া থাকিলেই যে মানুষের অধোগতি হয়, তাহা বুঝাইতে গেলে সমাজ-তত্ত্বের একটা অধ্যায় লিখিতে হয়। মানুষেরা যদি চিরকাল জন্ম-ভিটা ধরিয়া থাকিত, তাহা হইলে আদিমনুর আদিস্থানেই সকলে পচিয়া মরিত আর সারা পৃথিবীটা জন শূন্য হইত; যতদিন ভারতে জীবন ছিল ততদিন নিরন্তরই ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের লোক ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে গিয়া বসবাস করিয়াছে; বংশের তালিকা খুলিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, কাহারও ভিটা তাঁহার আদি ভিটা নয়।

পৈত্রিক যাহা কিছু লইয়া অথবা চাষ প্রভৃতি কাজে যাহারা পল্লিবাসী, তাহাদের অধিকাংশ লোক যে স্বাস্থ্যের অনেক বিধানকে ভুয়া মতবাদ মনে করে, এবং জন্মগত ও সামাজিক সংস্কারের ফলে নিজেদের প্রাণ রক্ষার বিষয়েও অনেক কাজ কিছুতেই নিজে করিতে পারে না, সেকথা পূর্ব্বেই একটুখানি বলিয়াছি। যদি কোন গ্রামে নিয়ম করা যায় যে অমুক জলাশয়ের জল কেবল পানের জন্য রহিল, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাইবেন যে অধিকাংশ লোক গোপনে সকল নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিজেরাই নিজেদের চাতুরী ও বাহাদুরির প্রশংসা করিবে। লোক সাধারণের মধ্যে কিরূপ শিক্ষা না চালাইলে লোকেরা তাহাদের নিজের স্বার্থও ভাল করিয়া বুঝিবে না, কিরূপ প্রভাব বিস্তার না করিলে প্রাচীন সংস্কার ঘুচিবে না ও প্রয়োজনের সকল শ্রেণীর কর্ম্মকেই লোকে পবিত্র মনে করিবে, তাহার বিচার না করিলে চলিবে না। যাঁহারা পলিটিকস্ নামক অদ্ভুত পদার্থটাকে টানিয়া আনিয়া সমাজ-সংস্কারকে পিছনে ঠেলিতেছেন, তাঁহাদের সঙ্গে তর্কে আঁটিতে পারিব না।

যাহাদের বংশ বাড়িয়াছে কিন্তু জমি বাড়ে নাই, ও যাহারা পৈত্রিক কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে রোজগার করিতে কুণ্ঠিত, তাহারা যে কষ্টে পড়িবে তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না। ময়মনসিং, ঢাকা, চাটগাঁ প্রভৃতি স্থানের বিস্তর মুসলমান চাষা, বর্ম্মায় গিয়া চাষের কাজ করে, ও অনেক টাকা লইয়া ঘরে ফেরে; চাটগাঁ অঞ্চলে যে সকল গোয়ালা ও নাপিতেরা কেবল নামেই হিন্দু কিন্তু জাতের বাঁধন বড় মানে না, তাহারাও বর্ম্মায় অনেক টাকা রোজগার করে; পূর্ব্বাঞ্চলের অনেক মুসলমান, জাহাজের কাজে অনেক টাকা ও সাহস উপার্জ্জন করে, কিন্তু বলিষ্ঠ নমশূদ্রেরাও জাত বাঁচাইয়া ঘরে থাকে। আসামের চা বাগানে যদি স্বেচ্ছায় শ্রমজীবি জুটিত, তবে শ্রমজীবিরা সুখে ও স্বাধীন ভাবেই থাকিতে পারিত; তাহা ঘটিলনা বলিয়াই কুলি-আইন হইল, আর বাগানের মালিকদিগকে কুলি পিছু বহু টাকা ব্যয় করিয়া ক্রীতদাসের মত কুলি রাখিতে হইতেছে। এই কুলি আইনের ফলে যে

সকল ছলে কুলি সংগ্রহ করা হয়, ও তাহাতে যেমন ভাবে অনেক স্ত্রী পুরুষ পাপে ও কলঙ্কে পড়িয়া জাত হারাইয়া কুলি হয়, তাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। সাধারণ লোকেরাই যে ভিটার মায়া ছাড়িতে পারে না, তাহা নয়; যাঁহারা লেখাপড়া শিখিয়াছেন, তাঁহারাও মোটা মাইনে না পাইলে বাঙ্গলা দেশের বাহিরে বেশীদূর যাইতে পারেন না, কারণ সন্তানদের বিবাহের উদ্যোগের জন্য অনেক খরচ-পত্র করিয়া দেশে ফিরিতে হয়, ও আরও দশটা বিষয়ে নিজের জাতের বাঙ্গালি না পাইলে 'প্রবাসে' থাকা চলে না। ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে একাকী গিয়া যদি এদেশের লোক ঘর বাঁধিতে না পারে ও সমাজ খুঁজিয়া না পায়, তবে গোটা ভারতবর্ষকে আপনার দেশ বলিয়া বুঝিতে শিখিবে না; বাহিরের প্রদেশ গুলি 'উড়ে মেড়োর' মুল্লুক বলিয়াই হতাদৃত হইবে। স্বাধীনতা লাভের গোড়ায় যাহা না হইলে চলে না, অলক্ষ্যে দেশের প্রতি অন্তরের টান জন্মাইতে হইলে যে ভাবে চলা উচিৎ, তাহার পক্ষে আমাদের প্রধান বাধা কি, তাহা বুঝিতে বাকি থাকে না।

যাহাদের ভাল করিয়া পেটের ভাত যোটে না, এমন লোক বাঙ্গলার প্রতি গ্রামেই বহু সংখ্যায় আছে; প্রতি গ্রামে হিতৈষণার কাজ খুলিয়া টাকা ঢালিতে গেলে, কুবেরকেও দেউলিয়া হইতে হইবে। মানুষ যদি মানের শাসন ও জাতের শাসন এড়াইয়া নিজের প্রয়োজনের সকল কাজ না করে, যদি উপার্জ্জনের জন্য সকল শ্রেণীর শিল্পকেই পবিত্র বলিয়া মনে করিতে না শিখে, তবে কর্ম্ম-ফলের দেবতা কদাচ প্রসন্ন হইবেন না। আমাদের এই প্রকাণ্ড দেশে যদি গোটাকতক উপযুক্ত স্থানে রোজগারের ভাল কারখানা খোলা যায় তবেই কারখানা গুলি ভাল করিয়া চালাইবার সম্ভাবনা হয়: সেই গোটাকতক স্থানেই বহু গ্রামের লোককে আসিয়া শ্রমের জন্য জড় হইতে হইবে। এই সকল নূতন স্থানে যদি মানুষকে টানিয়া আনা সম্ভব হয়, তাহা হইলেই ধীরে ধীরে অনেক সংস্কারের বাঁধন খুলিয়া যাইবে, সুখ সুবিধার প্রলোভনে ও আলস্য ছাড়িয়া, উঠিয়া হাঁটিয়া মানুষেরা নূতন বল পাইবে; নূতন স্থানে নূতন সমাজ গড়িতে গড়িতেই মানুষের হাড়ে হাড়ে নূতন বুদ্ধি ও নূতন প্রবৃত্তি জন্মিবে। দেশের লোক একেবারে পঙ্গু হইয়াছে; উহারা নড়িতে চড়িতে না শিখিলে স্বরাজ আনিতে পারিবে না। আমাদের আজন্মের বাঁধন যে আমাদিগকে পরাধীন করিয়াছে ও দাসত্বের বুদ্ধিকে মধুর করিয়া দিয়াছে, তাহা বুঝিলে সকল উৎসাহের কাজ পণ্ড হইবে। আমাদের ভাত কাপড়ের শনি, আমাদেরই শরীরের ও সমাজের কেন্দ্রে।

দোষ, কারও নয় গো মা!
মোরা নিজের খোঁড়া খানায় পড়ে মরি শ্যামা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সহযোগিতা বর্জ্জন।

১

বাজ্ রে শিঙ্গা, বাজ্ রে শিঙ্গা,
বাজ্ রে আবার আজ এই রবে!
দুঃখের রজনী গিয়াছে চলিয়া,
ভারত এবার স্বাধীন হবে!

২

আছিল যতেক ভারত সন্তান
সবাই ক্ষেপিয়া উঠেছে আজ!
স'যোগিতা তারা করিবে বর্জ্জন—,
করিবে না আর পরের কাজ!!

৩

School, collegeএ পড়িবে না আর
বাড়ীতে বসিয়া scholar হবে!
বিলাতে তারা যাবে না কখনো
দেশের সন্তান দেশেই রবে!!

বারিষ্টারী তারা করিবে না আর
ওকালতি এবার ছাড়িবে তারা!
আপন স্বপদ করিবে বর্জ্জন
Magistrate, judge আছিল যারা!!

৫

বিদেশে তাহারা মালের export
এইবার নাকি করিবে বন্ধ!
ব্যবহার তারা করিবে না আর
Essence, সাবান, সুগন্ধি গন্ধ!!

৬

Grand-Hotelএ যাবে না তাহারা
খাবে না আর সে সাহেবী খানা!
Congressএ এবার করেছে এসব—
তাদের দেশের নেতার মানা!!

৭

কলের গাড়িতে চড়িবে না কেহ
গন্তব্যে হাঁটিয়া যাইবে চ'লে!
ডাকঘরে কেহ ছাড়িবে না পত্র
পাঠাবে বাঁধিয়া পাখীর গলে!!

৮

পরের গোলামী করিবে না তারা
নিজেরা শাসিবে নিজের দেশ!
Hat, coat তারা ছাড়িয়া এবার
ধরিবে আপন স্বদেশী বেশ!!

৯

Cigarette তারা পায়েতে দলিয়া
"হুক্কা-কলিকা" করিবে সার!
"বিড়ির" আশ্রয় কেহ বা লইবে
সাধ না পূরিবে তাহাতে যার!!

১০

Port, Whiskey ছুঁড়িয়া ফেলিয়া
সবাই এবার ধরিবে "তাড়ি"!
কিনিতে কেহই Denis Mounie
ছুটিবে না আর সাহেব বাড়ী!!

১১

অগাধ পাণ্ডিত্য দেখায়েছে গান্ধী
Non-co-operation জাহির করে!
ক্ষেপিয়া উঠেছে মন্ত্রেতে তাহার
ছেলে বুড়ো নারী প্রত্যেক ঘরে!!

১২

Councilএ যাইয়া সদস্য হইবে
করেছিল বাঙ্গালী মনেতে আশ!
বিষম খট্কা বাধাইল গান্ধী
Non-co-operation করিয়া পাশ!

১৩

"তোলপাড়" কিন্তু দেশের ভিতরে
চলেছে আজ্ কে মস্ত বড়;
শেষটা কি হয় ঠিক কিছু নাই
যদি কেউ শেষে স'রে না পড়!!

১৪

তোলপাড় কত গিয়াছে এ-হেন
নূতনত্ব ইথে কিছুই নাই!
কোথাকার ঢেউ কোথা পড়ে গিয়া
আমরা বসিয়া দেখিব তাই!!

—শ্রীসঞ্জয় উবাচ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবর্গের প্রতি কয়েকটী কথা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

প্রিয় ছাত্রবর্গ!

ইতিপূর্ব্বে তোমাদের কলেজ পরিত্যাগ সম্পর্কে আমার মনে যে আপত্তিগুলি উদিত হইয়াছে, তাহা তোমাদিগকে বলিয়াছি। আজ আর কয়েকটা স্পষ্ট কথা বলিব। তোমরা এ কথাগুলিও ভাবিয়া দেখিবে, এ আশা আমার আছে।

যে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কেবল-মাত্র কতকগুলি পরীক্ষা লইবার ব্যবস্থা করিয়া এবং পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে উপাধি দিয়া আসিতেছিল, তখন দেশের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দোষ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রবর্গের শিক্ষা-দানের কোনই ব্যবস্থা না করিয়া, যন্ত্রবৎ, কেবল কতকগুলি পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে দেশের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেছে; অথচ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যেটী আসল কর্ত্তব্য—উচ্চ শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা—সে কর্ত্তব্য-পালনে বিশ্ব-বিদ্যালয় নিতান্তই উদাসীন রহিয়াছে! দেশ-ময় তখন এই দোষ কীর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। কিছুদিন পরে, অনেক বাধাবিঘ্ন উত্তীর্ণ হইয়া, যখন বিশ্ববিদ্যালয় বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের সর্ব্বোচ্চ এম্-এ পরীক্ষার জন্য, শিক্ষার ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে কতকগুলি বিভাগ খুলিয়া দিয়া, সেই সকল বিভাগে ছাত্রদিগকে উন্নত প্রণালীতে এম্-এ শিক্ষা দিবার জন্য ব্যবস্থা করিতে উদ্‌যোগী হইলেন; তখন আমরা সকলেই মনে করিতে লাগিলাম যে, এইবার দেশের লোক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ অবলম্বন করিবেন, এবং এই উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠা করিতে পারায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপরে দেশবাসীর প্রসন্ন দৃষ্টি নিপতিত হইবে। কিন্তু হায়! এই আশাই কি সফল হইতে পারিয়াছে?

কেবল একটীমাত্র বৎসর এই শিক্ষাদান প্রণালী ব্যবস্থাপিত হইতে না হইতেই, নানা স্থান হইতে, এই শিক্ষাদান-পদ্ধতির দোষ আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল! একটা নূতন ব্যবস্থার প্রণয়ণ করিতে গেলেই, প্রথম প্রথম হয় ত ঐ ব্যবস্থার মধ্যে দুই চারিটা বিচ্যুতি বা অভাব থাকিতেও পারে; যদি সেই সকল অভাব বা ত্রুটি সংশোধনের শুভ-ইচ্ছা দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, ঐ ব্যবস্থার সমালোচনা করা যায়, তবে সেরূপ সমালোচনা সর্ব্বতো-ভাবে গ্রহণীয় এবং সে প্রকার আলোচনায় দেশবাসীমাত্রেরই অধিকার রহিয়াছে। কিন্তু নব প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে আজ প্রায় দুই বৎসর যাবৎ যে প্রকার আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, সেই আন্দোলনকে, কোন প্রকারেই হিতেচ্ছা-প্রণোদিত আন্দোলন বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারা যায় না। স্বতঃই মনে হয়, এই প্রকার আন্দোলনের মূলে যেন ব্যক্তি-গত ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে! বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই আন্দো-লনে কেবলমাত্র সত্য ও কল্পিত দোষগুলিরই পুঙ্খানুপুঙ্খ কীর্ত্তন করা হইতেছে; কিন্তু এই নূতন শিক্ষা-প্রণালীর একটিমাত্র গুণেরও উল্লেখ করা হয় না। দোষ প্রদর্শনে শত জিহ্ব; গুণের উল্লেখে একেবারে মুদ্রিত-মুখ!! তোমরা এই নূতন পদ্ধতির অধীনে থাকিয়া, অনেকে কৃতবিদ্য হইয়া সংসারে প্রবেশ

করিয়াছ; অনেকে বর্ত্তমানে এই পদ্ধতিতে শিক্ষালাভ করিতেছ। আমি তোমাদিগকেই সাক্ষীরূপে, সাদরে, আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি; তোমরাই বল, পূর্ব্বের শিক্ষা-প্রণালী এবং নবীন শিক্ষা-প্রণালী—এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে 'আকাশ পাতাল' তফাৎ কি না? তোমরা পূর্ব্বাপেক্ষা সকল দিকে প্রায় পূর্ণাঙ্গরূপে শিক্ষালাভ করিতেছ কি না? যে সকল শিক্ষক তোমাদিগের অধ্যাপনা কার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন, তাঁহারা তোমাদের উন্নতি ও মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ যত্ন লইয়া থাকেন কি না? এই অধ্যাপকদিগের জ্ঞান ও শিক্ষাদান প্রণালী, গভীর ও তোমাদিগের পরম হিতসাধক কি না? তোমরা এই প্রশ্নগুলির নিরপেক্ষভাবে উত্তর দেও!

এই সমালোচনা ও আন্দোলনের মধ্যে, আমরা বিস্মিত চিত্তে, লক্ষ্য করিয়াছি যে, একটা এইরূপ কথা উঠিয়াছে যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়টী একটী "গোলামখানা" মাত্র। এই সুমিষ্ট, সুরুচিসঙ্গত, শিষ্টাচারানুগত "বিশেষণটি" দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করা হইতেছে। ইহার প্রথম অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি একবার এই "গোলাম-খানাটীর" ত্রি-সীমার মধ্যে কোন প্রকারে আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাকেই আপনার স্বাধীন মত ও চিন্তা, নিজের ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব, এইগুলিতে চিরকালের মত জলাঞ্জলি বা তিলাঞ্জলি প্রদান করিতেই হয় এবং তাঁহাকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীর যিনি প্রধান পরিচালক সেই ব্যক্তি-বিশেষটীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, একটা "গোলামী-খতের" লেখা-পড়া করিয়া লইতে হয়!! "গোলামখানা" বিশেষণটির যদি এই প্রকার অর্থই হয়, তবে তোমাদিগকে একটী কথা বলিব। ইহাতে তোমাদিগের ক্ষতি-বৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? যদি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি, লাভ-লোকসানের কথা উপস্থিত হয়, তবে সেটা ত আমাদের স্কন্ধদেশেই পূর্ণরূপে পড়িবার কথা!! ছাত্রদিগের পক্ষে কোন স্বাধীনতা বর্জ্জনের বা দাস-খৎ দিবার ত কোনই প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। তবে কেন তোমাদিগকে—ছাত্রবর্গকে—"গোলাম-খানা" পরিত্যাগের উপদেশ দেওয়া হইতেছে? এই সুমিষ্ট বিশেষণটীর আর এক প্রকার অর্থ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা 'গোলাম' নির্ম্মাণের উপযোগিনী শিক্ষা ব্যতীত আর কিছুই নহে! বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতি, দেশব্যাপী 'কেরাণী'র কুল সৃষ্টি করিতেছে; গভর্ণমেণ্টের বিবিধ আপিসের নিমিত্ত, বৎসরের পর বৎসর, অসংখ্য 'দাস-শ্রেণীর' সৃষ্টি হইতেছে! "গোলাম-খানার' ইহাই দ্বিতীয় অর্থ। আমি তোমাদিগকে এখানে ও সাদরে, সস্নেহে, আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি—সত্যই কি তোমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের নিকটে এই দাসত্বোপযোগিনী শিক্ষা পাইতেছ? উচ্চাঙ্গের সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব—এগুলি কি তোমাদিগকে সত্যই * "কেরাণী-গিরি" করিবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিতেছে? সংস্কৃত, সাহিত্য, নাটক, অলঙ্কার; ন্যায়-বৈশেষিক-বেদান্ত-সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রগুলি প্রাচীণ ভারতীয় ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতির মধ্যে;—দাসত্বের কোন প্রকার 'বীজের' প্রকৃতই কোন অনুসন্ধান মিলিয়াছে কি? প্রকৃত কথাটা তাহা নহে! কথাটা

* আমি এই সকল প্রবন্ধে Artsএর কথাই লক্ষ্য করিয়াছি। Scienceএর দিকটা বলি নাই।

হইতেছে, মানুষের চিত্তবৃত্তি! দেশের আর্থিক অবস্থা যদি এ প্রকার শোচনীয় হইয়া থাকে যে, বাঙ্গালীর ব্যবসা বাণিজ্যের পথ যদি বিদেশীয় কর্ত্তৃক এপ্রকারে অবরুদ্ধ হইয়া গিয়া থাকে যে, উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত যুবকদিগের পক্ষে অন্য প্রকারে অর্থাগম করিবার উপায় যদি এপ্রকারে বিনষ্ট হইয়া গিয়া থাকে যে, —গভর্ণমেণ্টের "কেরাণী"র কার্য্য না করিলে গ্রাসাচ্ছাদন আহরণ করা কঠিন; তাহা হইলে, ইহা উচ্চশিক্ষার দোষ নহে! 'জাতীয় বিদ্যালয়ে' শিক্ষিত হইয়াও এই 'কেরাণী গিরি'র হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়াও, 'আমি কেরাণীর কার্য্যে যাইব না', 'আমি মনুষ্যত্ব-বর্জ্জন দিয়া দাসত্বের নিগড় গলায় বাঁধিব না'—এপ্রকার চিত্ত-বৃত্তি কি অর্জ্জন করা অসম্ভব? ফলতঃ, বিশ্ববিদ্যালয় 'গোলামী' শিক্ষা দেয় না; বিশ্ববিদ্যালয় উচ্চ-অঙ্গের সৎ-সাহিত্যাদির শিক্ষাই প্রদান করিয়া থাকে। মহাত্মা গান্ধী, শ্রীযুক্ত চিত্ত-রঞ্জন—ইঁহারা কি বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই বহির্গত ছাত্র নহেন? পরলোকগত মহাপুরুষ তিলক কি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্র-রত্ন ছিলেন না?

তোমরা বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া, "জাতীয় শিক্ষা" লাভের জন্য, কলেজ পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছ? কিন্তু "জাতীয় শিক্ষা" কথাটার অর্থ কি? এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে কিছু বলিয়াছি। আজ আর কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্ববারে, যে সময়ে বাঙ্গলা দেশে "স্বদেশী" আন্দোলন প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সময়ে, National Council of Education" দ্বারা, জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে যে সকল পাঠ্য গ্রন্থ ও যে প্রকার প্রণালী, 'জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতি' রূপে অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়া তৎকালের "সন্ধ্যা" পত্রিকার সম্পাদক পরলোকগত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন যে, ঐ সকল পাঠ্য গ্রন্থ এবং শিক্ষাদানের ঐ প্রণালী,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরই একরূপ নকল মাত্র; সুতরাং ইহাকে "জাতীয় শিক্ষা প্রণালী" বলা যায় না। তিনি এই বলিয়া সকলকে সময়ে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন! এবারেও, আমি তোমাদিগকে বলিতে চাই যে, তোমরা কি "জাতীয় বিদ্যালয়ে" প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা বা পারসী কে, ইংরেজীর সঙ্গে একেবারে তুল্যরূপে প্রবর্ত্তিত করাইতে সমর্থ হইবে? আমি ত যতদূর দেখিতেছি, তাহাতে সেরূপ প্রাধান্যের কোনই লক্ষণ দেখিতেছি না। "নায়কের" সম্পাদক ও, কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে, এই বিষয়ে সতর্কীকৃত করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই "জাতীয় শিক্ষার" প্রতিষ্ঠাতা ও পরামর্শ দাতা, তাঁহারা প্রায় সকলেই পাশ্চাত্য প্রভাবে পূর্ণমাত্রায় প্রভাবান্বিত; পাশ্চাত্য উচ্চ-শিক্ষায় আকণ্ঠ শিক্ষা প্রাপ্ত। ইহা যে কোন দোষের কথা, তাহা আমি বলিতেছি না। বর্ত্তমান কালে, ইংরেজী শিক্ষা ও বৈদেশিক নানাবিধ আবিষ্কার ও শিক্ষার দ্বারা উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতে না পারিলে, ভারতবর্ষ অপরাপর জাতির নিকটে হীন হইয়াই থাকিবে, আমি ইহাই বিশ্বাস করি। সুতরাং, নেতৃবর্গের যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় কোন দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য, তাহা মনে করিও না। আমি সুধু এই কথা বলিতে চাই যে, পাশ্চাত্য প্রভাবে যাঁহারা

প্রভাবান্বিত, তাহাদের দ্বারা, সংস্কৃত বা বাঙ্গলা কখনই, প্রধান শিক্ষিতব্য বস্তুরূপে গৃহীত হইবে, এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যায় না। যদি তাহা না-ই হইল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীকে "জাতীয়শিক্ষা" বলিতে আপত্তি কিসের? বরং আমি ইহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, দর্শনশাস্ত্র—প্রভৃতিকে যে প্রকার উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছে, বাঙ্গলা ভাষাকে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় যে প্রকার স্থান দিতে সমর্থ হইয়াছে, ভারতবর্ষের আর কোথাও, সংস্কৃত ও বাঙ্গলার এতাদৃশ সম্মান রক্ষিত হয় নাই! তোমরা সার্ আশুতোষকে পরিত্যাগ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে! কিন্তু আমরা ত মনে করি যে, সার্ আশুতোষের মত স্বজাতিনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত পুরুষ না থাকিলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষায় সংস্কৃত ও বাঙ্গলার স্থান এবং বিশেষতঃ সর্ব্বোচ্চ এম্—এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের সাতটী পূর্ণাঙ্গবিভাগ আমরা আজ্ দেখিতে পাইতাম কি না সন্দেহ! বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় সংস্কৃতের এ প্রকার সম্মান না করিলে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্তকণ্ঠে স্বজাতিদ্রোহী বলিয়া অকাতরে নির্দ্দেশ করিতাম। পৃথিবীতে ভারতবর্ষের এখন ও যে এত গৌরব, এ কিসের জন্য,—ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? বর্ত্তমান অবস্থার জন্য, ভারতের এ গৌরব নহে! ত্রিশ-কোটী লোক, অসংখ্য স্বাধীন নৃপতি বৃন্দ সহ, আজ যে মুষ্টিমেয় বিদেশী ইংরেজের পায়ের তলায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে ইহার, জন্য বিদেশে ভারতের গৌরব নহে! ভারতের গৌরব ও সম্মান—উহার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের জন্য। এই সাহিত্যে যে সকল অমূল্য সম্পদ নিহিত রহিয়াছে, তাহারই জন্য। তাই, স্বদেশ-প্রাণ, সার্ আশুতোষের চেষ্টায়, সেই সংস্কৃত সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সম্মানের আসন গ্রহণ করিয়া উপবিষ্ট রহিয়াছে। কিন্তু তোমরা শুনিলে বিস্মিত হইবে যে, এই সংস্কৃতের ঈদৃশ সম্মান করার জন্যও সার্ আশুতোষকে, তাঁহার দেশবাসীর হস্তে কম লাঞ্ছিত হইতে হয় নাই! কত সুশিক্ষিত দেশবাসী বলিয়াছিলেন যে, আটটা দশটী ছাত্রের জন্য সংস্কৃতে সাতটী বিভাগ খোলা হইয়াছে এবং পঙ্গপালের মত অধ্যাপক নিযুক্ত করা হইয়াছে!!! বাঙ্গলাকে এম্-এ পরীক্ষায় স্থান দিতেও অনেক স্বদেশবাসী শিক্ষিত ব্যক্তি ইঁহার বিরোধী হইয়াছিলেন! এ সকল কথা তোমরা কি জান? এই ভয়েই বলিতেছিলাম যে, পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত নেতার পরিচালনায় "জাতীয় শিক্ষায়" "জাতীয় বিদ্যার" প্রকৃত স্থানলাভ বড়ই আশঙ্কাপ্রদ!!! তাহা হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে, তোমাদিগকে আর একটী বিষয় বলিব। গভর্ণমেণ্টকে যতদিন দেশের লোকে কর প্রদান করিবে, ততদিন দেশের লোকের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতে গভর্ণমেণ্ট নিশ্চয়ই বাধ্য। এ অবস্থায়, আমরা শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্থ-সাহায্য না লইব কেন? না লওয়াই বরং দোষের হইবে। যদি দেশে কোনদিন এমন অবস্থা উপস্থিত হয় যে, গভর্ণমেণ্টকে কর দিতে হইতেছে না; কেবল সেই অবস্থাতেই, গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা স্থায় সঙ্গত হইতে পারে। কিন্তু দেশের মধ্যে সে অবস্থা আসিয়াছে কি?

দূর-ভবিষ্যতেও, সে অবস্থা আসিবে বলিয়া ত কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। আমরা কর-দাতাও থাকিব; অথচ গভর্ণমেণ্ট আমাদের শিক্ষার জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিবেন না;—এ ব্যবস্থা কিছুতেই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

আমি পূর্ব্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেশবাসীর অর্থ সাহায্য প্রধানতঃ বিরচিত হইয়াছে এবং দেশ-বাসী কত বদান্য পুণ্যব্রত পুরুষের অর্থদ্বারা এখনও পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় ভাঙ্গিয়া, আবার নূতন টাকা দ্বারা নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে যাওয়ার অর্থই এই যে, দেশবাসী প্রদত্ত অর্থ জলে ফেলিয়া দেওয়া! এই দরিদ্র দেশে এ প্রকারে ত অর্থ নষ্ট করা চলে না! বরং যে বিশ্ববিদ্যালয়টী পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে তাহাকে রক্ষা করিয়া, তাহারই সংস্কার-সাধনার্থ, চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্য প্রণালী, এই উভয়েরই পরিবর্ত্তনই যদি আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকে, তবে তাহারই জন্য কেন তোমরা সমবেত চেষ্টা কর না? সার্ আশুতোষ অতীব ছাত্র-বৎসল। অন্যান্য পরিচালকবর্গও তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তোমাদের সকলের সমবেত চেষ্টা, ইহাঁদের দ্বারা কখনই প্রত্যাখ্যাত হইবে না। বৃথা আন্দোলনে, সময়ও প্রাণ শক্তির নিষ্ফল ব্যয় না করিয়া, দেশের এই সুপ্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়টীকেই বরং 'সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ' করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলে যে মহোপকার সাধিত হইবে,—ইহাই প্রকৃত দেশের সেবা।

শ্রীকোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ঘণ্টাধ্বনি।

Carillons de Flanders.

[বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে জর্ম্মণরা Flanders আক্রমণ করা উপলক্ষে Dominique Bonnaud এই কবিতাটি লেখেন]

আকাশখানি নীলে নীল
ছুটির দিনে আজ;
ছড়ান এই মাঠের কেমন
শান্তিভরা সাজ!
ছুটির বার্ত্তা লয়ে সুখে
ঘণ্টা বাজ জোরে!
ঘণ্টা বাজ! ঘণ্টা বাজ!
বাজারে প্রাণভরে!
হঠাৎ একি উঠ্‌ল দেখি
এমন আর্ত্তস্বর!

চল্‌রে ছুটে ত্বরিত-গতি
বাঁচাতে নিজ ঘর!"
গৃধিনী শ্যেন এসেছে ওই
বিপদ হানিবারে।
পাগল-পারা ঘণ্টা বাজ
অস্ত্র আনিবারে।
তীক্ষ্ণ-ধার অরির ছোরা
(ক্ষণিক তার জয়)
আঘাতে তারি দেশের ছেলে
ভূমিতে পড়ে রয়।

নিষ্ঠুর অরি বেঁধেছে সবে
শুধু গায়ের জোরে।
ঘন্টা বাজা! ঘন্টা বাজা।
বাজা বিষাদ ভরে।
ওই যে দূরে কালোর কোলে
আলোর রেখা,—একি

পলায় অরি! প্রতিশোধের
দিবস এল দেখি!
গর্ব্বভরে আকাশে তোল
জয়ধ্বনি ওরে!
স্বাধীনতার ডঙ্কা বাজা,
ঘন্টা বাজা জোরে।

শ্রীসুনীতি দেবী

পাটের কথা।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং।

চাকুরীর নাগপাশ কাটাইয়া, দেশ সেবার আশায়, পৈত্রিক ভদ্রাসনে বাস করিতে গেলে গ্রামের লোকেরা সমাদরেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে, যে সময়ে যমরাজের ঘাট-দুয়ার খোলা থাকে, কার্ত্তিক মাসের সেই সময়ে, কলিকাতার কলের জল, বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার মমতা ছাড়িয়া পাট-পচান-কলুষিত জলের ভয় না করিয়া, পল্লীবাসে আসিবার মতলব অনেকেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সন্দেহ করিতেছিলেন, পাছে বা সংস্পর্শ দোষ (untouchability) উঠাইয়া একাকারের প্রশ্রয় দেই। হিন্দু এবং মুসলমান, কেবল দেনার উপর নির্ভর করিয়া, যাহারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিল, তাহারা সাব্যস্ত করিল যে, "বাহাদুরীর" পর "মহাজন" হইবার চেষ্টাই স্বাভাবিক। বিনা মতলবে, ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে যে কেহ পল্লীবাসে আসিতে পারে, বৃদ্ধের কথা দূরে থাকুক, যুবকগণও ইহা বিশ্বাস করিতে রাজি ছিল না। তাই অনেকেই "মহামহিম" সম্বোধনে আপ্যায়িত করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ "রেহানের" প্রলোভন ও দেখাইতে লাগিলেন, ইহাতে দেশের আর্থিক অবস্থা বুঝিবার সুযোগ ঘটিল। একদিন একজন বিশিষ্ট পরিবারের লোকের সহিত কথা হইতেছিল। "দেনা করিয়া পৈত্রিক ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা করা অন্যায়" এই কথা বলায়, উত্তর হইল, আমাদের অবস্থা খারাপ কিসে? কিছু দেনা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে কি আসিয়া যায়? ইংরাজ-রাজ মান বজায় রাখিতে গিয়া দেনা করিয়া এত বড় একটা যুদ্ধ চালাইতে পারিলেন, আর আমরা সামান্য দেনায় ভয়ে পূজা আর্চ্চা বন্ধ করিয়া দিয়া দেশের লোকের নিকট হেয় হইয়া থাকিব? মান বড়, না টাকা বড়? পাটের দাম পড়িয়া না গেলে, কয়েক বিঘা আমার জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই দেনা শোধ যাইত। দু বছর আগে জমি বন্দোবস্ত করিয়া কেমন লাভ করিয়াছি, সে খবর কি রাখেন?"

মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মাতব্বর গোছের কয়েক জন লোক একদিন প্রস্তাব করিলেন যে দেশ ধৌত হইয়া যাওয়ায়, এবং পাটের দাম পড়িয়া

যাওয়ায়, দুই বৎসর পূর্ব্বে যে জমির দাম বিঘা প্রতি ১০০।১৫০৲ টাকা উঠিয়াছিল, সেই সকল জমি এখন ৪০।৫০৲ টাকায় পাওয়া যাইতেছে। এই সময়ে কয়েক হাজার টাকা কর্জ্জ দিলে তাহারা গরিব প্রতিবেশীগণের জমাজমি সস্তায় কিনিতে বা "রেহানে" আবদ্ধ রাখিতে পারে। শতকরা বার্ষিক ১৫৲ বা ১৮৲ টাকা সুদে কর্জ্জ করিয়া ৩৬৲ টাকা হইতে ৭৫৲ টাকা সুদে দাদন করার মতলব বুঝা গেল। "তেজারতির মতলবে দেশে আসি নাই" বলায়, তাহারা বলিয়া উঠিল—"টাকা কর্জ্জ পাইব এই আশায় এতদিন ঘোরাঘুরি করিতেছিলাম। সমবায়ের (co-operation) মাহাত্ম্য-বর্ণন শুনিতে আসি নাই এবং গ্রামে কো-অপরাটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া নিজের পায়ে নিজে কুড়ালি মারিতেও ইচ্ছুক নহি।" মুসলমান এবং নমশূদ্র সম্প্রদায়ের মাতব্বরদের নিকট ডেনমার্কের লোকেরা গৃহ-পালিত পশু পক্ষীর উন্নতিতে কি প্রকার লাভবান হইতেছে, রক্‌ডেল পদ্ধতি (Rochdale systam) অনুসারে সমবায়-সমিতি-গঠন দ্বারা কি প্রকারে উৎপন্ন দ্রব্য সুবিধামত বিক্রয় করিবার এবং নিজেদের ব্যবহারের জিনিষ পত্র সুলভে খরিদ করিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে, বুঝাইবার চেষ্টা করায়, উত্তর পাওয়া গেল—"টাকা কর্জ্জ দিয়া মহাজনের হাত হইতে যদি রক্ষা করিতে না পারেন, তাহা হইলে এ সকল বৃথা বক্তৃতায় লাভ কি?" জাতীয়-মহাসমিতির নির্দ্দেশানুসারে যাঁহারা পল্লী-জীবন সুব্যবস্থিত করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কথা বলিতেছি। তাঁহারা যেন ঠিক করিয়া যান যে (১) কৃষকের ঋণ শোধের কি পরামর্শ দিবেন; (২) অনাচারণীয়দের সহিত কি ভাবে চলিবেন; এবং, (৩) কোন প্রকার ব্যাভিচারের কথা কানে আসিলে (বিশেষতঃ যে সমস্ত বিষয় পুলিশের সাহায্য ভিন্ন নিবারণ অসম্ভব) কি করিবেন?

কৃষকদের সহিত নানাপ্রকার আলোচনা এবং তর্ক বিতর্কের ফলে বুঝা গিয়াছে, যে পাটের মণ ১০।১২৲ টাকায় বিক্রয় হইবার আগে, তাহাদের দেনার পরিমাণ তেমন বেশী ছিল না। সাধারণতঃ, বিবাহের সময়েই কেবল দেনা হইত। হিন্দু কৃষক সহজে ৪০।৫০ টাকার বেশী কর্জ্জ পাইত না, মুসলমানেরা বেশী পরিশ্রমী বলিয়া ২০।৩০৲ টাকা বেশী চাহিলে পাইত। আমাদের যৌবনকালের একটা ঘটনা উল্লেখ করিয়া সেই সময়কার অবস্থা বুঝাইতেছি। আমাদের গ্রামে ডা * * নামক একটি নমঃশূদ্র যুবক বিবাহ-লগ্নের মাস আসিলেই তাহার অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করিত—"কাকা এ মাসে আমাদের কি টাকা কর্জ্জ হইবে না?" চেহারা কুৎসিত বলিয়া ইহার সম্বন্ধ আসিত না, কিন্তু সে মনে করিত যে টাকা কর্জ্জ করার ভয়ে কাকা তাহার বিবাহ দিতেছে না। পাটের দর বাড়িবার আগে সাধারণ মুসলমান কৃষক "ভালমানসের মেয়ে" বিবাহ করিবার কল্পনাও মনে স্থান দিত না। পাট বিক্রয় করিয়া টাকার স্বচ্ছলতা আরম্ভ হইলে, অনেকের "ভাল মানুসের মেয়ে" ঘরে আনিবার সখ চাপিল, সুতরাং টিনের ঘর করা এবং বাঁদি রাখা অবশ্য-কর্ত্তব্যের মধ্যে দাড়াইল। "ভালমানুসের মেয়ের" ঢেঁকির উপর পা দিতে নাই; কাজেই, দায়ে পড়িয়া দুরবস্থার সময়, স্বামীকে ধান ভানিয়া স্ত্রী প্রতিপালন করিতে হইতেছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই অনেক কৃষককে তাড়াতাড়ি

বাড়ী ফিরিতে হয়, কেন না ধান পাড়াইয়া চাল করিয়া দিলে তবে ত "ভালমানসের মেয়ে" ভাত রাঁধিয়া দিবে! পাটের আবাদে টাকা ঘরে আসা দূরের কথা, চাষের খরচাও পোষাইতেছে না; অথচ "ভালমানসের মেয়ের" চাল দিতে অনেক বেচারী দেনায় ডুবিয়া ছটফট করিতেছে। পাটে ২।৪ বৎসর আশাতীত লাভ না পাইলে, এই ভাবে বংশ-মর্য্যাদা বাড়ানর সখ হইত না। কি পাপে কৃষক-কুল দেনায় ডুবিল, ইহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, যে সমস্ত তথ্য জানিতে পারিয়াছি, তাহার একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। ... ... মণ্ডল আজকাল গ্রামের একজন মাতব্বর লোক। বাল্যকালে, গ্রামের একজন "বড়লোকের" (?) বাড়ীতে চাকুরী আরম্ভ করে। শেষ বয়সে, মাসিক ২৲ টাকার বেশী মাহিয়ানা পায় নাই। ঠাট বজায় রাখিতে গিয়া "বড়লোক" দেনার দায়ে ক্রমে গরীব হইতে আরম্ভ করিলেন, আর ... ... মণ্ডল বুদ্ধির জোরে এবং কল-কৌশলে জমিজোতের মালিক হইয়া বসিল। ইহার পাঁচপুত্র এবং এককন্যা। পুত্রগণ ক্ষেতের কাজে লাগিল এবং বিধবা কন্যা বাপ ভাইয়ের সংসার যাহাতে সুসারে চলে, তাহার জন্য প্রাণপণে খাটিতে লাগিল। মণ্ডলের সংসার এই ভাবে কয়েক বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে কাটিতেছিল। এক বৎসর পাট বেচিয়া অল্প কয়েক দিনের মধ্যে মণ্ডল ৮০০ টাকা পাইল। এত টাকা আগে কখনও তাহার হাতে আসে নাই। তাহার পর সম্বৎসর-খরচের ধান ক্ষেতে জন্মিল। আনন্দে অধীর হইয়া মণ্ডল কার্ত্তিক পূজায় ২০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া বসিল। হাল, লাঙ্গল, ঘর দুয়ার, ভাল করিল, এবং অনেক চাকুরে বাবুদের অপেক্ষা তাহার অবস্থা যে ভাল এই কথা সর্ব্বত্র বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার অবস্থায় কে ছোট হইয়া থাকিতে চায়? স্বজাতীয় লোকদের 'বামুন-কায়েতের' কাজ করিতে বাধা দিতে লাগিল এবং নৌকা চালাইয়া বা ঐ প্রকার কোন নীচ (?) কাজ করিয়া কেহ দু পয়সা রোজগার করিলে তাহার বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজা এবং কার্ত্তিক পূজার পুরোহিত বন্ধের আন্দোলনে অন্যতম নেতা হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মনে হইল,ধনে জনে সে যখন বামুন-পণ্ডিত মনিব বা বাবুদের অনেকের অপেক্ষা কম নহে, তখন পাটের জমি বাড়াইয়া দশজনের, একজন হইবে না কেন? টাকা কর্জ্জ করিয়া চারি বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইল। নজর দিতে হইল ৫০০৲ টাকা এবং বার্ষিক খাজনা ঠিক হইল ৭৲ টাকা। ৩।৪ বৎসর আগে এই জমির নজর ছিল ৭০৲ এবং বার্ষিক খাজানা জোর ৩৲ টাকা। ৫০০৲ টাকা কর্জ্জ করিল বার্ষিক শতকরা ৩০ টাকা সুদে, আর ২০০৲ কর্জ্জ করিল বার্ষিক শতকরা ২৪ টাকা সুদে। সুতরাং, কেবল সুদেই ২০৫৲ টাকা খরচ বাড়িল। মণ্ডল বুঝিল না জমি বাড়াইয়া যাহাদের অপেক্ষা বড় হইতে চাহিতেছিল, প্রকারান্তরে তাহাদিগকেই লাভবান করিতে চলিল। নজরের টাকা পাইল "বাবুরা", আর সুদ পাইতে চলিল বামুন-পণ্ডিতের বংশধরেরা। ১৯০৯ সালে ৭০০৲ টাকা কর্জ্জ হয়। এ কয়েক বৎসরে সুদে আসলে প্রায় ১০০০ টাকা দিয়াছে, কিন্তু এখনও মণ্ডল ১৫০০৲ টাকার দায়ীক। এককালীন এই দেনা শোধের বন্দোবস্ত করিয়া না দিতে পারিলে মণ্ডল যে আমার কাছে সমবায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন শুনিতে

চাহিবে না, ইহা স্বাভাবিক। মণ্ডল যদিও ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, পাটের চাষে লাভ হওয়ায় সম্ভাবনা নাই, তবু বৎসর বৎসর পাট বুনিতে ছাড়িতেছে না। আশা—যদি দাম বাড়ে। মূর্খের আশাই তাহার সর্ব্বনাশের মূল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রতি বিঘায় গড়ে, বৎসর ৫/০ মনের বেশী পাট জন্মে নাই। প্রতি বিঘার বাবদ সুদ, খাজনা এবং হালিক খরচায় বৎসর বৎসর ন্যূনকল্পে ৫৪৲ টাকা পড়িয়াছে। প্রতি মণ ১১৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে পারিলে কোন মতে এই টাকা উঠিত, কিন্তু একয়েক বৎসর গড়ে ৪৲ টাকা মণের বেশী দাম পাওয়া যায় নাই, সুতরাং মণ্ডলের অবস্থা যে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কি আছে? পাটের চাষে বেশী জমি রাখিবার পর বৎসর যে ধান পাইয়াছে তাহাতে খোরাকী খরচ কুলায় নাই। কেন না যে ধান পাইয়াছে, তাহার কতক অংশ বিক্রয় করিয়া, মহাজনের তাড়না হইতে বাঁচিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছে। কেবল এই পরিবার যে এই প্রকার বিপন্ন হইয়াছে এমন নহে, বহু কৃষকের এই দশা ঘটিয়াছে। তবু কিন্তু ইহাদের চৈতন্য হইতেছে না। এক কৃষক-পত্নী, আমাদের আলোচনায় বাধা দিয়া বলিয়াছিল যে, "পূর্ব্বে কেহ তাহাদের ২০৲ টাকা কর্জ্জ দিয়াও বিশ্বাস পাইত না, এখন পাটের আবাদের ফলে, তাহারা ২০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দেনা করিতে পারিয়াছে। পাটের চাষের মত লাভের আর কিছু নাই। পাট বুনন বন্ধ করিলে কেহ ত দেনা দিবেই না, বরং যে ২০০০৲ টাকা দেনা আছে, তাহা আদায়ের জন্য মহাজনেরা বেগ দিতে আরম্ভ করিবে। ভগবান মুখ তুলিয়া চাহিবেনই, পাটের দাম বাড়িবেই। যদিই দাম না বাড়ে তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? মহাজন নালিশ করিলে প্রথমে কিস্তিবন্দী হইবে, তাহার পর নয় জমাজমি বিক্রয় করিয়া লইবে। তাহারা নিজেরা ত জমি চাষ করিতে পারিবে না। কাজেই বর্গা বন্দোবস্ত দিতে বাধ্য হইবে। বর্গায় চাষ করিলেও অর্দ্ধেক ফসল ঘরে আসিবে। দেনা করায় তাহাদের বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় নাই, বরং দশ বৎসর পাটের কল্যাণে টীনের ঘরে বাস করিতে পারিয়াছে, মোটের উপর খাইয়া পরিয়া সুখেই কাটাইয়াছে। দর পড়িয়া যাওয়ায় এখন দেনা পাইতেছে না এই যা মুস্কিল।" "স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী" এই বাক্যের প্রমাণ পাইয়া আমাদের বুদ্ধির গোড়ায় জল আসিল। দেনায় ডুবিয়া চাষারা নানা ফন্দি খাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে। কেহ আদালতে কিস্তিবন্দীর ফাঁদে মহাজনকে আটকাইয়া ফেলিতেছে, আবার কেহ কেহ সম্পত্তি বেনামা করিয়া আদালতের সাহায্যে "দেউলিয়া" সাজিতেছে।

ফরিদপুরের সেটেলমেণ্ট অফিসার জ্যাক সাহেবের পুস্তকে যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে ১৯০৬-১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধানের চাষে খরচ খরচা বাদে প্রতি একার জমিতে লাভ হইয়াছে গড়ে ৩৭৷৷০ টাকা, আর প্রতি একার জমিতে পাটের আবাদে আয় হইয়াছে ৭৫৲ টাকা। সুতরাং বৎসর বৎসর পাটের আবাদ বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ঐ কয়েক বৎসরে ফরিদপুর জিলায় ১,০৭৪,০০০ জমিতে ধান বুনান হইতেছিল আর কেবল ১৬০,০০০ একর জমিতে পাট বুনন চলিতেছিল। বেশী লাভের আশায় যাহারা দেনা করিয়া জঙ্গল উঠাইয়া পাটের জমি বাড়াইয়াছিল, তাহারা

এখন দেনার দায়ে অস্থির আছে। কি ভাবে ফরিদপুর জিলায় পাটের চাষ বাড়িয়াছে দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছি—

বৎসর	একর
১৯০৬—১০	১৬০,০০০
১৯১৯	২৫৮,৪০০
১৯২০	২১৯,১০০

লোকসান হইতে আরম্ভ হওয়ায়, গত বৎসর তাহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৩৯,৩০০ একর কম জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর আরও কম হইবে। মোটা-বুঝ কৃষকেরও আছে। তাহারা আশায় ভুলিয়া আর পাটের চাষ বাড়াইবে না। প্রতি বৎসর মার্চমাসে পাটের বাজার একটু চড়া হয়, কারণ ঐ মাসের মধ্যে নূতন ফসল প্রায় সমস্তই বাজারে আসিয়া পড়ে এবং যাহাতে কৃষকেরা পাটের চাষ কম না করে, তাহার জন্য দাম চড়াইয়া, তাহাদের প্রলোভন দেখাইতে হয়। কলওয়ালাদের এই চালাকি, যাঁহারা পাটের কারবারে আছেন, তাঁহারাই জানেন। এ বৎসরও দাম চড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, তবে আশা করা যায়, কৃষকেরা সহজে আর ফাঁদে পড়িবে না।

শিক্ষার অভাবে এবং ভদ্রলোকের কথার উপর আস্থাহীন হওয়ার ফলে কৃষককুল কি প্রকারে বিপন্ন হইতেছে তাহারও দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৯১৮ সালে হৈমন্তিক ধান্যের ফসল মোটের উপর ভালই ছিল। অনেক কৃষকই সম্বৎসর চলিবার উপযুক্ত ধান পাইয়াছিল, কেহ কেহ বেশীও পাইয়াছিল। গ্রাম গ্রাম ঘুরিয়া সকলকে বুঝাইয়া বলা হইল যে, কেহ যেন সহজে ধান বিক্রয় না করে —অন্ততঃ আশু ধান্যের সময় পর্য্যন্ত সংসার খরচের জন্য যে পরিমাণে দরকার তাহা যেন মজুত রাখে। আমাদের ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত মহাশয় পরিশ্রম করিয়া, এমন কি, হাটে হাটে ঢেঁড়া দিয়া, ধান বিক্রয় করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু, গ্রাম্য-নিরক্ষর মাতব্বরগণ সাব্যস্ত করিলেন যে, ভদ্রলোকেরা সস্তায় চাউল কিনিবার মতলবে, এ সমস্ত উপদেশ দিতে আরম্ভ করিতেছে, কেহ যেন স্বার্থপর বাবুদের এ সমস্ত কথায় না ভুলে। ফলে, অনেকেই মণকরা ১॥০। ১৸০ টাকা হিসাবে ধান বিক্রয় করিয়া ফেলিল। আষাঢ়মাসে যখন ৩।৪ টাকা মণ বিক্রয় হইতে লাগিল এবং কিনিয়া খাওয়া আরম্ভ হইল, তখন মহাজনগণ দাঁও বুঝিয়া ফি টাকায়, মাসিক এক আনা দেড় আনা সুদে কর্জ্জ দাদন আরম্ভ করিলেন। যাহার "সাইকাড়ি" (credit) বেশী নাই, সে আষাঢ় মাসে ১৫৲ টাকা লইয়া, কার্ত্তিক মাসে ২৫৲ টাকা দিবার কড়ারে খত লিখিয়া দিল; সর্ত্ত রহিল যে কার্ত্তিক মাসে দেনা শোধ না করিতে পারিলে অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফি টাকায় ৴১০ পয়সা হিসাবে সুদ চলিবে। দেনার দায়ে খামার জমি মহাজনকে লিখিয়া দিয়া বহু কৃষক বর্গা চষিয়া খাইতেছে। অনেকের কেবলমাত্র একটি বলদ সম্বল রহিয়া গিয়াছে। অন্যের সহিত ভাগে যতটা পারে জমি চাষ করিতেছে। ফলে, ঘরে ঘরে অনাটন বাড়িয়াই যাইতেছে, অন্ন বস্ত্র-সমস্যা বিষম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাটের আবাদ বাড়িতে থাকায় পল্লী স্বাস্থ্যের কি প্রকার অবনতি হইতেছে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনার দরকার। মাঘমাসে বৃষ্টি হওয়ার পর পাটের জমিতে চাষ দেওয়া আরম্ভ হয়। পাঁচ ছয় বার লাঙ্গল দিবার পর, জমি বুননের উপযুক্ত হয়। ফাল্গুন বা

চৈত্র মাসে বীজ বপন করা হয়। নীচু জমিতে চৈত্রের প্রথমেই বুনন শেষ করিতে হয়, নতুবা বর্ষার জলে চারাগুলি ডুবিয়া যাওয়ায় আশঙ্কা। চারা ছয় ইঞ্চি আন্দাজ বাড়িলেই "নাঙ্গলে" (Rake) দিতে হয়। বীজ হইতে চারা গজাইতে ৩।৪ দিন লাগে, কিন্তু 'জাগ দিবার' উপযুক্ত গাছ প্রায় চারি মাসের কমে হয় না। আষাঢ় মাস পড়িতে পড়িতেই নীচু জমির পাট 'জাগ' দেওয়া আরম্ভ হয়, কিন্তু আশ্বিন মাসের মধ্যেই 'জাগ' শেষ হইয়া যায়। পাটের গাছ কাটিয়া বাণ্ডিল বান্ধিতে ২।৩ দিন লাগে; তাহার পরে ১০।১৫ দিন জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। ইহাকেই 'জাগ' দেওয়া বলে। ঘোলা জলে পাট-পচান সুবিধা নহে, কাজেই বিল, বাঁওড় এবং খালখন্দ, যেখানে বর্ষার জল আইসে, সেখানেই 'জাগ' দেওয়া আরম্ভ হয়। জলে দাঁড়াইয়া গাছ হইতে আঁস ছাড়াইতে, অনেক কৃষকই জ্বরে পড়িয়া যায়। মাথার উপর ভাদ্রের রৌদ্র, তাহার পর দিনের পর দিন, বুক জলে দাঁড়াইয়া পাটধোয়া, অনেকের সহ্য হয় না। পিপাসা নিবৃত্তি করিতে পাট পচান জল গণ্ডূষ করিয়া পান করা ভিন্ন উপায় নাই। ফলে, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে অনেকেই জ্বরে পড়ে, আর কুইনাইন খায়! 'জাগ' দেওয়া পাট ধুইয়া আঁস ছাড়াইয়া উঠাইতে না পারিলে সমূহ ক্ষতি, তাই নিজে জ্বরে পড়িলে, চড়াদরে জন মজুর রাখিয়া পাটধোয়া এবং শুখান শেষ করিবার দরকার পড়ে। পেট ভরিয়া তিন বেলা জামাই আদরে খাইতে দিলে এবং দৈনিক ॥০ । ॥৵০' আনা হিসাবে মজুরি দিলে, বৎসরের সময় পাটের কাজে লোক পাওয়া যায়। এদিকে পাট-পচান জলে পল্লীর পানীয় জল নষ্ট করিয়া দেয়, পাট-পচা জলের দুর্গন্ধে গ্রামে তিষ্ঠান ভার হয়। যাহারা ভাদ্র আশ্বিন মাসে ঢাকা ফরিদপুর কুমিল্লা প্রভৃতি জিলার গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়াছেন, তাঁহারাই ইহা জানেন। অনেক সময়ে নদী ছাড়িয়া বজরা খাল বা বিলে পড়িলে পচা-জলের গন্ধে নিদ্রিতাবস্থায় ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। একবার ঢাকা জিলার তারপাশা ষ্টেশনের ৩।৬ মাইল দূরে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিবার প্রস্তাব করিয়া সংবাদ পাঠাইয়া দিলাম। পূজার ছুটিতে অনেকেই বাড়ীতে ছিলেন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিল। সকলে মিলিয়া কমিটি করিয়া, ব্যামো পীড়ার ভয় দেখাইয়া, তাঁহাদের গ্রামে যাইতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। আসল কারণ, পাটপচা জলের গন্ধে তাঁহাদের বাড়ীতে তিষ্ঠান কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, পানীয় জলের কোনই ব্যবস্থা ছিল না। অনেক দিন পরে, ঐ গ্রামের এক জনের সহিত দেখা হইলে তিনি বলিলেন যে, আমাকে তাঁহাদের গ্রামে যাইতে নিষেধ করায় তাহারা এত দূর অপ্রতিভ হইয়াছিলেন যে, একটা পুকুর কাটার বন্দোবস্ত না করিয়া পারেন নাই। "অনেক মামলা মোকদ্দমার পরে পুকুর কাটা হইয়া পানীয় জলের বন্দোবস্ত হইয়াছে। আপনার জন্যই আমাদের পুকুর হইয়াছে" এই কথা বলিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যে গ্রামে ধনীলোকের অভাব নাই, সেই গ্রামের পানীয় জলের যদি এমন দশা হয়, তাহা হইলে কৃষক-বহুল গণ্ড গ্রামের দশা কি, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পাট-পচা জলে মাছ বাঁচিতে পারে না, তাই পাড়াগাঁয়ে মাছের এত অভাব হইতেছে। অনেক সময় মহকুমার হাকিম

পাট পচাইয়া জলাশয় নষ্ট করিবার নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করেন। গতবৎসর বর্ষা বেশী হয় নাই, তাহার পর নিষেধ আজ্ঞা প্রচার হওয়ায় অনেক কৃষককে পাটের বোঝা মাথায় করিয়া এক মাইল দূরে গিয়াও "জাগের" বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে। ইহা আমার স্বচক্ষে দেখা। পাটের আমদানীতে কলিকাতার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, এই অজুহাতে ১৯১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭০০,০০০৲ টাকা এবং ১৯১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮০০,০০০ টাকার উপর পাটকর (Jute Cess) আদায় করিয়া, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টকে (Calcutta Improvement Trust) কে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পল্লীতে পল্লীতে পাট "জাগের" সুবন্দোবস্ত করিয়া কৃষক কুলের এবং স্থানীয় ভদ্রলোকদের ম্যালেরিয়া এবং কলেরার গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার ভাবনা কাহারও মনে আসিতেছে না। হাকিমরা হুকুম দিয়াই কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা ধমকাইয়া, যেখানে সেখানে পাট "জাগ" দেওয়া বারণ করিতেছেন। রুগ্নদেহে, কৃষক বসিয়া ভাবিতেছে, পাট বুনন করিয়া, সে যেন কতই পাপ করিয়াছে! পূর্ব্বে, পাট বেচিয়া টিনের ঘর করিয়াছিল, গত দুই বৎসরে তাহা বিক্রয় করিয়াছে এবং মাড়োয়ারী মাহাজনেরা ইহাতে বেশ দু পয়সা লাভ করিয়াছে। বেহার অঞ্চলের বলদ খরিদ করিতে যে টাকা কর্জ্জ করিয়াছিল তাহার সুদ বাড়িতেছে, অথচ গোহালের সুবন্দোবস্তের অভাবে বলদ মরিয়া গিয়াছে। পশ্চিমে-গরু যে, জল কাদায় দাঁড়াইয়া বর্ষার চারি মাস কাটাইতে পারে না, গৃহস্থের এ জ্ঞান না থাকায় গরুর মড়ক বাড়িতেছে, সঙ্গে সঙ্গে মহাজনের দেনা ও বাড়িতেছে। ধানের চাষ কমিয়া যাওয়ায়, গো-খাদ্য খড়ের ও অভাব হইতেছে এবং গোবংশ ক্রমে লোপ পাইতেছে। তাহার পর, আগে যে সমস্ত "হালট" ছিল, তাহাতে পাটের চাষ হওয়ায়, গোচারণ ভূমির অভাবে গৃহস্থের পক্ষে গরু-রাখা বিষম কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্ব-বঙ্গে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তাদিয়া চলিলেই দেখা যায়, ঘাস নাই অথচ রাস্তার পার্শ্বে পার্শ্বে গরু বাঁধা রহিয়াছে। যাঁহারা সাইকেলে বা ঘোড়ায় যাতায়াত করেন, ইহাতে তাহাদের অনেক সময়ে মুস্কিলে পড়িতে হয়, চলিতে চলিতে মনে হয়, গরু বান্ধিবার এবং পুলের রেলিং এর উপর পাট শুকাইবার এবং গ্রামের লোকদের মলমূত্র ত্যাগের সুবিধার জন্যই যেন রাস্তা করা হইয়াছে। মাঠের মধ্য দিয়া উঁচু উঁচু রাস্তা হওয়ায়, জল নিকাশের পথ বন্ধ হইয়া পাটপচা জল বাহির হইবার বাধা জন্মাইতেছে। ফলে, ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পাইতেছে, অথচ বোর্ডের মেম্বাররা রাস্তা মঞ্জুর করিয়া দেশের কল্যাণ করিলেন মনে করিয়া কৃতার্থ বোধ করিতেছেন। স্বাস্থ্যই সাধারণ লোকের প্রধান সম্বল। স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়া তাহাদের পক্ষে মূলধন (capital) নষ্টের সামিল মনে করিতে হইবে।

পূর্ব্ব এবং উত্তর বঙ্গে যে প্রকার পাট জন্মে অন্য কোন দেশে সে প্রকার জন্মে না। অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গলা দেশে পাট জন্মিতেছে। পূর্ব্বে গৃহস্থরা নিজেদের দরকার মত ধানের জমির পার্শ্বে পার্শ্বে পাটের বীজ ছড়াইয়া যাইত। এই ভাবে যে পাট উৎপন্ন হইত, তাহাতে নিজেদের দড়ি দড়ার কাজ চলিয়া যাইত এবং বিক্রয় করিয়াও কিছু পাইত। হাতে সুতা কাটিয়া, গ্রাম্য লোকেরা

চট প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিত। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের লোকেরা পাটের সুতায় মোটা কাপড় (coarse cloth) প্রস্তুত সম্ভবপর মনে করে; কিন্তু ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আগে মোটা কাপড় এবং চট বুননের ব্যবস্থা হয় নাই। ঐ বৎসর ডাণ্ডী (Dundee) নগরে চটের কল স্থাপনের বন্দোবস্ত হয়, এবং গত ৬০।৭০ বৎসর ডাণ্ডীই পাটের ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে, বাঙ্গলা হইতে ৯ কোটি টাকার পাট বিলাতে রপ্তানি হইয়াছিল। পূর্ব্বে কেবল সাদা পাটই (Corchorus capsularis) বাঙ্গলায় জন্মিত। তাহার পর "তোষা" পাটের (Corchorus oliotrius) চাষ আরম্ভ হইয়াছে। এই জাতীয় এবং সরকারী কৃষি-বিভাগের পরীক্ষিত (K. B. jute) বীজ-উৎপন্ন পাটেরই বাজারে আদর বেশী। যাহারা গত দুই বৎসর এই দুই প্রকারের বীজ ব্যবহার করিয়াছে, তাহারা অপেক্ষাকৃত বেশী দাম পাওয়ায়, বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই; কিন্তু সাদা পাটের চাষে কিছুই লাভ হয় নাই। গত বৎসর, বাঙ্গলা দেশে সাড়ে ৫২ লক্ষ গাইট, অর্থাৎ ২,৬২,০০,০০০/ লক্ষ মণ পাট জন্মিয়াছে। এখনও গত বৎসরের সমস্ত পাট বাজারে আইসে নাই। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎপন্ন পাটের যে জের ছিল, তাহার সঙ্গে গত বৎসরের উৎপন্ন ফসল যোগ করিলে, প্রায় দেড় কোটি মণ উদ্বর্ত্ত দাঁড়াইবে। গত বৎসর বাঙ্গলা দেশে ২১,৬৯,২০২ একর জমিতে পাটের চাষ হইয়াছিল। এ বৎসর যাহাতে অর্দ্ধেক জমিতে পাট বুনানী হয় তাহার বন্দোবস্ত হওয়া উচিত।

পাটের চাষে যে কৃষকের দেনা বাড়িতেছে, ইহা দেখান গেল। আরও দেখান গেল, তাহাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে। এ অবস্থায় পাটের চাষ যে আর বাড়িতে দেওয়া উচিত কি না, চিন্তা করা দরকার। ইউরোপ এবং আমেরিকায় পাটের আদর যথেষ্ট রহিয়াছে। সুতরাং, যাহাতে কৃষককুল রক্ষা পায় এবং পাটের ব্যবসাও চলে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এ চেষ্টা করিবে কে? সরকার বাহাদুর ত রপ্তানি পাটের উপর শুল্ক (export-duty) বসাইয়া, বার্ষিক প্রায় আড়াই কোটি টাকা বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যুদ্ধের সময় আয় বাড়াইবার জন্য, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই "ডিউটি" বসে। তখন ধরা হইয়াছিল—

	গাঁইট	
কাটিং (অর্থাৎ যে অংশ পাকা গাঁইট বাজিবার সময় কাটিয়া রাখা হয়)	(গড়ে ৫/মণ) প্রতি।	।৶০
অন্যান্য প্রকারের		২।০
চট	১০৲	টন বা ২২৪০ পাঃ প্রতি
হেসিয়ান	১৬৲	"

তাহার পর বৎসর "ডিউটি" আরও বাড়ান হইয়াছে—

কাটিং	প্রতি গাঁইটে	১।০
অন্যান্য প্রকারের	,,	৪।০
চট	প্রতি টন	২০ টাকা
হেসিয়ান	"	৩২ ,,

ইহা বাদে, কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট-ট্রাষ্ট, রপ্তানির উপর প্রতি গাইটে ৵০ আনা এবং হেসিয়ানের প্রত্যেক টনে ৸০ আনা হিসাবে টেক্স আদায় করেন।

নিম্নে যে তালিকা দেওয়া হইতেছে তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে, রপ্তানির পাটের উপর টেক্স বসায় ক্রমে ক্রমে বিদেশে রপ্তানি কমিয়া যাইতেছে। গ্রেটব্রিটেনের পরেই, আমেরিকায় বেশী পাট রপ্তানি হইত। ১৯১৬-১৭ খ্রীঃ ঐ দেশে রপ্তানি হইয়াছিল ১২৩,৭১৪ টন; আর ১৯১৮-১৯ খ্রীঃ রপ্তানি হইয়াছে

৬১,২২৯ টন অর্থাৎ ৬২, ৪৮৫ টন রপ্তানি কমিয়া গিয়াছে। এই দুই দেশে পাটের (raw jute) রপ্তানি কমিবার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার কলওয়ালাদের লাভের মাত্রা কল্পনাতীত বাড়িয়া গিয়াছে। যে সেয়ারের দাম ছিল ১০০ টাকা, তাহার দাম হইয়াছে ১০০০।১১০০৲ টাকা।

কাঁচা পাটের রপ্তানির হিসাব।

	টন
১৯০৯-১০—	৭৩০,৪১৮
১৯১০-১১—	৬৩৬,৬২৩
১৯১১-১২—	৮১০,১৫৫
১৯১২-১৩—	৮৭৩,২৯৪
১৯১৩ ১৪—	৭৬৮,৪৫১
১৯১৪-১৫—	৫০৫,০৯৫
১৯১৫-১৬—	৬০০,১১৩
১৯১৬-১৭—	৫৩৯,৭৬৮
১৯১৭-১৮—	২৭৪,১০০
১৯১৮-১৯—	৩৯৮,১৪৬

যে দেশে সস্তায় কাঁচামাল (raw materials) পাওয়া যায় এবং সেখানে কলে কাজ করিবার লোকের অভাব নাই, মজুরও সস্তা, সেখানে কলকারখানা খুলিতে পারিলে যে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইতে পারে, ইহা সহজের বুঝা যায়। চট প্রস্তুত করিতে বেশী শিল্প জ্ঞানের দরকার নাই। কাজেই এ দেশে কল কারখানা বাড়িলে ডাণ্ডীর কলওয়ালাদের যে অন্ন মারা যাইবে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। হেসীয়ান এবং গানিব্যানের রপ্তানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, এ দেশের কলওয়ালাদের লাভের মাত্রা আশাতীত বাড়িয়া চলিয়াছে। ডাণ্ডীর কলওয়ালারা পূর্ব্বে যে লোকসানের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে চটের কল বসাতে তাহা ঘটিয়াছে। তাহার পর, কাঁচামালের (raw jute)এর উপর "ডিউটি" বসায়, ডাণ্ডীর কলওয়ালাদের সমূহ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যাহারা শরীর পাত করিয়া পাট জন্মাইতেছে, তাহারাও মারা যাইতে বসিয়াছে। ডাণ্ডীর ব্যবসায়ীদের ক্ষতি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি—

বৎসর	গ্রেট বৃটনের ব্যবহারের জন্য পাট আমদানী হইয়াছে তাহার মূল্য পাউণ্ড	হেসিয়ান এবং গানি-ব্যাগ প্রস্তুত করিয়া অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হইয়াছে তাহার মূল্য
১৯০০	৫৬৬,০০০	২,৪৩৪,০০০
১৯০৭	৭৮৪,০০০	৪,১০৯,০০০
১৯১০	৮২৯,০০০	২,২১৫,০০০

বাঙ্গালীরা যদি কলকারখানা স্থাপন করিয়া কাঁচা মাল (raw jute) চাষ এবং হেসীয়ানে পরিণত করিয়া বিদেশে রপ্তানি করিতে পারিতেন, তাহা হইলে "ডিউটী" (export duty) বসানতে কৃষক-কুলের ক্ষতির কারণ হইত না। কিন্তু বর্ত্তমান-ক্ষেত্রে তাহা হইতেছে না। কাঁচা মাল এবং কলে প্রস্তুত জিনিষের উপর সমানভাবে "ডিউটী" বসানতে লাভবান হইয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট এবং চট কলের মালিকগণ। অথচ যাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়া, এমন কি দেহপাত করিয়া, পাট জন্মাইতেছে (jute growers), সেই কৃষককুল দিন দিন ধ্বংশের পথেই যাইতেছে। ইহা-দিগকে রক্ষা করিতে হইলে, হয় কাঁচা মালের উপর (raw jute) "ডিউটী" উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, নয় একটা নির্দ্দিষ্ট মূল্য (standard price) ধরিয়া দেওয়া উচিত। কাঁচা মালের উপর "ডিউটী" উঠিয়া গেলে, আমেরিকা জাপান এবং ইউরোপের সকল প্রদেশেই বেশী মাত্রায় পাট রপ্তানি হইবে; সুতরাং এ দেশের কলওয়ালারা বেশী দাম দিয়া পাট কিনিতে বাধ্য হইবে। গবর্ণমেণ্ট মূল্য নির্দ্দেশ

করিতে পারেনও না, করিবেনও না। তাহার পর, এখন যে পরিমান জমিতে পাট চাষ হয়, তাহার অর্দ্ধেক জমিতে পাট বুনানী হইলে, কৃষকগণের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না বাংলায় যে সমস্ত পাটের কল আছে তাহার তালিকা দিতেছি।

ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা সেক্রেটারী		কলের নাম	তাঁতের সংখ্যা	মূলধন
এণ্ডারসন রাইট এণ্ড কোং	...	খড়দহ	১,৩৭০	৩৬,০০,০০০
এনড্রু ইউল এণ্ড কোং লিমিটেড	...	এলাবিয়ন	৩৪০	১২,০০,০০০
		বেলভিডিয়ার	৪০০	১৪,০০,০০০
		বজবজ	৭৪২	১৮,০০,০০০
		ক্যালিডনিয়ান	৩৫০	৯,০০,০০০
		ডেল্‌টা	৫৭০	১৪,০০,০০০
		লোথিয়ান	......	১০,০০,০০০
		ন্যাসানাল	৬১১	৩৫,০০,০০০
		নিউ সেন্ট্রেল	৫৭৯	১০,৫০,০০০
		ওরিয়েণ্ট	......	২২,৪৬,৭৫০
ব্যারি এণ্ড কোং	...	গৌরীপুর	১,২৫৫	১২,০০,০০০
বেল ডানলপ এণ্ড কোং	...	এলেকজেণ্ড্রা	৩৯৬	৬,০০,০০০
		এলাইয়েন্স	১,০০২	১৫,০০,০০০
		ক্রেপ	......	৩০,০০,০০০
		ওয়েভারলী	......	১৫,০৫,১৭০
বার্ড কোম্পানী	...	অকল্যাণ্ড	৪৬০	২০,০০,০০০
		ক্লাইভ	৮৬৪	১৬,০০,০০০
		ড্যালহাউসী	৭০৪	১৫,০০,০০০
		ল্যান্সডাউন	৮৭০	১৭,০০,০০০
		লরেন্স	৭০৫	১০,০০,০০০
		নর্থব্রুক	৫৪৪	৮,০০,০০০
		ষ্ট্যানডার্ড	৬৪০	১৪,০০,০০০
		ইউনিয়ন	১,১৫১	১২,০০,০০০
বিরলা ব্রাদার্স লিমিটেড	...	বিরলা	......	২৫,০০,০০০
বি, এন, এলিয়াস্	...	বেনগ্রামিন	......	৩৪,৯৯,৯৫০
ডানকান ব্রাদার্স এণ্ড কোং	..	এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান	২,০০০	৪৯,২০,৭০০
এফ, ডাবলু হিলজারস্ এণ্ড কোং		কিনিসন	১,২১১	১৫,০০,০০০
		নৈহাটি	৪৩০	১০,০০,০০০
জর্জ হেণ্ডার্সন	...	বালী	৬৪১	২০,০০,০০০
		বরাহনগর	১৭৪১	২৭৫,০০০ পাঃ

ম্যানেজিং এজেন্ট অথবা সেক্রেটারী	কলের নাম	তাঁতের সংখ্যা	মূলধন
জর্জ হেণ্ডার্সন	সেনচুরী	......	৬৩,০০,০০০
গ্রিলডার্স আরবুথনাট ...	গোঁদলপাড়া	৩৬০	১০,৮০,০০০
	হুগলী	৪৫৪	৪,২০,০০০
হওসন ব্রাদার্স লিমিটেড ...	হাওড়া	১,৬৬৩	২৬,২৫,০০০
	রিলায়েন্স	১,০০০	১৬,৫০,০০০
এইচ, ভি, লো এণ্ড কোং লিমিটেড	বেহার	১০০	১৪,০০,০০০
জারডিং স্কিনার এণ্ড কোং ...	কামারহাটি	১,৭১০	২৪,০০,০০০
	কাঁকনারা	১৫২১	৩০,০০,০০০
জেমসফিনলে এণ্ড কোং ...	চাপদানী	১০৭১	১৯৭,০০০ পাঃ
কেটেল ওয়েল বুলেন এণ্ড কোং ...	ফোর্ট গ্লসটার	১,৩৫০	১৪,০০,০০০
	ফোর্ট উইলিয়ম	৮০০	১৪,০০,০০০
ম্যাকিনন ম্যাকেঞ্জী এণ্ড কোং ...	ইণ্ডিয়া	১০০৬	২১,৭৫,০০০
ম্যাকনীল এণ্ড কোং ...	গ্যানজেস্	১,২৯৪	২১,০৮,০৪০
ম্যাকলিওড এণ্ড কোং ...	এমপায়ার	৪০০	৬,০০,০০০
	কেলভিন	৬০০	৭,০০,০০০
	সুরা	১৭৪	৭,০০,০০০
স্বরূপ চাঁদ হুকুম চাঁদ ...	হুকুমচাঁদ	......	১৯,৯৫,৫১৫
টমাস ডাফ এণ্ড কোং ...	শ্যামনগর	১,৫৭২	৪৫০,০০০ পাঃ
	টিটাগড়	১৭১৮	৪৫০,০০০ পাঃ
	ভিক্টোরিয়া	১০৫৩	৩০০,০০০ পাঃ

এত বড় একটা কারবার নষ্ট হয়, ইহা আমরা চাহি না। বিশেষতঃ, আজকাল বহু বাঙ্গালী এবং মাড়োয়ারীগণ সাত হইতে দশগুণ মূল্য দিয়া চটকলের "সেয়ার" কিনিয়াছেন। সম্ভবতঃ শতকরা ৭০।৮০ জন অংশীদারই ইঁহারা। এই কলগুলির লভ্য কম হইয়া গেলে, বহুদেশী লোক মারা পড়িবে; এবং যাহারা কলে খাটিয়া খায়, তাহাদের ভাত মারা যাইবে। আমাদের প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত, যাহাতে এই কলগুলির তত্ত্বাবধানের ভার আমাদের হাতে আইসে। তাহার পর যাহাতে রপ্তানি মালের উপর যে শুল্ক আদায় হইবে, তাহার কতক অংশ, পাট 'জাগের' উপযুক্ত জলাশয় খননে তাহাতে ব্যয় হয় তাহা করিতে হইবে। নতুবা, কৃষককুল ধ্বংশ হইয়া যাইবে। দরকার মনে করিলে, ইংরাজ কলের সাহায্যে চাষ আবাদ করাইবেন। কিন্তু কবির ভাষায় বলিতে গেলে, দেশবাসীকে সতর্ক করিয়া, বলিতে হয়—

Ill fares the land, to hastening ills a prey
Where wealth accumulates, and men decay.
Princes and lords may flourish, or may fade;
A breath can make them as breath has made!
But a bold peasantry, their country's pride,
When once destroyed, can never be supplied.

শ্রীরাধিকামোহন লাহিড়ী।

চুপ কর।

(পূর্ব্বের লিখিত)

চুপ কর! মিছে চিল্লেমিল্লি—গোর গোল ক'রে আপনার গলা, পরের ঘুম ভেঙ্গে লাভ কি ভাই? সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। গরীবদের সোয়াস্তিটুকু নষ্ট করে একটা অসোয়াস্তি জাগিয়ে তুলো না—অসোয়াস্তি সৃষ্টি করো না। চুপ কর, ভাই, চুপ কর।

ভাঙ্গা আসর জাঁকা'তে সময় বিশেষে সংএর কীর্ত্তন দরকার হয়। অগত্যা ছুঁচোর কীর্ত্তন মন্দ নয়। সব জানি। "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল," বুঝি। কামারা কিন্তু জ্বালাতন করে তুলেছে। আমার ভিতরে ছাই। বাহিরে দেখি কোথাও কিছু নাই। তাই বড় দুঃখে, নৈরাশ্যে বলি, চুপকর ভাই, চুপ কর।

ঘরে আগুন লেগেছে—সব পুড়ে যাচ্ছে। গরীবের জলের মালাটী, ভাঙ্গা পাথর খানি, ছেঁদা ঘড়াটী, ফুটো ঘটিটী, হাঁড়ি চুলো সব ভস্মীভূত হচ্ছে। তার আর্ত্তনাদ আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে। চোকখালি করে কত জল ঢালছে। আগুন আপন মনে দাউ দাউ করে জ্বলিতেছে। তোমরা সুখ সুপ্তির কোল হইতে লাফিয়ে উঠে,"জল, জল" বলিয়া চেঁচাচ্ছ। জলের সন্ধান কেউ করেছ কি? জল আন্‌তে ছুটেছ কি? চেঁচামেচি করে কিন্তু আকাশ পাতাল কাঁপিয়ে তুলছ। কুঁজের উপর বিষ ফোড়া হয়ে, গোর গোল করে, শুধু অসোয়াস্তি বাড়াচ্ছ। তাই বলি, চুপ কর।

দেশের কথা? সে যে বিষাদের কাহিনী, মর্ম্মের ব্যথা। সে যে শোকার্ত্তের রোদন-ধ্বনি—উৎক্রোশের হাহাকার—ঝটিকাক্ষুব্ধ অমানিশার হা হুতাশ—বিদ্যুদ্দিগ্ধ বজ্রের চীৎকার। তা' নিয়ে কি হাসি খেলা করিতে আছে? তেত্রিশ কোটী হৃদয়ের রক্তে—ছেষট্টি কোটি চক্ষের জলে তা' যে মাখা। তাতে অসংখ্য অনাহার ক্লিষ্ট, ছিন্নবাস, বিষাদ-মলিন নরনারীর আর্ত্তনাদ—প্রাণের ব্যথা সুষুপ্ত। ফেরুপালের চীৎকারে, গৃধ্রকুলের পক্ষশাটে এ বিরাট মহা-শ্মশানের বিভীষিকা বাড়াইয়া, ইহাকে ভীষণতর করাতে লাভ কি ভাই। চুপ কর, চুপ কর।

কিছুদিনের তরে নীরব হও। এই বিশাল—বিরাট শবের বক্ষে বসিয়া নিগমের নিগূঢ় নীরব সাধনায় সিদ্ধ হও। আবার মহাব্যোম আলোড়িত করিয়া, সপ্ত মহর্ষির ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া "ওঁ—ওঁ" মঙ্গল-ধ্বনি উত্থিত হউক্—প্রণব হইতে জ্যোতিঃ বিস্ফারিত হউক্—দেশ জ্যোতির্ম্ময় হউক্। প্রলয়ের আঁধার কাটিয়া যাক্। সবে বল ভাই, "তমসো মা জ্যোতির্গময়"। তাই বলি, চুপ কর।

কথার পিছনে, কাজের পশ্চাতে, মহাশক্তির মহা-আবির্ভাব না হইলে, সে কথা "শন্‌শন্, সন্‌সন্, গড়্‌গড়্, হড়্‌হড়্" প্রভৃতি অনুকার ধ্বনির ন্যায় এবং সে কাজ ছায়ার আবির্ভাব তিরোভাবের ন্যায় প্রাণহীন ও অসাড় হয়। মিছে কথায় চিড়ে ভিজে না—মিছে কাজে কয়লা ময়লা হয় না। লাভে থেকে, মুখে ব্যথা জন্মায়। তাই বলি, চুপ কর, ভাই।

শক্তি কোথা হ'তে আসে? আসে অনাদ্যনন্ত প্রকৃতির আড়াল থেকে। বাতাস আসে, উন্মুক্ত আকাশ হ'তে। জানালা দরজা বন্ধ করে, অন্ধ কূপে বসে থাক, বাতাসের অভাবে দম্ বন্ধ হবে। প্রাণের ঘরের জানালা দরজা বন্ধ ক'রে, তাকে অন্ধ-কূপে পরিণত করিলে, সেই অনাদ্যনন্ত শক্তি প্রস্রবণ হইতে শক্তিও আসিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া চলে যায়—প্রাণের ঘর পূতিগন্ধময় হয়।

যে দরজা দিয়ে আমাদের ভিতরে সেই শক্তি আসে, তাহার নাম চরিত্র। চরিত্র মানব প্রাণ ঘরের সিংহদ্বার। এই চরিত্র গড়িতে অনেক মাল মসলার দরকার। প্রথম চাই, নিবৃত্তি। কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহাদির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল ভাবকে সংযত করিয়া, তাহাদিগকে যথাযথভাবে বিনিয়োগ করাই, নিবৃত্তি। এই নিবৃত্তিই নীতির মূল ভিত্তি। পারিবারিক শাসন, সামাজিক শাসন, ধর্ম্ম শাসন, রাজ শাসন আবহমানকাল মানবের মধ্যে এই নীতির প্রতিষ্ঠা করিতে অদম্যোৎসাহে চেষ্টা করিতেছে। পশু হইতে মানবের প্রভেদ, এই নীতিতে। মানুষকে নীতিমান্ করিতেই, শিক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান বিজ্ঞান মানুষের চক্ষু ফুটাইয়া তাহার নিকট বিশ্ব প্রকৃতির ও বিশ্বাতীত প্রকৃতির নিগূঢ় মূল তত্ত্ব প্রকটিত করে। মানুষ এই মহাতত্ত্বের সন্ধান ও আস্বাদন পাইয়া তাহাকে জীবনে সুলভ করিতে আপনাকে তদনুযায়ী করিবার জন্ত সর্ব্বথা যত্নবান। সাগ্রহ যত্নের নাম, সাধনা। সাধনা, চরিত্র গঠনের জন্ত দ্বিতীয় মসলা। শিক্ষা দীক্ষা, সাধনার প্রথম সোপান; অদম্য স্বচেষ্টা, দ্বিতীয় সোপান।

আমাদের বাহ্য দৃষ্টি ক্রমে বিকশিত হয়। ভূয়োদর্শন সে ক্রম-বিকাশের মূল। সদ্যজাত শিশুর চেয়ে, ক্রমান্বয়ে বালক, কিশোর, যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের দৃষ্টি অধিকতর অধিকতম বিকাশ-প্রাপ্ত। এই ক্রম-বিকাশিত দৃষ্টি, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত হইলে, তাহাতে সন্দেহের স্থান কমিয়া যায়। বাহ্য-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে, আমাদের ভিতরে একটা দৃষ্টি ক্রমে বিকাশিত হইতে থাকে। তাহাকে অন্তর্দৃষ্টি বলে। যে চেতনার সাহায্যে বাহিরের দৃষ্টি ফুটিয়া কার্য্যকরী হয়, তাহাই অন্তর্দৃষ্টির মূল। অন্তর্দৃষ্টিই বাহিরে ব্যক্ত হইয়া বাহ্য দৃষ্টিতে পরিণত হয়। মানবে উভয়-বিধ দৃষ্টিরই বিকাশ অত্যাধিক। অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ অনন্ত-মুখী।

বিকাশিত অন্তর্দৃষ্টি, জ্ঞান বিজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে সমর্থিত হইলে, তাহাতে দ্বিধার স্থান থাকে না। তাহাই পরিণামে বিশ্বাস আখ্যা ধারণ করে। বিশ্বাস ও সাধন সাপেক্ষ সিদ্ধ-বিশ্বাস, ভগবদ্-জ্ঞানের মূল এবং চরিত্র-গঠনের তৃতীয় মসলা। বিশ্বাস-বলে মানুষ যখন ভগবানকে পায়, তখন তাহার ভিতরে এক মহতী প্রকৃতি ফুটিয়া উঠে। তখন মানুষ ভগবদ্ভক্তিতে বিভোর, বিশ্বপ্রেমে মাতোয়ারা, দয়ার অবতার, পরদুঃখ-কাতর, পরহিতৈষী, আত্মত্যাগী বৈরাগী। ব্রাহ্মণ বিধবার নিকট মৎস্যের গন্ধ যেমন অসহনীয়, তাহার নিকট আত্ম-সুখ, বিলাস-বিভ্রম-স্বার্থান্ধতা প্রভৃতিও তদ্রূপ অসহনীয় ও ও ঘৃণনীয় হয়। এই যে মানবের দেব-প্রকৃতি, ইহা চরিত্রের শেষ উপাদান।

এই সুমহৎ চরিত্রই, শক্তির আগমন-পন্থা। অনন্ত প্রকৃতির অন্তরাল হইতে, যে ঐশী-শক্তি আমাদের সাহায্যের জন্ত প্রতি নিয়ত আসিয়া,

বাতাস ও আলোর ন্যায়, দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ফিরিয়া কাঁদিয়া বেড়ায়, চরিত্র তাহার বিরাম স্থান। চরিত্রকে অবলম্বন করিয়াই তাহা মানবের ভিতরে প্রকাশিত হয়; মানুষের কথা ও কাজের ভিতরে প্রাণরূপে থাকিয়া বিশ্ব-মঙ্গল সাধন করে। অসত্যের বিনাশ জন্য, সত্যের রক্ষার নিমিত্ত—যুগে যুগে নহে—পলে পলে, তিলে তিলে এই ভগবতী শক্তি মানব সমাজে সম্ভাবিত বা অবতীর্ণ হইতেছেন। একথা খেয়াল বা কল্পনা নহে। অধ্যাত্ম-জগতের একটী প্রমাণিত সত্য।

বেদান্তের ঋষিগণ, গীতার ঋষি, বুদ্ধ, মুসা, ঈশা, মহম্মদ, নানক, কবীর, রামানন্দ, চৈতন্য প্রভৃতি দেব-দুর্লভ-চরিত্র বিশ্বাসী ভক্ত মহাপুরুষগণ এই সত্যের সাক্ষী। তাঁহাদের কথা ও কাজের ভিতরে এক জীবনময়ী শক্তি ছিল। তাই, সে সকলের সুফল হাজার হাজার বৎসর ভোগ করিয়াও মানুষ শেষ করিতে পারিতেছে না—মানব-জাতি আপনার শেষ দিনেও শেষ করিতে পারিবে না।

সে দিনও এই বঙ্গে রামমোহন, রামকৃষ্ণ, দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ যা' বলে গেছেন, করে' গেছেন, তার তুলনা মিলিতেছে না। অন্যে পরে কা কথা? ঐ দক্ষিণাবর্ত্তের তিলক,গান্ধী, সুব্রাহ্মণ্যেরও জোড়া মিলিতেছে না। তোমরা ধর্ম্মকে, নীতিকে, বিশ্বাসকে, ভক্তি-প্রেম-বৈরাগ্যকে—সকলের সমন্বয় ক্ষেত্র—চরিত্রকে বাদ দিয়ে, "ঢাল নাই, তলোয়ার নাই—নিধিরাম সর্দ্দার" সাজিয়া, দেশটাকে, ধরিয়া টানাটানি করিয়া, মহা সোর গোল বাধিয়েছ। নৌকায় নঙ্গর করিয়া দাঁড় টানিতেছ, আর চেঁচা মেচি ক'রে বল্‌ছ—"খুব চালাচ্ছি।" ফাঁকি দিয়ে 'কেউকেটা' হ'তে চেষ্টা কর্‌ছ। কিন্তু দুনিয়া তোমাদিগকে 'কেউ'ও ভাব্‌ছে না, 'কেটা'ও ভাব্‌ছে না। চাচ্ছ মহাপুরুষত্ব, আস্‌ছে অমনুষ্যত্ব। অচল নায়ে দাঁড় টান্‌তে টানতে গাচ্ছ সারি। কান ঝালা পালা হওয়াতে—লোকে এসে বক্‌সিস দিচ্ছে, কলসী দড়ি। তাই বলি "ভাই, ঢাকের বাদ্যি মিষ্টি কর—চুপকর, চুপকর।"

যে চরিত্রকে এক ঘরে বা "বয়কট" করেছ, তার আশ্রয় লইতে হবে। ঐ যে ঘর পুড়ে ছাই হচ্ছে, তা নিবাতে হ'লে জল পাবে ঐ চরিত্রে—ঐ অক্ষয় সুধা-সরোবরে। দয়া, ধর্ম্ম, ত্যাগ, হিতৈষণা, বিশ্বপ্রেম জলে সরোবর পূর্ণ। জল আনিবার উদ্যম উত্তেজনার খনিও ঐ চরিত্র। নিগমের নিগূঢ় সাধনার মন্ত্র তন্ত্র সবই চরিত্রে। নরম-পন্থী, গরম-পন্থী, বিপ্লব-পন্থী, চোর ডাকাত কত কিছুর আবির্ভাব হ'তেছে। লোকের প্রাণ ওষ্ঠাগত। একদিকে, দলাদলি, লাফালাফি, হিংসা-বিদ্বেষ, কলহের আগুন জ্বলিতেছে। অপর দিকে, চোর ডাকাতের অত্যাচারে দেশ কম্পিত। কয়েকটা বোমা ফুটায়ে, রিভল্‌বার ছুটায়ে, বিপ্লবপন্থীরা সহস্রাধিক যুবকের কারা-ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। গৃহে গৃহে কান্নার রোল উঠেছিল। অশন বসনের দুর্ম্মূল্যতায়, প্লাবন দুর্ভিক্ষে দেশ কাতর। এ সময়ে, তোমরা অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, সোর গোল করিতেছ। চেঁচামেচি শুনবে কে? তাই বলিতেছি, চুপ কর। ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছিলেন—"রেতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কল্‌কাতায় আছি"। আমাদেরও এখন সেই দশা। "জলে কুমীর, ডেঙ্গায় বাঘ", যাই কোথা বল? চরিত্র চাই, চরিত্রবান্ চাই। ওসব পন্থী মন্থী জঞ্জাল আবর্জ্জনা চাই না। চুপ কর ভাই, চুপ কর।

গণ-তন্ত্র চাও, ভাল কথা। বিরাট গণ-নারায়ণকে প্রেম প্রীতি দিতে, ভেদাভেদ ভুলিয়া পূজা করিতে, তার পদে আত্মবলিদান করিতে শিখেছ কি? তা না হলে, সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা গণদেব জাগিবেন না, প্রসন্ন হবেন না। গণ-তন্ত্র পাবে না। পেলেও রাখিতে পারিবে-না। * * * স্বায়ত্ত-শাসন জলের ছায়ায় পরিণত হইবে। চরিত্রের কদর বাড়াও। চরিত্রগুণে ভারত একদিন পুণ্যভূমি হয়েছিল। সুমহান্ চরিত্রের আধার ঋষিগণের পাদস্পর্শে এ কর্ম্মক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র হয়েছিল। পূজনীয় মহান্ চরিত্রে বিভূষিত হও। জগৎ স্বেচ্ছায় গণ-বশ্য হইয়া সমস্ত কাম্যবস্তু চরণে উপহার দিবে। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" প্রস্তুত হও। চরিত্রবলে বলীয়ান হইতে অপেক্ষা কর। সংযত হও। জাতীয় জীবন ও চরিত্রে জীবনলাভ কর। হিতবাদী, হিত-কাঙ্ক্ষীকে শ্রদ্ধা কর। এখন, চুপ কর, চুপ কর, ভাই।

৺বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মহাভারত মঞ্জরী।

দশম অধ্যায়।

দুর্দ্দশার চরম।

ঘোর অন্ধকার-রজনী, তাহাতে মহাবন। সেই বন ভেদ করিয়া পাঁচটী যুবক তাঁহাদের জননীকে লইয়া অতিদ্রুত গমন করিতেছেন। ভয় আছে, রাক্ষসের অনুচরগণ অনুসরণ করে।

ক্রমে তাঁহারা গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন। এমন সময়, সেই মহাবনে, সেই ঘোর অন্ধকারে, এক অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহাদের নিকটে আসিল। বলিল,—"মহাত্মা বিদুর ম্লেচ্ছ ভাষায় বলিয়াছিলেন,'বিবরে বাস করিলে অগ্নি অনিষ্ট করিতে পারে না।' ইহাদ্বারা বুঝিবেন, আমি তাঁহারই লোক, তাঁহারই প্রেরিত। আপনাদিগকে গঙ্গার পরপারে লইয়া যাইবার জন্ত নৌকা লইয়া আসিয়াছি।"

তখন সকলে সেই নৌকায় উঠিলেন। দেখিলেন, তাহাতে যন্ত্র পর্য্যন্ত রহিয়াছে। (১) মাঝি অতি সাবধানে তাঁহাদিগকে গঙ্গা পার করিয়া দিল। তাঁহারা আবার মহাবন ভেদ করিয়া চলিলেন। নক্ষত্রদ্বারা দিক্ নির্ণয় করিয়া ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী প্রভাত হইল, পরের দিনও অতীতপ্রায় হইল। জননীর কষ্টের সীমা নাই। তিনি শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পিপাসায় পীড়িত হইয়া "জল","জল" করিতে লাগিলেন। তখন সকল সেই মহাবনে, এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা জল অন্বেষণে নির্গত হইলেন। জলচর সারস পাখীর কলরব শুনিয়া, সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। অচিরে এক সুন্দর

(১) আদিপর্ব্ব, ১৫১—৫।

সরোবর দেখিয়া তাহাতে স্নান করিলেন, জল পান করিলেন। পরে বস্ত্র ভিজাইয়া জল লইয়া চলিলেন।

সেই বৃক্ষতলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সকলেই গভীর নিদ্রায় অচেতন। এমন সময় এক রূপলাবণ্যময়ী রাক্ষসী আসিল। সে তাঁহার সহিত মধুর ভাবে আলাপ করিতে লাগিল। এমন সময়, এক ভীষণ-দর্শন মহাবল রাক্ষস আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল। তখন দ্বিতীয় ভ্রাতা তাহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে নিহত করিলেন।

সেখানে থাকা আর নিরাপদ নয় বিবেচনায়, সকলেই আবার চলিতে লাগিলেন। সেই রাক্ষসীও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। দ্বিতীয় ভ্রাতা তাহাকে পুনঃপুনঃ তাড়াইতে লাগিলেন—মন প্রাণ দিয়া কি না, বলিতে পারি না—তথাপি সে প্রস্থান করিল না। করিবে কিরূপে? সেও যে এক অদৃশ্য-ডোরে বাঁধা পড়িয়াছে! সে তাঁহাকেই, সেই উৎপীড়ককেই—এ জগতের সকলই বিচিত্র—বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইল, তাঁহার জননীর অনুমতি চাহিতে লাগিল। শেষে তিনি মত দিলেন। সেই মহাবনে উভয়ের বিবাহ হইল। তাহার ফল, পুত্র ঘটোৎকচ।

এই রাক্ষস রাক্ষসীরা বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান করিত (২)। বিবিধ ফুলে ও ফুলের মালায় বেশভূষা করিত। তাহারা অনার্য্য-জাতীয় অসভ্য মনুষ্য মাত্র।

পঞ্চভ্রাতা জননীকে লইয়া বনে বনে চলিতে লাগিলেন। বনজাত ফল মূলে ও মৃগয়ালব্ধ মাংসে জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। শেষে, বহুদিন পরে, বহু দুঃখ কষ্টের পরে, একচক্রা নগরীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিলেন। তাঁহার গৃহের এক অংশে বাস করিতে বলিলেন। তাঁহারা তথায় ছদ্মবেশে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। আর গ্রামে গ্রামে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবনযাপন ও স্নেহময়ী জননীকে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তাই, মৃগচর্ম্ম ও বল্কল পরিয়াছেন। মস্তকে জটা হইয়াছে। শরীর ধূলায় ধূসরিত। তাঁহাদের পূর্ব্বের শোভা নাই, চিনিবার উপায় নাই। জ্ঞাতিগণের পাপাচরণে তাঁহারা এখন বনমানুষ হইয়াছেন! দুঃখ দুর্দ্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন। দুঃখই সুখের জনক। সংসারে যদি দুঃখ না থাকিত, কে সুখকে উৎপন্ন করিত? কেই বা উত্তেজনা দ্বারা মনুষ্যকে অগ্রসর করিত?

একদিন জননী ও তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র গৃহে আছেন, আর সকলে ভিক্ষায় গিয়াছেন, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণের অন্তঃপুর হইতে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। তাহা শুনিয়া জননী অস্থির হইয়া দ্রুতপদে তথায় গমন করিলেন। দেখিলেন, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী রোদন করিতেছেন। ব্রাহ্মণী বলিতেছেন,—"আজ আমিই প্রাণ দিব। লোকে নিজ সুখের জন্য স্ত্রী-পুত্র কামনা করে। যদি তাহাদের দ্বারা সে সুখ না হইল, তবে তাহাদের প্রয়োজন?" ব্রাহ্মণ বলিতেছেন,—"আজ আমিই প্রাণ দিব। এই গ্রামের দুরবস্থা দেখিয়া, উহা পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তোমাকে কত অনুরোধ করিয়াছিলাম, তুমি তোমার পৈত্রিক ভিটার মমতায় আমার

(২) বনপর্ব্ব ১১—৩৭।

কথা শুন নাই, এখন তোমার কার্য্যের ফল ভোগ কর।"

জননী ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হইয়াছে? কি হইয়াছে?" ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"এখানে এক রাক্ষস বাস করে। তাহাকে প্রত্যহ একটী মনুষ্য ও বহু অন্ন-ব্যঞ্জন খেতে দিতে হয়। আজ আমাদের পালা।" জননী উত্তর করিলেন,—"আপনাদের চিন্তা নাই। আমার পাঁচ পুত্র, তাহার একটীকে পাঠাইব।" ব্রাহ্মণ তাহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"কি! নিজ জীবনের জন্য পরের জীবন বিনষ্ট করিব! তাহা কখনও হইবে না।" তখন বৃদ্ধা বলিলেন,—"আপনাদের ভয় নাই। আমার দ্বিতীয় পুত্র সেই রাক্ষসকে অনায়াসে নিহত করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা প্রকাশ করিবেন না।" তখন ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন। দ্বিতীয় পুত্র, যথাসময়ে বহু অন্নাদি-সহ সেই রাক্ষসের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অচিরে উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। শেষে, তিনি সেই রাক্ষসকে মৃত্তিকায় নিক্ষেপ করিয়া, তাহার পৃষ্ঠদেশে জানু স্থাপন করিয়া বসিলেন। পরে, এক হস্তে তাহার মস্তকের কেশ ও অন্য হস্তে তাহার কটিদেশের দৃঢ়াবদ্ধ বস্ত্র ধারণ করিয়া, তাহাকে ধনুকের মত বক্র করিয়া নিহত করিলেন। তখন সেই নগরী নিরাপদ হইল।

দ্বিতীয় ভ্রাতা এই দুঃসাহসিক কার্য্যে যাইবেন শুনিয়া, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ জননীকে বলিলেন,—"মা, তাহাকে এইরূপ বিপদের মধ্যে পাঠান উচিত নহে। সেই ই আমাদের আশা ভরসা।" জননী উত্তর করিলেন,—"এই পরিবার আমাদিগকে আশ্রয় দিয়া উপকার করিয়াছে। এখন আমাদের প্রত্যুপকার করা একান্ত উচিত। যে ব্যক্তি কোনরূপ উপকার করে, তাহার প্রত্যুপকার অবশ্য করিবে। তাহা যে করে, সেই-ই প্রকৃত মনুষ্য। পরোপকারই সমাজ-স্থিতির মূল। কৃতঘ্ন ব্যক্তি সেই সমাজ-স্থিতির মূলে কুঠারাঘাত করে। সুরাপায়ী, চোর, এমন কি ব্রহ্মহত্যাকারীও নিষ্কৃতি পাইতে পারে, কিন্তু কৃতঘ্ন ব্যক্তির কোন ক্রমেই নিস্তার নাই। কৃতঘ্নের যশ কোথায়? স্থান কোথায়? সুখ কোথায় (৩)?"

যে রমণীরত্নের হৃদয় এত উচ্চ, এমন উদার, তাঁহার পুত্রগণের চরিত্র মহোজ্জ্বল হইবে, বিচিত্র কি? আমরা জননীগণকে নিকৃষ্ট করিয়া রাখিয়া, তাঁহাদের নিকট উৎকৃষ্ট পুত্রের প্রত্যাশা করি! কি বিড়ম্বনা! আমরা খনি খুঁড়িতে অসমর্থ, তাই চালে খুঁয়াতে মণি খুঁজি!

একাদশ অধ্যায়।

দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর।

কেবল ঊষার উদয় হইয়াছে। অরুণের আলোকে পূর্ব্ব আকাশ-প্রান্ত নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। নানা বর্ণের মেঘখণ্ড সকল ভাসিয়া বেড়াইতেছে। যেন সে পাড়ার পরীর মেয়েরা নীল পীত লোহিতাদি বর্ণের সাড়ীতে সাজিয়া রাজকন্যার বিবাহ দেখিতে বাহির হইয়াছে।

দ্রুপদনগর আজ অপূর্ব্বভাবে সজ্জিত হইয়াছে। উচ্চ তোরণ হইতে নানাবিধ বাদ্য গুরু গম্ভীরে মৃদু মধুর স্বর মিলাইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছে। কত নরনারী উত্তম বেশ ভূষা করিয়া রাজকন্যার স্বয়ম্বর দেখিতে রাজ-

(৩) শান্তিপর্ব্ব ২৭০—১১।

পুরীর দিকে চলিয়াছে। তাহা এক সুন্দর ও সুদৃঢ় দুর্গ। গভীর পরিখা ও উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। প্রাচীর মধ্যে উচ্চ তোরণ। নরনারী তাহার মধ্য দিয়া গিয়া সপ্তকক্ষ, চতুঃশালা হর্ম্ম্যমালার মধ্যস্থিত প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছে। তথায় স্বয়ম্বর-সভা নির্ম্মিত হইয়াছে। তাহা কত শিল্প চাতুর্য্য ও মণি-মাধুর্য্যে, পুষ্প পতাকায় ও পুষ্পমালায় মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে। পুষ্প গন্ধে ও অগুরু চন্দনের সৌরভে আমোদিত হইতেছে।

কত মুনি ঋষি, কত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যথা-স্থানে উপবেশন করিয়াছেন। নগরের কত লোক কত বেশভূষা করিয়া আসিতেছে, বসিতেছে। ভারতের নানা জাতির নৃপতিগণ ও গণ্য মান্য ব্যক্তিবর্গ দ্রুপদ রাজের নিমন্ত্রণ পাইয়া আসিয়াছেন। সকলেই নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিতেছেন। দ্রুপদরাজ সকলের সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছেন।

কিছুকাল পরে উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ, অগ্নিবর্ণ, মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন অতি রমণীয় বেশ ভূষায়, সভায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতেই দ্রৌপদী ধীরে ধীরে গজেন্দ্র গমনে গমন করিয়া অগ্রজ যে স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলেন। সকলে এখন নির্নিমেষ নয়নে দ্রৌপদীর অতুল শোভা দেখিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন, এমন রূপরাশি কি মানুষে সম্ভব? সকলেই দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃত, আত্মবিক্রীত হইলেন।

দ্রৌপদীর বর্ণ নীলোৎপল তুল্য, অতি মনোহর। বিম্বোষ্ঠ ঈষৎ হাসিতে বিকসিত হইয়া রহিয়াছে। চক্ষুদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় বিশাল। কেশপাশ কুঞ্চিত, কৃষ্ণবর্ণ। শরীর নাতি দীর্ঘ, নাতি ক্ষুদ্র; না কৃশ, না স্থূল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলই অতি লাবণ্যময়। যৌবন-জোয়ারে রূপ যেন উথলিয়া উঠিতেছে। সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্লাবিত করিয়া ছুটিতেছে। শরীর স্বর্ণ মাণিক্যময় রক্ত বর্ণের পট্টবস্ত্রে সুশোভিত, বিবিধ মণি মুক্তাময় স্বর্ণালঙ্কারে বিভূষিত। হাতে বরণের স্বর্ণ থালা।

ধৃষ্টদ্যুম্ন জলদ গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন,—"নৃপতিগণ যিনি এই ধনুকে গুণ দিয়া, আকাশস্থিত ঐ চক্রের ছিদ্রপথে এই এই পঞ্চশর প্রেরণ করিয়া, যন্ত্রের উপরিস্থিত লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবেন, তিনিই আমার এই প্রিয়তমা ভগিনীর পাণি গ্রহণ করিবেন।"

তৎপরে দ্রৌপদীকে বলিলেন,—"প্রিয় ভগিনি, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, যুযুৎসু, কর্ণ, শকুনি, অশ্বত্থামা, বিরাট, মদ্ররাজ শল্য, কলিঙ্গ রাজ, প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজা ভগদত্ত, পৌণ্ড্রাধিপতি, তাম্রলিপ্ত-রাজ, বঙ্গেশ্বর, কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, কৃতবর্ম্মা, জয়দ্রথ, শিশুপাল, জরাসন্ধ প্রভৃতি বিখ্যাত পুরুষগণ তোমার নিমিত্ত এই লক্ষ্যভেদ করিতে আসিয়াছেন। যিনি এই লক্ষ্য ভেদ করিবেন, তাঁহাকেই তুমি বরণ করিবে।" (৪)

---

(৪) আদিপর্ব্ব ১৮৬।১৮৭ অধ্যায়। ইঁহাদের মধ্যে বৈশ্যাদাসী পুত্র যুযুৎসু, সূতপুত্র কর্ণ, ব্রাহ্মণ অশ্বত্থামা এবং অনার্য্য জাতীয় রাজাও ছিলেন। যদি ইঁহাদের জাতি দ্রৌপদী বিবাহের অন্তরায় হইত, তাহা হইলে ধৃষ্টদ্যুম্ন ভগিনীকে ঐ কথা বলিতেন না, দ্রুপদ রাজও ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতেন না। ইহা দ্বারা আরও দেখা যায় যে, সে সময় বঙ্গ, পৌণ্ড্র বা উত্তর বঙ্গ, তাম্রলিপ্ত বা তমলুক এবং প্রাগ্‌-জ্যোতিষ বা আসাম ভিন্ন ভিন্ন চারিটী প্রবল রাজ্য ছিল। এই পৌণ্ড্রই অতঃপর পাণ্ডু নগর ও এখন পাণ্ডুয়া হইয়াছে। তাহা মালদহ জেলার মধ্যে।

সকলেই দ্রৌপদীর প্রাপ্তি-আশা প্রাণে লইয়া বহুদূর হইতে আসিয়াছেন। এখন সেই আকাশস্থিত চক্র দেখিয়া, নৃপতিগণের মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই অসামান্য লক্ষ্য দেখিয়া সকলেই নিরাশ হইলেন। কিছুকাল পরে নৃপতিগণ একে একে লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই সেই বিশাল ধনুকে গুণ দিতে পারিলেন না। ক্ষত্রিয় রাজা দুর্য্যোধন, সূতপুত্র কর্ণ, ব্রাহ্মণ তনয় অশ্বত্থামা, যবনরাজ প্রভৃতি সকলেই চেষ্টা করিলেন। (৫) কেহই কৃতকার্য্য হইলেন না। অনেকে আবার ধনুকে গুণ দিবার সময় ধনুকোৎক্ষিপ্ত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। নৃপতিগণ এইরূপে লাঞ্ছিত, লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া, আপন আপন আসনে আসিয়া বসিলেন। এখন আর কেহই অগ্রসর হন না। এইরূপে বহু সময় অতীত হইল। শেষে ব্রাহ্মণ দিগের মঞ্চ হইতে এক দীর্ঘকায়, মহাবল, সুশ্যামল, পুরুষ দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি সিংহের ন্যায় পদ বিক্ষেপে, সগর্ব্বে সেই লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন। মনোহারিণী দ্রুপদবালার উপর একবার মনোহর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। পরক্ষণেই সেই সুবিশাল ধনু হস্তে তুলিয়া লইলেন; মুহূর্ত্তমধ্যে গুণ দিলেন, টঙ্কার করিলেন, বিদ্যুৎবেগে বাণ প্রেরণ করিলেন। নিমিষের মধ্যে লক্ষ্য ভেদ করিয়া তাহাকে ভূতলে আনয়ন করিলেন।

অমনি সহস্র সহস্র রমণী-কণ্ঠ হইতে যুগপৎ উলুধ্বনি উত্থিত হইল; অতি মধুর মাঙ্গল্য বিবাহ-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। আনন্দোৎফুল্লা কৃষ্ণা অগ্রসর হইলেন; বিজয়ী পুরুষকে বরণ করিলেন, বরমাল্য তাঁহার গলায় দিলেন। দুই হৃদয় এক হইল। ব্রাহ্মণগণ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন, তাঁহাদেরই একজন এই রমণীরত্ন লাভ করিলেন।

এত মহামান্য নরপতি থাকিতে, এক বন্য ব্রাহ্মণে এই রমণীরত্ন লইয়া যাইবে, ইহা কি নৃপতি সমাজের সহ্য হয়? তখনই তাঁহারা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিজয়ী ব্রাহ্মণ বিচলিত না হইয়া, সিংহ-বিক্রমে সভা হইতে বহির্গত হইলেন। আর দ্রৌপদী? তখনই তিনি সেই জাতি-কুল-অপরিজ্ঞাত, অপরিচিত পুরুষের অনুসরণ করিলেন। জাতিকুল পরিচয়ের কি প্রয়োজন? তাঁহার প্রমাণ ত পূর্ব্বেই পাইয়াছেন! তিনি আজীবন যে ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগমন করিয়াছেন, সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে, বন জঙ্গলে অকাতরে অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা আজ হইতেই আরম্ভ হইল। পাঠক, অগ্রসর হউন। এই রমণীরত্নের বিচিত্র জীবনালেখ্য ক্রমেই উন্মুক্ত দেখিতে পাইবেন, আর অপার আনন্দে ভাসিবেন।

এখন নিরাশ নৃপতিগণ এই বিজয়ী ব্রাহ্মণের সহিত ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। একমাত্র তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। নৃপতিগণ পরাজিত হইতে লাগিলেন; লাঞ্ছিত, অপমানিত হইতে লাগিলেন; আবার সমবেত হইয়া আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

---

(৫) আদিপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়। ইঁহাদের জাতি যদি বিবাহের অন্তরায় হইত, তাহা হইলে ইঁহাদিগকে লক্ষ্য-ভেদের জন্য চেষ্টা করিতে নিশ্চয়ই নিষেধ করা হইত। সে সময়কার বিবাহ-প্রথা সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৩ম অধ্যায়ে "বিবাহ" দ্রষ্টব্য।

তখন কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"এই ব্রাহ্মণ তনয় ধর্ম্মানুসারে দ্রৌপদীকে পাইয়াছেন। আপনাদের যুদ্ধ করা নিতান্ত অন্যায়।" তখন সকলে অবনত মস্তকে প্রস্থান করিলেন।

এখন দুই ভাই দ্রৌপদীকে লইয়া সেই নগরীর বাহিরে এক কুম্ভকারের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহাদের জননী ছিলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা প্রাঙ্গন হইতেই বলিলেন,—"মা, মা, দেখ, ভিক্ষায় আজ কি পাইয়াছি!" জননী অমনি গৃহের মধ্যে হইতেই উত্তর করিলেন,—"যাহা পাইয়াছ, সকলে মিলিয়া ভোগ কর।" বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন। তখন সকল দেখিয়া শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন।

কিছুকাল পরেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আসিলেন। জননী তাঁহাকে বলিলেন,—"আমি না দেখিয়া প্রমাদ বশতঃ বলিয়াছি, 'তোমরা সকলে মিলিয়া ভোগ কর।' এখন যাহাতে আমার কথা মিথ্যা না হয়, দ্রৌপদীর ও পাপ না হয়, তাহা তুমি কর (৬)।

পরে অনেক তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল, সকল ভ্রাতাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবেন।

এমন সময় কৃষ্ণ বলরাম তথায় আসিলেন। আত্ম-পরিচয় দিলেন। কৃষ্ণের সহিত ইঁহাদের এই প্রথম সাক্ষাৎ। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ—কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,"তুমি আমাদিগকে কিরূপে চিনিলে!" কৃষ্ণ হাসিয়া উত্তর করিলেন, "ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি কি গোপন থাকে? পৃথিবীতে আপনারা ব্যতীত এমন বিক্রম আর কে দেখাইতে পারে?" কিছুকাল কথোপকথনের পর কৃষ্ণ বলিলেন,—"আমরা এথানে বিলম্ব করিলে সকলে আপনাদিগকে চিনিতে পারিবে।" তখন কৃষ্ণ ও বলরাম তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া স্বীয় শিবিরে গমন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে দ্রুপদ রাজের পুরোহিত আসিলেন। তিনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠকে বলিলেন,—"দ্রৌপদী কাহার গলায় মালা দিয়াছেন, তাহা জানিতে না পারায় দ্রুপদ-রাজ অত্যন্ত চিন্তিত আছেন।" তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"দ্রুপদ-রাজ পণ করিয়াছিলেন, যিনিই এই লক্ষ্য ভেদ করিবেন, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আমার তৃতীয় ভ্রাতা লক্ষ্য ভেদ করিয়া কন্যা পাইয়াছে। এখন জাত, কুল, শীল বা গোত্র দিয়া তাঁহার প্রয়োজন (৭)?"

তৎপরে রাজদূত আসিয়া সকলকে রাজপুরীতে লইয়া গেল। দ্রুপদ-রাজ তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সকলের পরিচয় দিলেন। পরে বলিলেন,—"পুরোচন আমাদিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিতে চাহিয়াছিল। তাই ভীম তাহার শয়নকক্ষায় সর্ব্বাগ্রে অগ্নি প্রদান করে। পরে আমরা পাঁচ ভাই, মাকে লইয়া সুরঙ্গ দিয়া মহাবনে প্রবেশ করি। সেই রজনীতে এক নিষাদী পঞ্চপুত্র সহ মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া, সেই গৃহের এক পার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিল। পর প্রভাতে, তাহাদেরই দগ্ধদেহ বাহির হইয়াছিল। তাহাতে অন্ধরাজ ভাবিয়াছিলেন, আমরাই দগ্ধ হইয়াছি। আমরা তথা হইতে পলায়ন করিয়া একচক্রা নগরীতে বাস

(৬) আদিপর্ব্ব ১৯১—৪।৫।

(৭) আদিপর্ব্ব ১৯৩—২২।২৩।২৪।

করিতাম। সেখান হইতে এখানে আসিয়া অর্জ্জুন লক্ষ্য-ভেদ করিয়াছে।"

সকল শুনিয়া দ্রুপদ-রাজের আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তখনই সে সংবাদ অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। সমুদয় অন্তঃপুর আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল।

যুধিষ্ঠির তখন দ্রুপদরাজকে বলিলেন,—"মাতৃ-আজ্ঞা, আমরা পাঁচ ভাই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিব।" তাহা শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "আপনি এমন ধার্ম্মিক হইয়া কিরূপে এইরূপ অন্যায় কথা বলিলেন?" যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন,—"মাতাই পরমগুরু। তাঁহার আজ্ঞা পালনই ধর্ম্ম। বিশেষ, পূর্ব্বে সাতজন ঋষি তাপসী জটীলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার অন্য দশ ভ্রাতায় এক মুনি-তনয়ার পাণি গ্রহণ করিয়াছিলেন (৮)। এমন সময় বেদব্যাস আসিলেন। তিনিও যুধিষ্ঠিরের মত সমর্থন করিলেন (৯)

এখন মহাসমারোহে এক এক দিন, এক এক ভ্রাতার সহিত একই কন্যার বিবাহ হইতে লাগিল। এইরূপে পাঁচ দিনে সে বিবাহ সমাপ্ত হইল। দ্রুপদরাজ বহু ধনরত্ন ও বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী যৌতুক দিলেন। কৃষ্ণও বহু স্বর্ণ ও নানাবিধ দ্রব্যাদি উপহার পাঠাইলেন। এইরূপে পাণ্ডবেরা অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া, শেষে প্রবল নরপতির আশ্রয় পাইলেন। পোত, সমুদ্রের উত্তালতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, শেষে এক অতুলনীয় রত্নসহ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আদিপর্ব্ব সমাপ্ত।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

(৮) আদিপর্ব্ব ১৯৬—১৪।১৫।১৬।

(৯) তিব্বৎ দেশে সকল ভ্রাতায় এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে (Tibet, the mysterious ; Three years in Tibet)। নেপালে এই প্রথা প্রচলিত আছে (Modern Review, 1916)। হিমালয়ের পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে এইরূপ বিবাহ চলিতেছে (R. C. Dutt's Civilization in Ancient India, II—140)। নায়ার রমণীদের মধ্যে এক স্ত্রীর বহু পতি গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। (ভারতী ১৩২৩। পৃঃ ৫৩১) এখনও পঞ্জাবের সেওরাজ, লাহল, স্পিতি ও কুলু অঞ্চলে সকল ভ্রাতায় একই কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে। ভারতের অন্যান্য স্থানেও এই প্রথা এখনও আছে। Mayne's Hindu Law and Usage, 7th edition, page 74, foot-note (c) and paras 62 and 63.

সঙ্কণিকা।

পারলৌকিক। বছরটা একেবারেই দুর্ব্বৎসর। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের নিজস্ব শোক তাপ আজ যেন বাঙ্গলাময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। আরম্ভ যে প্রকারই হোক্, শেষের দিকে, বৎসরটা যে রকম নিদারুণভাবে আঘাতের পর আঘাত দিতেছে, বাঙ্গালী একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক মাসের মধ্যে বাঙ্গলা মাথা মাথা তিনটী রত্ন হারাইয়াছে; তাঁহাদের শোকে বঙ্গমাতা আজ আকুল। এত অল্প সময়ের মধ্যে বুঝিবা তাঁহাকে এককালে তাঁহার জীর্ণ অঞ্চলের এতগুলি নিধি হারাইতে হয় নাই। দরিদ্রের ধন, তুলনা-রহিত তাঁহার এই সন্তান ত্রয়ের প্রত্যেকেই, যে কোন দেশে জন্ম ধারণ করিলে,

তাহা গুরুগৌরবে মহিমান্বিত হইত। তবে তাঁহার সন্তোষ, তাঁহার অঙ্কে এই রত্নত্রয় শোভিত হইয়াছিল। এখন বছরের যে ক'টা দিন বাকী আছে, নিত্য শঙ্কিত থাকিতে হইবে; ভালোয় ভালোয় কাটিলে হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচি।

*　　　*　　　*

৺ রাসবিহারী ঘোষ।

জন্ম—তোরকোণা, জিলা বর্দ্ধমান, ১০ই পৌষ, ১২৫২ সন (ইংরাজী ২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৪৫) মঙ্গলবার।
মৃত্যু—আলিপুর, কলিকাতা, ১৫ই ফাল্গুন, ১৩২৭ সন (ইংরাজী ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২১), রবিবার, রাত্রি ১ঘটিকা।

যেমন বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, গবেষণায় ও পাণ্ডিত্যে যেমন ধর্ম্মে,কর্ম্মে,অর্থে, নির্ভিকতায়, তিনি তুলনা-রহিত ছিলেন,—স্বদেশ-বৎসলতা, ও জাতীয়-প্রীতিতেও তেমনি তিনি অনুপমেয়। তাঁহার ধন, জন, ঐশ্বর্য্য, সমৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা, সাধনা ও সিদ্ধি সকলই তাঁহার স্বাবলম্বনের সাক্ষী; সকলই তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ মেধা, একান্ত নিষ্ঠা এবং দুর্জ্জয় সাহসের ফল। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া, প্রতিষ্ঠাবান হইয়া, সুদীর্ঘকাল তিনি আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা, ভক্তি, অর্ঘ্য, ও পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন। আজ তাঁহার জীবন-গত অমোঘ শক্তি দেশ-ময় পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িতেছে; খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইয়া শতধা সে শক্তি ঘটে ঘটে উদ্দীপনায় উদ্বোধন করিতেছে। সে শক্তি অপ্রতিহত হউক; চির-প্রতিষ্ঠিত হউক্।

বর্দ্ধমান জেলায় তোরকোণা ছিল এক অজানা অচেনা গণ্ডগ্রাম। এই মহাপুরুষের জন্মস্থান বলিয়া আজ সে পুণ্যতীর্থ। এই ক্ষুদ্র গ্রামখানিকে উন্নতির পথে, মঙ্গলের পথে, সমৃদ্ধির পথে লইয়া যাইবার জন্য রাসবিহারী কত উপায় অবলম্বন, কত অর্থব্যয়, না করিয়াছেন। উত্তর উত্তর জীবনে পদমর্য্যাদা অর্জ্জন, নিত্য উন্নতি হইতে উন্নততর প্রতিষ্ঠা লাভ, তাঁহাকে কখন এত 'বড়' (?) করিয়া তুলিতে পারে নাই, যে তিনি তাঁহার জন্মস্থানের প্রতি মমতা হারাইয়া ফেলিবেন। আশৈশব, আমরণ সে মায়া যে অক্ষুন্ন ছিল, তাঁহার উইল-পত্র তাহার প্রত্যক্ষ নিদর্শন। কেবল যে তিনি তাঁহার ত্যক্ত বিত্তের আংশিক ত্যাগী করিয়াছেন এই গ্রামটীকে, তাহা নয়। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর, তাঁহার দেহখানিকে তাঁহার এই প্রিয়তম জন্মস্থানে বহণ করিয়া লইয়া, সৎকৃত ও ভস্মাবশেষ সেই পুণ্যভূমিতে প্রথিত হয়। দেশ মাতৃকার প্রতি এ প্রকার দরদী কয়টী মিলে?

রাসবিহারী ৺ জগবন্ধু ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবে বাঁকুড়ায় শিক্ষালাভ করিয়া, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে, ডিসেম্বর মাসে, দ্বিতীয় বিভাগে, প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ-লাভ করিয়া, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, এফ্-এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ-স্থান অধিকার করেন। বি-এ পরীক্ষায়ও সেইরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়া, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে, বাঙ্গালী-সন্তান, তিনিই সর্ব্বপ্রথম 'অনারের'-সহিত ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়া এম-এ উপাধি লাভ করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে, বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ঐ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, মহামান্য হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-দ্বারিত

ব্যবহার-শাস্ত্রের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় তিনি বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে, রাসবিহারী ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার এই বক্তৃতাগুলি অদ্যাপিও ভারতে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে; সেই বক্তৃতা-মূলক গ্রন্থ, ব্যবহার-শাস্ত্রের অক্ষয় কীর্ত্তি। তখনও ভারতে 'সম্পত্তি হস্তান্তর বিধি' (Transfer of Property Act) প্রচলিত হয় নাই। সেই আইন প্রণয়নে, শ্রীযুক্ত ডাক্তার হুইটলি ষ্টোকস্ (Dr. Whitelay Stokes) এই গ্রন্থ হইতে কি পর্য্যন্ত সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রণীত বিধি-গ্রন্থের (Anglo-Indian Codes) ভূমিকায় স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ব্যবহার-শাস্ত্র জিনিষটাই রুক্ষ; সে বিষয়ে বিচার-মূলক গ্রন্থে প্রাঞ্জলতা আশা করা যায় না। তাহার উপরে, বাঙ্গালীর পক্ষে বিদেশী ভাষায় এই প্রকার কর্কশ বিষয়ে আলোচনা করিতে গিয়া, তাহাতে সরসতা দান করা কত যে কষ্টকর, একটু বিবেচনা করিলেই বোঝা যায়। কিন্তু 'বন্ধক দায়' (law of mortgage) বিষয়ে রাসবিহারীর এই গ্রন্থ উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য, জলের মত তরল, অথচ যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য্যপূর্ণ-ভাষায় লিখিত। এই গ্রন্থ তাঁহার কেবল যে গভীর গবেষণার প্রমাণ দেয় তাহা নয়, তাঁহার সাহিত্যের—বিদেশীয় ইংরাজী সাহিত্যের—উপর অসামান্য অধিকারের নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান।

ওকালতি আরম্ভ করিয়া এ হেন ব্যক্তি যে অনতিবিলম্বেই ব্যবসায় শীর্ষস্থান অধিকার করিবেন, আশ্চর্য্যের নয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে, তিনি বি-এল-এ পরীক্ষক নিযুক্ত এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে (fellow) নির্ব্বাচিত হন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে, তিনি ডি-এল্ উপাধি লাভ করেন, এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে, সিন্‌ডিকেটের সভ্য হন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে, ডাক্তার রাসবিহারী বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভার সভ্যপদ লাভ করেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, সার রমেশচন্দ্র বড়লাট সভার সভ্য-পদ ত্যাগ করিলে, রাসবিহারী সেই শূন্য স্থানে নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে, এই পদে পুনর্নির্ব্বাচিত হন। ১৮৯৩ হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ, এই দুই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবহার-শাস্ত্র বিভাগের (faculty of law) সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি C.I.E. উপাধি লাভ করেন। ব্যবহার-শাস্ত্রে তিনি দুইটী আইন প্রণয়নের সাহায্য করিয়া অমর ও বহুলোকের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। প্রথমটীর ফলে, দায়ীকের বিষয় নিলামে বিক্রয় হইলেও, একমাসের মধ্যে টাকা দিলে, সে সম্পত্তি ফেরত পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়টীর দ্বারা, দায়ভাগ কালে, ভদ্রাসন বসতবাটী যাহাতে বংশের আয়ত্ত হইতে সহসা চলিয়া না যায়, সে বিষয়ে যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। এই দুইটী ব্যবস্থা দ্বারা তাঁহার মহানুভবতা ও বংশ-গৌরবের প্রতি প্রীতি সপ্রমাণ হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও রাসবিহারীর কৃতিত্ব অসাধারণ। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে, জাতীয় মহাসমিতির অভ্যর্থনা-সভার সভাপতি রূপে তাঁহার অভিভাষণ তাঁহার গৌরবকে চিরদিন অক্ষুণ্ণ রাখিবে। সেই বক্তৃতার অব্যবহিত পরেই, তিনি ভারত-ব্যবস্থাপক-সভায়, জনসাধারণের দারুণ দুঃখ তাপ জ্ঞাপন করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া, পড়িয়া, কেহ অবিচলিত থাকিতে পারে নাই। দেওয়ানী কার্য্য-বিধি (Civil Procedure Code) আইন সংশোধিত করিতে

তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত, বর্ত্তমান আইনটী, বলিতে গেলে ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেন কিন্স ও রাসবিহারী—এই দুইজনের কীর্ত্তি। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে,সরকার বাহাদুর যখন সিডিসন-সভা নিবারণ-কল্পে আইন প্রণয়ন করিবার মনস্থ করেন, তিনি তাহার প্রতিবাদে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ১লা নভেম্বর, তারিখে যে বক্তৃতা করেন, কি আইন জ্ঞানে, কি স্বদেশ-প্রীতিতে, কি ভাষার ওজস্বিতায়, কি নির্ভীকতায়, তুলনা রহিত।

যে কোন কাজের প্রতিবাদ, যে কোন শুভ কর্ম্মের জন্ম উপদেশ কি সাহায্য যখন প্রয়োজন হইয়াছে, রাসবিহারীর দ্বারস্থ হইয়া কেহ কখন বঞ্চিত হইয়া ফিরে নাই। আমরা সিভিল রাইটস্ কমিটির অন্যতম সম্পাদক-রূপে তাঁহার নেতৃত্বে,—তিনি এই কমিটির সভাপতি ছিলেন,—কার্য্য করিয়া যে প্রকার উপকৃত ও উৎসাহিত হইয়াছি, তাহা জীবনে ভুলিবার নয়।

জাতীয়-মর্য্যাদা রক্ষা করিবার তাঁহার আজীবন সাধনা, সকলের অনুকরণীয়। তিনি ইউরোপের প্রায় সকল দেশপ্রদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। একদিনের তরেও কিন্তু জাতীয় বিশেষত্ব বর্জ্জন করেন নাই। যে চোগা চাপকানে জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, তাঁহার পর তৃতীয় পুরুষের আমরাও তাঁহার অন্তিম কাল পর্য্যন্ত, তাহা একদিনের জন্যও পরিহার করিতে দেখি নাই। অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক হইয়াও, তাঁহার এই জাতীয়তা গৌরব ও মর্য্যাদা রক্ষা, অতীব প্রশংসনীয়।

বহুকাল ধরিয়া তিনি বাতব্যাধি রোগ-গ্রস্ত ছিলেন। তাঁহার পরিবার বলিতে, কিছুই ছিল না, বলিলেই হয়। তথাপি, তাঁহাকে কতদিন আদালতে দেখিয়াছি, ভৃত্যেরা বহন করিয়া এজলাস হইতে এজলাসে লইয়া চলিয়াছে। কাহার জন্য এত কষ্ট স্বীকার? নিজের খাওয়া পরার উপযুক্ত অর্থের সঙ্গতি, তিনি বহুদিন পূর্ব্বেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তবে, এত কষ্ট সহ্য করিলেন কেন? আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ, তাঁহার প্রাণপ্রিয় ক্ষুদ্র জন্মস্থান, তাঁহার উইল-পত্র, এ গূঢ় প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর দিতেছে।

কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বড়ই কঠোর প্রকৃতি ছিল। আমরাও সে ব্যবহার-লাভে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু, তাহার বাহ্যিক কর্কশতার অন্তরে ছিল, সুরসাল মমতা। সে দিন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র-নাথ দত্ত মহাশয় জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদে শোক-সভায় বলিয়াছিলেন,—রাসবিহারীর প্রকৃতি ছিল নারিকেলের মত। বাহিরে ছোবড়া ও কঠিন আবরণ, ভিতরে সুমিষ্ট খাদ্য ও তৃপ্তিকর পানীয়। কথাটা বড়ই ঠিক্।

হীরেন্দ্র বাবুর কথা বলিতে মনে পড়িল। রাসবিহারীর উইল-পত্রে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদের যে অভাবনীয় ব্যবস্থা রহিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া অনেকের মুখেই শোনা যাইতেছিল,—এ সৎকার্য্যের উদ্যোক্তা হীরেন্দ্রনাথ, স্বয়ং; তিনিই বুঝাইয়া পড়াইয়া, রাসবিহারীকে দিয়া, এই ব্যবস্থা করাইয়া লইয়াছেন। রাসবিহারী যে জাতীয়-শিক্ষার জন্য বিশেষ কোন উদ্দীপনা ও উত্তেজনার অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা, ইহার প্রতিষ্ঠার দিন, টাউন হলের মহতী সভার সভাপতি-রূপে এবং মাদ্রাজে এই বিষয়ে,

তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া, বিশ্বাস হয়না। সে যাহা হৌক্, হীরেন্দ্র বাবু সেদিন নিজেই এ বিষয়ে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই এ কিম্বদন্তীর অসত্যতা সপ্রমাণ হয়। তিনি বলিয়াছেন,—রাসবিহারীর আদি উইল, তাঁহার মৃত্যুর ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়। তখন হইতে জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ ছিল,তাঁহার চরম উত্তরাধিকারী। তাহার পর, নানাকারণে ৪।৫ বার উইলখানি পরিবর্ত্তিত করিতে হয়; কিন্তু, উইলের আর সকল ব্যবস্থা যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ যেমন প্রথমে ছিল, শেষ উইল পর্য্যন্ত, রাসবিহারী সে ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করেন নাই।

সার রাসবিহারী জীবনব্যাপী পরিশ্রমে যাহা কিছু অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য অকাতরে দান করিয়া গিয়াছেন। পৈত্রিক সম্পত্তি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণকে দান করিয়াছেন। তোড়কোণা গ্রামে পদ্মপুকুর নামক একটী পুষ্করিণী, মাতার নামে খনন করাইয়া ছিলেন; মাতৃদেবী ও পিতৃদেবের নামে তথায় দুইটী শিব প্রতিষ্ঠা করেন। স্থানীয় বসত বাটীর বৈঠকখানা, পুষ্করিণী ও পঞ্চাশ হাজার টাকা, শিবালয়ের উদ্দেশ্যে দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামে নিজের পিতৃদেবের স্মরণার্থে তাঁহার নামে একটী স্কুল স্থাপন করিয়া, উহার ব্যয় বহন করিয়া আসিতেছিলেন; তিনি তাঁহার সুবৃহৎ লাইব্রেরী এবং নগদ দেড় লক্ষ টাকা এই স্কুলে দান করিয়া গিয়াছেন; পূর্ব্বে আরও পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পূর্ব্বে বিজ্ঞান-চর্চ্চার্থে প্রায় ২১ লক্ষ টাকা দান করেন; বিভিন্ন দেশের শিক্ষা-প্রণালী বিষয়ে, এদেশের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য, আরও আড়াই লক্ষ টাকা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দান করিয়াছেন; তাহার আয় হইতে প্রতিবৎসরে তিন জন করিয়া ভ্রমণকারী ফেলো নিয়োগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজন ও অনুজীবিগণকে যথোপযুক্ত দান করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ্‌কে দিয়া গিয়াছেন। এই অবশিষ্ট সম্পত্তির মূল্য দশলক্ষ টাকার অধিক হইতে পারে; কোম্পানির কাগজ ও শেয়ারের মূল্য হ্রাস না হইলে, উহার মূল্য ১৫ লক্ষ টাকার ও অধিক হইত!

আর ভাষা? জীবনে জাতীয়তা রক্ষা করিতে যিনি এত সচেষ্ট ছিলেন, জাতীয় ভাষার উপরে তাঁহার কি প্রকার সদ্ভাব ছিল, তাহার একটী নিদর্শন দিয়া সন্দর্ভ শেষ করিতেছি। এই তথ্যটির জন্যও আমরা হীরেন্দ্র বাবুর নিকটে ঋণী। যখন রাসবিহারী, হীরেন্দ্র বাবুকে ডাকাইয়া, উইল প্রস্তুত করিতে আদেশ করেন, হীরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে বলেন, তাঁহার আপিসের সাধারণ ব্যবহার অনুসারে, ইংরাজীতে উইল করিতে পাইলেই, তিনি সুবিধা-বোধ করিবেন। রাসবিহারী তাহাতে ঈষৎ বিচলিত হইয়া বলেন,—"কি 'আমার' উইল ইংরাজীতে?—কখনই নয়। বাঙ্গলাতেই আমার উইল করিতে হইবে।" উইল বাঙ্গলাতেই হইল। তাঁহার ন্যায় ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত ব্যক্তির পক্ষে, এ উক্তির মর্ম্ম বিষয়ে আর কিছু মন্তব্য করিতে ইচ্ছা করি না।

* * *

কর্ণেল সুরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

জন্ম—হুগলি জেলার অন্তর্গত বামুনপাড়া গ্রামে মাতুলালয়ে, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে।

মৃত্যু—কলিকাতা স্বগৃহে, ২৬শে ফাল্গুন, ইংরাজী ১০ই মার্চ্চ, বৃহস্পতিবার, পূর্ব্বাহ্ণ সাড়ে আট ঘটিকা।

কায়স্থ-সমাজে সর্ব্বাধিকারী বংশ-মর্য্যাদায় সুদীর্ঘকাল শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে। সেই বংশের মধ্যে আবার স্বর্গীয় সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের যশমান বহুদিন প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার 'ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ' হইয়াছিল। ইঁহার সকল পুত্রগণই দেশের ও দশের সেবায় প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন। এই সুনামধন্য পুরুষের চতুর্থ পুত্র, সুরেশপ্রসাদ। রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগর গ্রামে, শৈশবে পাঠশালায় শিক্ষালাভ করিয়া, কলিকাতা হেয়ার স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাহার পর, কিছুদিন প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রপলিটান কলেজ হইতে বি-এ পাশ করেন। তাঁহার মাতৃদেবীর ইচ্ছানুযায়ী সুরেশপ্রসাদ এম-ডি উপাধি পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং মেডিকাল কলেজের প্রতি পরীক্ষায় পারিতোষিক ও পদক অর্জ্জন করেন। তিনি চিকিৎসার ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার 'হাতযশ' চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। অস্ত্র-চিকিৎসায় তাহার প্রতিপত্তি ও খ্যাতি অপার। জন-সাধারণের উন্নতি-কল্পে সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার সহানুভূতি ও সাহচর্য্য লাভ করা যাইত। বাঙ্গালী-আর্ত্ত-সেবা-সম্প্রদায় (Bengal Ambulance Corps) প্রতিষ্ঠা, তাঁহারই চিন্তা-প্রসূত। তাহার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সিদ্ধি লাভ করিয়া বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাকে গৌরবে মণ্ডিত করিয়াছেন। তাহার পর, বাঙ্গালী পল্টন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বেচ্ছা-সৈনিক-দল সংগঠন বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা ও উদ্যোগ বিশ্ববিশ্রুত। তিনি স্বদেশ-গৌরব বেলগাছিয়া মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা এবং জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির সভাপতি ছিলেন। বহুকাল তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য ছিলেন এবং এককালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাহার প্রতিনিধিরূপে সভ্য মনোনীত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন। লর্ড চেমস্‌ফোর্ড কলিকাতায় আসিবার পর, তাহাকে C. I. E. উপাধিতে ভূষিত করেন ও তাহার বৎসর দুই পরে, তাহাকে ইণ্ডিয়ান-মেডিকেল-সার্ভিসের মাননীয় লেপ্টনান্ট-কর্ণেল পদ প্রদান করা হয়।

আট ভাইয়ের মধ্যে পাঁচটী, একমাত্র অপোগণ্ড পুত্র, তিনটী কন্যা ও সহধর্ম্মিণীকে ও দেশবাসীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, অসময়ে, অক্লান্ত-কর্ম্মী স্বাধীন-চেতা সুরেশপ্রসাদ মাত্র চুয়ান্ন বৎসর বয়ঃক্রমে ইহলীলা সম্বরণ করিলেন। উদরের প্রদাহে বিগত তিনমাস কাল তিনি ভুগিতেছিলেন। বলা বাহুল্য, চিকিৎসা-শাস্ত্রে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদের সকলেই এই মহার্ঘ প্রাণটীকে রক্ষা করিতে কোন প্রকার চেষ্টার ত্রুটী করেন নাই। সকলই ব্যর্থ হইল? মৃত্যুর একঘণ্টা পূর্ব্বে তিনি একখানি পত্র লিখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন; তাহা পারেন নাই। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। ধীরে ধীরে জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।—
'একে একে নিভিছে দেউটী'

* * *

৺ নলিনাক্ষ বসু।

কৃষ্ণনগর বলিলে যেমন মনে হয়, সরভাজা

স্বর-পুরিয়া, আর মনে হইত, মনোমোহন ঘোষ; চট্টগ্রাম বলিলে যেমন মনে হইত, সাধু যাত্রামোহন ও লঙ্কার ঝাল। বরিশাল বলিলে যেমন মনে হয়, মুসুরির ডাল ও ভক্ত-প্রেমিক অশ্বিনীকুমার; বর্দ্ধমান বলিলে যেমন রসনাতৃপ্তকারী সীতাভোগ, মিহিদানা মনে হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় স্বদেশ-বৎসল-নলিনাক্ষের নাম প্রবীন; তাহা ভুলিতে পারা আমাদের অসম্ভব।

বর্দ্ধমানের স্বনাম-প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবি নলিনাক্ষ বসু মহাশয় বিগত ৭ই চৈত্র রবিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময়ে, ৭৭ বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া ইহাঁন নানাভাবে অক্লান্তভাবে নিরপেক্ষতার সহিত দেশের ও দশের সেবা করিয়া আসিতেছিলেন। পশ্চিম বঙ্গে জাতীয় জীবনের প্রায় সাড়া পাওয়া যাইত না বলিলে হয়; যেটুকু প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সেখানে হইয়াছে তাহা কেবল নলিনাক্ষ-প্রমুখ দেশনায়কবর্গের নিঃস্বার্থ চেষ্টায়। তাই এহেন লোকের অভাবে ভাবিতে হয়, দেশের কি হইবে?

নলিনাক্ষের জীবনগত সাধনা বর্ত্তমানযুগে উদ্দীপনা আনিতে পারিবে, আমাদের বিশ্বাস। প্রথম জীবনে তিনি বাঙ্গালী-সুলভ ব্যবসা—কেরাণীগিরি—গ্রহণ করেন। তাহার আত্মোন্নতির আশৈশব অদম্য উৎসাহ তাঁহাকে এই ব্যবসা ছাড়িয়া পুলিসের সব ইনস্পেক্টার সরকারী চাকরী গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। তখন তিনি হাণ্টার সাহেবের বাঙ্গলার বিবরণ (Statistical Accounts of Bengal) সংগ্রহে সাহায্য করিতেন। স্বাধীন-চিত্ত নলিনাক্ষের পক্ষে কিন্তু দাসত্বের বন্ধন বেশীদিন সহ্য করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। অনতিবিলম্বে, তিনি স্বাধীন-ব্যবসা ওকালতীর জন্য উপযুক্ততা অর্জ্জন করিয়া, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আলিপুরের আদালতে বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন। বৎসর কাল অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই, তিনি বর্দ্ধমানে গিয়া বসিলেন এবং তথায় দেহরক্ষার সপ্তাহকাল পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত একাদিক্রমে ওকালতী করিয়াছেন। এ বিষয়ে তাঁহার সৎনাম ও প্রতিষ্ঠা বলিয়া দিতে হয় না; তাহা সর্ব্বজন-বিদিত। স্বীয় ক্ষমতা কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও অক্লান্ত শ্রমের ফলে, তিনি বর্দ্ধমানের শ্রেষ্ঠতম উকিলরূপে বহুকাল হইতে সুপরিচিত; হাকিম, মক্কেল ও সহযোগী সকলের শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তির পাত্র। ইং ১৮৭০ সনে, বর্দ্ধমান মিউনিসিপালিটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি তিনি ইহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। পঞ্চাদশ বর্ষকাল এই মিউনিসিপালিটি তাঁহার একচ্ছত্র অধ্যক্ষতার পরিচালিত হয়; সেই কালে ইহা বঙ্গদেশে আদর্শ ভাবে পরিচালিত মিউনিসিপালিটি বলিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, সরকার সফলতার নিদর্শন-স্বরূপ তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি ভূষিত করেন। বঙ্গীয়-ব্যবস্থাপক-সভায় তিনি বার বার তিন বার সাধারণ-কর্ত্তৃক সদস্যরূপে মনোনীত হন। মৃত্যুকালেও সদস্য ছিলেন। নানা বিষয়ে সরকারী আমলাবর্গের সহিত তাঁহাকে নানা প্রকার আদান প্রদান ব্যবহার করিতে হইত; কিন্তু, তাহাতে তাহার স্বদেশ-বৎসলতা একদিনের তরেও ক্ষুণ্ণ হয় নাই; একদিনের তরেও তিনি তাঁহার স্বাধীনতা ও স্বাধীনচিত্ততাকে খর্ব্ব হইতে দেন নাই। যাহা ন্যায়, যাহা সত্য, যাহা কর্ত্তব্য, যাহা প্রাপ্য, এবং সর্ব্বোপরি, জনসাধারণের যাহা লভ্য বলিয়া তিনি বিবেচনা করিয়াছেন, তাহা অর্জ্জন

করিতে আজীবন অদম্য উৎসাহে সংগ্রাম করিতে ক্রটী করেন নাই। এই প্রকার লোকের তিরোধানে বঙ্গদেশ যে কতদূর ক্ষতিগ্রস্থ হইল, তাহা গণনা করা সুকঠিন। বিধাতা এই ক্ষণজন্মা পুরুষের আত্মার কল্যাণ করুণ।

* * *

সহযোগিতা বর্জ্জন। এই নীতি যতদিন কেবল মহাত্মা গান্ধীর প্রচারিত মত বলিয়া প্রকাশ ছিল, অনেকে তাহাতে আস্থাবান হইতে পারেন নাই। এমন কি, মিশর দেশে এই নীতির প্রয়োগে জাতীয় উদ্ধারের পথ সুগম হইয়াছিল, সম্প্রতি প্রত্যক্ষ করিয়াও, মিশরে ও ভারতের অবস্থা কোন প্রকারে অনুরূপ নহে, এই যুক্তির অবতারণা হইয়াছে। সহযোগিতা বর্জ্জন নীতির বিস্তার কিন্তু প্রাচ্য হইতে প্রতীচ্যের দ্বারে আজ উপনীত হইয়াছে। জর্ম্মান নিরুপায় হইয়া আজ এই নীতিকেই বরণ করিয়া লইয়াছে। নীতিটী যুক্তিযুক্ত কি না, সে বিষয়ে যখন দেশে গভীর মতভেদ আছে, এ বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বাধীনতায় ও স্বাধীন-চিন্তার আমরা ব্যাঘাত জন্মাইতে চাই না। তবে, এটুকু বলা বোধ হয় দোষণীয় হইবে না যে, আমরা চাই স্বাধীনচিন্ততা। স্কুল, কলেজ, আদালত না ছাড়িয়াও কঠোর ভাবে,—প্রকৃত ভাবে,— সহযোগিতা বর্জ্জন করা সম্ভব। আর লোকলজ্জায়, মিথ্যা ভয়ে, স্কুল কলেজ আদালত ছাড়িয়াও, বহুলোকের মজ্জাগত সহযোগিতা-স্পৃহা, অঙ্গারের মলিনতার ন্যায়, "শতধৌতেন ন মুঞ্চতে"।

* * * *

নরম ও গরম দল। দেশের মধ্যে একটা মহা পরিবর্ত্তনের আভাষ পাওয়া যাইতেছে। ছোট বড় দুইটি জিনিষকে সমান করিতে হইলে, হয় একটাকে বাড়িতে হয়, না হয় অপরকে ছোট হইতে হয়। কি উপায়ে এটা ঘটিতেছে তাহার বিচার করা বিশেষ ফলপ্রসূ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। একদিকে দেখা যাইতেছে, নরমদলের অন্যতম নেতা দ্বারবঙ্গাধিপতি, মহামান্য স্বয়ং লর্ড সিংহ বাহাদুরের নজির লইয়া জাহির করিলেন,—গান্ধী মহাত্মার, চরকার আয়োজনটী ব্যতীত, আর সকল অনুষ্ঠানগুলির প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রাণপণ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। অপরদিকে, দেখা যাইতেছে, যাঁহারা গরম দলের যজ্ঞের বিশিষ্ট হোতা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই স্কুল কলেজ আইন আদালত বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য কিনা, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান হইতেছেন; শাসন-সংস্কার-প্রসূত নবীন ব্যবস্থাপক-সভার কার্য্যকলাপ দৃষ্টে ভাবিতেছেন,—"আবার ডাকিলে, যাইব"। যে সরিষা দিয়া ভূত তাড়াইতে হইবে, ভূত যদি তাহাতেই চাপিয়া বসে সমস্যাপূর্ণ ব্যাপারটা আরো জটিল হইয়া উঠে। লর্ড সিংহ বলিতেছেন,—ঢাকের বাদ্যি তিনি বাজাবেনই বাজাবেন, তা' তুমি শুনতে চাও, বা না চাও। আমরা নাচার!

* * * *

চিত্তরঞ্জনের যাত্রাভঙ্গ। নূতন শাসন-সংস্কারে কি পাইলাম যখন বিচার করিতে আরম্ভ করি, তখন মনে হয়, খড়ের গাদায় সূচ হারাইয়াছি। সবই তো পূর্ব্বেকার মত

রহিয়াছে, তবে সংস্কার হইল কোথায়? এই যে সেদিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপরে হুকুম জারি হইল, তিনি মৈমনসিংহে প্রবেশ করিতে পারিবেন না, গা' জোরি বে-আইনি এ ব্যবহার ছিল যেমন সংস্কারের পূর্ব্বে, সংস্কারের পরে আজও ঠিক তেমনই আছে। অপ্রতিহত-রূপেই দেশের উপর আমলাতন্ত্রের জোর জুলুম চলিতেছে; তাহার কি বিরাম নাই, প্রতিকার নাই?

* * * *

কালীঘাটে পুলিশের গুলি। এই সেদিন দেখা গেল অতর্কিতভাবে সহসা পুলিশ সার্জ্জনরা লোকদের উপরে দিনমানে গুলি বর্ষণ করিল। কে তা'র প্রতিবিধান করিবে? সম্প্রতি এই ঘটনার উপরে একটা তদন্ত চলিতেছে; তাহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা বিশেষ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাই না। গুজব, এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট পুলিশের প্রধান কর্ম্মচারী ডেপুটী কমিশনার হেনা (Hannah) সাহেব, তদন্ত শেষ হইবার পূর্ব্বেই, এক বৎসর ছুটি পাইয়া স্বগৃহে চলিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহা সত্য কি? তদন্তের ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার কি ভারত ছাড়িয়া অন্যত্র যাওয়া বিধেয়? কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম! তুমি আমি কি করিতে পারি?

* * * *

দিল্লীর ব্যয়।—দিল্লীনগর পুনর্গঠনের জন্য

১৯১২-১৩ সালে	১৬,৭৮,০০০	টাকা
১৯১৩-১৪ সালে	৭৫,৫৫,০০০	„
১৯১৪-১৫ সালে	৫৪,৫১,০০০	„
১৯১৫-১৬ সালে	৫০,০০,০০০	„
১৯১৬-১৭ সালে	৪০,০০,০০০	„
১৯১৭-১৮ সালে	৩০,০০,০০০	„
১৯১৮-১৯ সালে	৪৩,০০,০০০	„
১৯১৯-২০ সালে	৫০,০০,০০০	„
১৯২০-২১ সালে	১,২০,০০,০০০	„

খরচ হইয়াছে। আগামী বর্ষে, ১,১০,০০,০০০ টাকা খরচ করিবার আবদার! যুদ্ধের সময়ও দিল্লী নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ ছিল না। যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতে, খরচ বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে। আগামী বৎসর আয় অপেক্ষা ব্যয় ১৯ কোটি টাকা বেশী। তবু দিল্লী নির্ম্মাণের জন্য ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়! ব্যয় সঙ্কুলনের জন্য এমন কি একান্ত ব্যবহার্য্য চিনির উপরও শুল্ক হইয়াছে! সেই টাকা হইতে ১ কোটির বেশী টাকা দিল্লীর জন্য ব্যয় করিতে গবর্ণমেণ্ট লজ্জাবোধ করিতেছেন না। 'ডিল্লীকা লাড্ডু'!

* * * *

বঙ্গের শাসন ব্যয়। এ বৎসরের মত বাঙ্গলার বজেটের চরম নির্ঘণ্ট চুকিয়াছে। ব্যয়ের জন্য, আমলাবর্গের উনিশটী ও মন্ত্রী-বর্গের এগারটী, একুনে ত্রিশটীতে, মোট ৯,৯৭,৪৪,০০০ টাকার মঞ্জুরের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সকলের মঞ্জুরের বিপক্ষে প্রায় ২১২টী প্রতি-প্রস্তাব বিজ্ঞাপিত হয়। তাহার মধ্যে

গৃহীত—৩৯

প্রত্যাখ্যাত—২৭

প্রত্যাহৃত—১৪৬ (!)

প্রত্যাহারই যদি করিতেই হইল, এই প্রতি-প্রস্তাবগুলি করা হইয়াছিল, কোন বিবেচনায়? যে সকল প্রস্তাব গ্রহণ করা

হইয়াছে, তাহাদের ফলে ন্যূনাধিক নিম্নলিখিত ব্যয় গুলির টাকা নামঞ্জুর হইয়াছে—

১৪।	সাবরেকল কর্ম্মচারী ...	১,০০,০০০৲
২৩।	অরণ্য বিভাগ ...	১৯,৯০০৲
২০।	খবরের ডিরেক্টর	৩১,০০০৲
৩।	হাইকোর্টের, (পেপার বুক)	[illegible],৩০,০০০৲
৪৪।	এডিসনাল লিগ্যাল রিমেমব্রেন্সার	৭০,০০০৲
৭৪।	পুলিস	২৩,৩২,৭০০
৪৮।	মৈমনসিংহ বিভাগ	৬,০০,০০০৲
১৫৩।	মেদিনীপুর-বিভাগ	৭,২৫,০০০৲
১৪৩।	প্রধান বিচারপতির বাসস্থান	১,০০,০০০৲
১৯৪।	পুলিস হাঁসপাতাল	৪,৮৬,০০০৲
২১০।	বিবাহিত পুলিস সার্জ্জেণ্ট	[illegible],৮৩,০০০৲

পুলিস বিভাগে চাওয়া হইয়াছিল, মোট ১,৭৪,৭৮,০০০৲ টাকা; তাহার মধ্যে ২৩,৩২,৭০০৲ টাকা নাকচ হওয়াতে, বেশ পরিস্কার-রূপেই বোঝা যাইতেছে, দেশের লোকের এই বিভাগের উপরে একেবারেই আস্থা নাই। বিবাহিত সার্জ্জেণ্টদের জন্য বাসস্থানের প্রস্তাবটা পুলিস বিভাগের পক্ষে একটা নিতান্ত আদুরে ছেলের বায়নার মত। ১৯১৯ সালের কলিকাতা পুলিস রিপোর্টে প্রকাশ, মোট সার্জ্জেণ্টের সংখ্যা ৪৩; বর্ত্তমানে মোট ৫৬ হইতে পারে। লালবাজারের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণের উত্তর পারে যে সুবৃহৎ প্রাসাদ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাতেও ঠাকুরদের সাধ পূরে নাই। পূর্ব্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টিত চক্-মিলান ঠাট্‌খানা প্রতিষ্ঠিত না হইলে, লাল বাজারের কর্ত্তৃপক্ষের সন্তোষ হইতেছে না। ক্লার্ক সাহেবের পুলিস অট্টালিকার বাতিক সুপরিচিত; তিনি, ১৯১৯ সনের রিপোর্টে এই প্রবৃত্তি, এমন কি 'ধার করিয়া' চরিতার্থ করিবার জন্য এক ফন্দি (scheme) আটিয়াছেন (৬ পৃঃ)! ব্যবস্থাপক-সভার অধিকাংশের সদস্যবর্গের অভিমত কিন্তু অন্য-রূপ। হাইকোর্টের 'পেপার বুক' প্রস্তুত বিভাগ সংস্কার-কল্পে ব্যাপারটা দাঁড়াইয়াছে গুরুতর। উকিলদের মধ্যে অনেকে ধর্ম্মঘট করিয়া ব্যবসায় ইস্তফা দিবার প্রস্তাব পর্য্যন্ত করিয়াছেন। কোথাকার জল কোথায় গিয়া দাঁড়ায়, দেখা যাক্। সাক্ষাৎভাবে, গান্ধী-মহাত্মার প্রচারের ফলে যাহা সম্ভব হয় নাই, বিচারক দিগের বিচারে বা 'অ-বিচারে' (?) বোধ হয় হাইকোর্টে তাহা পরোক্ষে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়িবে। দেখা যাক্, কি হয়।

* * * *

দমন আইন সংস্কার। কঠোর আইন সমূহ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিটি বসিয়াছে। ডাক্তার সপ্রু, স্যর উইলিয়ম ভিনসেণ্ট, স্যর শিবস্বামী আয়ার, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী, মিঃ সমর্থ, মিঃ ভুরগ্রী, ডাক্তার গোর, স্যর দিন শা ওয়াচা এবং ডাক্তার হ্যামন্দ ঐ কমিটীর সদস্য হইবেন। ডাক্তার সপ্রু হইবেন চেয়ারম্যান। এই কমিটি নিম্নলিখিত আইন গুলি সম্বন্ধে তদন্ত করিবেন—

১৮০৪ সালের বেঙ্গল ষ্টেট অফেন্স রেগুলেসন
১৮০৮ সালের মাদ্রাজ রেগুলেশন ১নং,
১৮১৮ সালের বেঙ্গল ষ্টেট প্রিজনার্স রেগুলেশন, ২নং
১৮২৭ সালের বোম্বে রেগুলেশন ২৫নং
১৮০৫ সালের ষ্টেট প্রিজনার্স এক্ট,
১৮৫৭ সালের ষ্টেট অফেন্সেস এক্ট,
১৮৫৭ সালের ফরফিচার এক্ট,
১৮৫৮ সালের ষ্টেট প্রিজনার্স এক্ট,
১৯০৮ সালের ইণ্ডিয়ান ক্রিমিন্যাল ল এমেণ্ডমেণ্ড এক্ট,
১৯১১ সালের রাজদ্রোহ সভা বন্ধের আইন,
১৯১৫ সালের ভারতরক্ষা আইন
১৯১৯ সালের এনার্কিক্যাল এণ্ড রিভোলিউসনরি ক্রাইমস এক্ট।

* * *

প্রেস আইন সংশোধন। মুদ্রাযন্ত্র ঘটিত আইনগুলির সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ও একটি কমিটি বসিয়াছে। এই কমিটিতে ডাক্তার সপ্রু, সার উইলিয়ম ভিনসেন্ট, মিঃ যমুনাদাস দ্বারকাদাস, মিঃ শেষগিরি আয়ার, শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ সিংহ, মিঃ বক্সী শোভন লাল, মিঃ ঈশ্বর সারণ, মিঃ জে, এন্ মুখার্জ্জি খান বাহাদুর মীর আসাদ আলি থাকিবেন। ডাক্তার সপ্রু চেয়ারম্যান হইবেন। এই কমিটি নিম্নলিখিত আইনগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন—

১৮৬৭ সালের প্রেস এণ্ড, রেজিষ্ট্রেসন
১৯১০ সালের ইণ্ডিয়ান প্রেস এ্যাক্ট
১৯০৮ সালের নিউজ পেপার এ্যাক্ট।

* * * *

ব্রাহ্মসমাজ। নানা বাকবিতণ্ডা, রেষারেষি, মান অভিমান, আবদার বায়নার অভিনয়ের পর, কর্ত্তাদের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও, বিগত ১৯শে মার্চ্চ তারিখের স্থগিত বার্ষিক সভার অধিবেশনে দেশমান্য কবীন্দ্র ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অধিকাংশ সভ্যের মতে (৪৯৬ সপক্ষে, ২৩৩ বিপক্ষে ; অবশিষ্ট সভ্যগণ অভিমত জ্ঞাপন করেন নাই) মাননীয় সভ্যরূপে বরিত হইয়াছেন। সত্যের ও সাম্যের এই প্রতিষ্ঠা দেখিয়া আমরা অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ব্রাহ্মসমাজে ঘুণ ধরিলে, ক্ষোভের লেশ থাকিবে না।

* * *

জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ। আসন্ন সঙ্কটাবস্থায় উপনীত হইয়া, পরিষৎ যে, বিপদভঞ্জনের অশেষ করুণায়, সকল সমস্যা অতিক্রম করিয়া, চির-প্রতিষ্ঠার পথে সুদৃঢ় ভিত্তিলাভ করিয়াছে, তাহাতে আমরা যে কি প্রকার আনন্দিত হইয়াছি, বলিবার নয়। দেশে জাতীয় শিক্ষার অনুষ্ঠানগুলি দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, জাতীয় উন্নতির পথ সুগম হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইহা অমোঘ অব্যর্থ ঔষধ।

* * *

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ডাক্তার সার্ নীলরতন সরকার যে যোগ্যতার সহিত ভাইস চ্যান্‌সেলারের কাজ করিয়াছিলেন, এই কথা লর্ড রোনাল্‌ডশে সেদিন কনভোকেশন বক্তৃতায় বলিয়াছেন। তাঁহার কাজ ফুরাইল এই চৈত্রে, আর, মাননীয় বিচারপতি সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি তাঁহারই হাতে-গড়া। যে কেহই ভাইস চ্যানসেলার থাকুন না কেন, তাঁহারই নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় চালিত হইয়া আসিয়াছে। সার্ আশুতোষের পূর্ণ নেতৃত্বের ফলে, অনেক আশা করা যায়!

[সমাপ্ত]